সহপাঠ

(উপন্যাস ও নাটক)

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত।

সহপাঠ

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি

উপন্যাস : লালসালু
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

নাটক : সিরাজউদ্দৌলা
সিকান্‌দার আবু জাফর

লেখক ও সংকলক

অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক

অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মান্নান

অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম

ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান

প্রীতিশকুমার সরকার

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : জুলাই-২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : জুন-২০১৮

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মূল্য : ৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) টাকা।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে অধিকাংশ বিষয়ের মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণির **বাংলা সহপাঠ** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির উপন্যাস ও নাটক এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা এ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এছাড়া এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতি চেতনা, নারী-পুরুষের সমমর্যাদাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিজ্ঞানচেতনা ইত্যাকার বিষয়ও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। সুস্থ চিন্তার চর্চা ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলাও এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মনন, মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

(প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা)
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

উপন্যাস

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণির উপযোগী সংস্করণ

ঔপন্যাসিক-পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। জীবন-সন্ধানী ও সমাজসচেতন এ সাহিত্য-শিল্পী চট্টগ্রাম জেলার ষোলশহরে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস ছিল নোয়াখালীতে। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পিতার কর্মস্থলে ওয়ালীউল্লাহ্র শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনকে নানাভাবে দেখার সুযোগ ঘটে তাঁর, যা তাঁর উপন্যাস ও নাটকের চরিত্র-চিত্রণে প্রভূত সাহায্য করে। অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে এমএ পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু ডিগ্রি নেওয়ার আগেই ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক 'দি স্টেট্স্ম্যান'-এর সাব-এডিটর নিযুক্ত হন এবং সাংবাদিকতার সূত্রে কলকাতার সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে করাচি বেতার কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি কূটনৈতিক দায়িত্বে নয়াদিল্লি, ঢাকা, সিডনি, করাচি, জাকার্তা, বন, লন্ডন এবং প্যারিসে নানা পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল প্যারিস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবরে তিনি প্যারিসে পরলোক গমন করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যকর্ম সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর ও বাইরের সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্য উদ্ঘাটনের বিরল কৃতিত্ব তাঁর। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে একদিকে যেমন স্থান পেয়েছে কুসংস্কার ও অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, বিপর্যস্ত, আশাহীন ও মৃতপ্রায় সমাজজীবন, অন্যদিকে তেমনি স্থান পেয়েছে মানুষের মনের ভেতরকার লোভ, প্রতারণা, ভীতি, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। কেবল রসপূর্ণ কাহিনি পরিবেশন নয়, তাঁর অভীষ্ট ছিল মানবজীবনের মৌলিক সমস্যার রহস্য উন্মোচন।

'নয়নচারা' (১৯৪৬) এবং 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) তাঁর গল্পগ্রন্থ এবং 'লালসালু' (১৯৪৮) 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ও কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিরীক্ষামূলক চারটি নাটকও লিখেছেন। সেগুলো হলো : 'বহিপীর', 'তরঙ্গভঙ্গ', 'উজানে মৃত্যু' ও 'সুড়ঙ্গ'।

সাহিত্যের রূপশ্রেণি : উপন্যাস

উপন্যাস আধুনিক কালের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ। উপন্যাসের আক্ষরিক অর্থ হলো উপযুক্ত বা বিশেষ রূপে স্থাপন। অর্থাৎ উপন্যাস হচ্ছে কাহিনি-রূপ একটি উপাদানকে বিবৃত করার বিশেষ কৌশল, পদ্ধতি বা রীতি। 'উপন্যাস' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ novel-এর আভিধানিক অর্থ হলো : a fictitious prose narrative or tale presenting picture of real life of the men and women portrayed। অর্থাৎ উপন্যাস হচ্ছে গদ্যে লিখিত এমন এক বিবরণ বা কাহিনি যার ভেতর দিয়ে মানব-মানবীর জীবনযাপনের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

এভাবে ব্যুৎপত্তিগত এবং আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, মানব-মানবীর জীবন যাপনের বাস্তবতা অবলম্বনে যে কল্পিত উপাখ্যান পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য বিশেষ বিন্যাসসহ গদ্যে লিপিবদ্ধ হয় তাই উপন্যাস। যেহেতু উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য মানুষের জীবন তাই উপন্যাসের কাহিনি হয় বিশ্লেষণাত্মক, দীর্ঘ ও সমগ্রতাসন্ধানী। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক E. M. Forster-এর মতে, কমপক্ষে ৫০ হাজার শব্দ দিয়ে উপন্যাস রচিত হওয়া উচিত।

বিখ্যাত উপন্যাস বিশ্লেষকগণ একটি সার্থক উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. প্লট বা আখ্যান;
২. চরিত্র;
৩. সংলাপ;
৪. পরিবেশ বর্ণনা;
৫. লিখনশৈলী বা স্টাইল;
৬. লেখকের সামগ্রিক জীবন-দর্শন।

১. প্লট বা আখ্যান : উপন্যাসের ভিত্তি একটি দীর্ঘ কাহিনি। যেখানে মানব-মানবীর তথা ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, ঘৃণা-ভালোবাসা ইত্যাদি ঘটনা প্রাধান্য লাভ করে। উপন্যাসের প্লট বা আখ্যান হয় সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। প্লটের মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়াকাণ্ডকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে তা বাস্তব জীবনকে প্রতিফলিত করে এবং কাহিনিকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও বাস্তবোচিত করে তোলে।

২. চরিত্র : ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সমাজসম্পর্ক। এই সম্পর্কজাত বাস্তব ঘটনাবলি নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত হয়। আর, ব্যক্তির আচরণ, ভাবনা এবং ক্রিয়াকাণ্ডই হয়ে ওঠে উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। উপন্যাসের এই ব্যক্তিই চরিত্র বা character। অনেকে মনে করেন, উপন্যাসে ঘটনাই মুখ্য, চরিত্র সৃষ্টি গৌণ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ঘটনা ও চরিত্র পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, একটি অন্যটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মহৎ ঔপন্যাসিক এমনভাবে চরিত্র সৃষ্টি করেন যে, তারা হয়ে ওঠে পাঠকের চেনা জগতের বাসিন্দা বা অতি পরিচিতজন। উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে একজন লেখকের অন্বিষ্ট হয় দ্বন্দ্বময় মানুষ। ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, সুনীতি-দুর্নীতি প্রভৃতির দ্বন্দ্বাত্মক বিন্যাসেই একজন মানুষ সমগ্রতা অর্জন করে এবং এ ধরনের মানুষই চরিত্র হিসেবে সার্থক বলে বিবেচিত হয়।

৩. সংলাপ : উপন্যাসের ঘটনা প্রাণ পায় চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সংলাপে। যে কারণে ঔপন্যাসিক সচেষ্ট থাকেন স্থান-কাল অনুযায়ী চরিত্রের মুখে ভাষা দিতে। অনেক সময় বর্ণনার চেয়ে চরিত্রের নিজের মুখের একটি সংলাপ তার চরিত্র উপলব্ধির জন্য বহুল পরিমাণে শক্তিশালী ও অব্যর্থ হয়। সংলাপের দ্বারা ঘটনাস্রোত উপস্থাপন করে লেখক নির্লিপ্ত থাকতে পারেন এবং পাঠকের বিচার-বুদ্ধির প্রকাশ ঘটাতে পারেন। সংলাপ চরিত্রের বৈচিত্র্যময় মনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করে এবং উপন্যাসের বাস্তবতাকে নিশ্চিত করে তোলে।

৪. পরিবেশ বর্ণনা : উপন্যাসের কাহিনিকে হতে হয় বাস্তবধর্মী ও বিশ্বাসযোগ্য। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের দেশ-কালগত সত্যকে পরিস্ফুটিত করার অভিপ্রায়ে পরিবেশকে নির্মাণ করেন। পরিবেশ বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্রের জীবনযাত্রার ছবিও কাহিনিতে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই পরিবেশ মানে কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়; স্থান-কালের স্বাভাবিকতা, সামাজিকতা, ঔচিত্য ও ব্যক্তি মানুষের সামগ্রিক জীবন-পরিবেশ। দেশ-কাল ও সমাজের রীতি-নীতি, আচার প্রথা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠে উপন্যাসের প্রাণময় পরিবেশ।

৫. শৈলী বা স্টাইল : শৈলী বা স্টাইল হচ্ছে উপন্যাসের ভাষাগত অবয়ব সংস্থানের ভিত্তি। লেখকের জীবনদৃষ্টি ও জীবনসৃষ্টির সঙ্গে ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপন্যাসের বর্ণনা, পরিচর্যা, পটভূমিকা উপস্থাপন ও চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ে অনিবার্য ভাষাশৈলীর প্রয়োগই যেকোনো ঔপন্যাসিকের কাম্য। উপজীব্য বিষয় ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষার মাধ্যমেই উপন্যাস হয়ে ওঠে সমগ্র, যথার্থ ও সার্থক আবেদনবাহী। উপন্যাসের লিখনশৈলী বা স্টাইল নিঃসন্দেহে যেকোনো লেখকের শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার পরিচায়ক।

৬. লেখকের সামগ্রিক জীবন-দর্শন : মানবজীবনসংক্রান্ত যে সত্যের উদ্‌ঘাটন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয় তাই লেখকের জীবনদর্শন। আমরা একটি উপন্যাসের মধ্যে একই সঙ্গে জীবনের চিত্র ও জীবনের দর্শন– এই দুইকেই খুঁজি। এর ফলে সার্থক উপন্যাস পাঠ করলে পাঠক মানবজীবনসংক্রান্ত কোনো সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। উপন্যাসে জীবনদর্শনের অনিবার্যতা তাই স্বীকৃত।

উপন্যাসের উদ্ভব

গল্প শোনার আগ্রহ মানুষের সুপ্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষের এই আগ্রহের ফলেই কাহিনির উদ্ভব। তখন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে মুখে মুখে প্রচলিত গল্প-কাহিনির বিষয় হয়ে ওঠে দেব-দেবী, পুরোহিত, গোষ্ঠীপতি ও রাজাদের কীর্তিকাণ্ড। লিপির উদ্ভাবন, ব্যবহার ও মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার হতে বহু শতক পেরিয়ে যায়। ততদিনে মানবসমাজে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট, পুরোহিত ও ভূস্বামীদের। ফলে দেবতা ও রাজ-রাজড়ার কাহিনিই লিপিবদ্ধ হতে থাকে ছন্দ ও অলংকারমণ্ডিত ভাষায়। এভাবেই ক্রমে কাব্য, মহাকাব্য ও নাটকের সৃষ্টি।

দৈনন্দিন জীবনযাপনের ভাষায় তথা গদ্যে কাহিনি লেখার উদ্ভব ঘটে ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে। মুখে মুখে রচিত কাহিনি যেমন রূপকথা, উপকথা, পুরাণ, জাতকের গল্প ইত্যাদি পরে গদ্যে লিপিবদ্ধ হলেও মানুষ এবং মানুষের জীবন ওইসব কাহিনির প্রধান বিষয় হতে পারেনি। কারণ তখনো সমাজে ব্যক্তি মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়নি, গড়ে ওঠেনি তার ব্যক্তিত্ব; ফলে কাহিনিতে ব্যক্তির প্রাধান্য লাভের উপায়ও ছিল অসম্ভব।

ইউরোপে যখন বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ শুরু হয় তখন ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটতে থাকে। খ্রিষ্টীয় চৌদ্দো-ষোলো শতকে ইউরোপীয় নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভরতা, ইহজাগতিকতা এবং মানবতাবাদ। ক্রমে যা হয়ে ওঠে শিক্ষিত সমাজের সচেতন জীবনযাপনের অঙ্গ। রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠিত হলে বিজ্ঞান ও দর্শনের অগ্রগতি বাধাহীন হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ আরম্ভ হলে সমাজে বণিক শ্রেণির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং রাজা, সামন্ত-ভূস্বামী এবং পুরোহিতদের সামাজিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভাগ্যনির্ভরতা পরিহার করে মানুষ হয়ে ওঠে স্বাবলম্বী, অধিকার-সচেতন এবং আত্ম প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ। এভাবে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র চর্চার পথ খুলে দেয়। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিমানুষ এবং ব্যক্তির জীবনই হয়ে ওঠে সাহিত্যের প্রধান বিষয়। এভাবেই ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ পরিবর্তনের পটভূমিকাতেই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে উপন্যাসের।

অবশ্য এর পূর্ববর্তী কয়েক শতকেও পৃথিবীর নানা দেশে রচিত হয়েছে বিভিন্ন কাহিনিগ্রন্থ, যাতে ব্যক্তির জীবন, তার অভিজ্ঞতা, তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, তার আশা-হতাশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গভীর বিশ্বস্ততার সঙ্গে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো– ‘আলিফ লায়লা ওয়া লায়লানে’, ‘ডেকামেরন’, ‘ডন কুইকজোট’ ইত্যাদি।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে উনিশ শতক খুবই তাৎপর্যবহ। এ সময়ে লেখা হয়েছে পৃথিবীর বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। যেমন : ফ্রান্সের স্তাঁদালের ‘স্কারলেট অ্যান্ড ব্ল্যাক’, এমিল জোলার ‘দি জারমিনাল’; ব্রিটেনের হেনরি ফিল্ডিং-এর ‘টম জোন্স’, চার্লস ডিকেন্সের ‘এ টেল অফ টু সিটিজ’, রাশিয়ার লিও তলস্তয়ের ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’, ফিয়োদর দস্তয়ভস্কির ‘ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট’ ইত্যাদি। উপন্যাস-শিল্পকে বিকাশের শীর্ষ স্তরে পৌঁছে দেয়া এসব মহৎ উপন্যাস পাঠকের মনকে যুক্ত করে বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের সঙ্গে।

উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

উপন্যাস বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। কখনও তা কাহিনি-নির্ভর, কখনও চরিত্র-নির্ভর; কখনও মনস্তাত্ত্বিক, কখনও বক্তব্যধর্মী। বিষয়, চরিত্র, প্রবণতা এবং গঠনগত সৌকর্যের ভিত্তিতে উপন্যাসকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন

সামাজিক উপন্যাস : যে উপন্যাসে সামাজিক বিষয়, রীতি-নীতি, ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য থাকে তাকে সামাজিক উপন্যাস বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’, শরৎচন্দ্রের ‘গৃহদাহ’, নজিবর রহমানের ‘আনোয়ারা’, কাজী ইমদাদুল হকের ‘আবদুল্লাহ’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ‘লালসালু’ প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসের উদাহরণ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস : জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের আশ্রয়ে যখন কোনো উপন্যাস রচিত হয় তখন তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখক নতুন নতুন ঘটনা বা চরিত্র সৃজন করে কাহিনিতে গতিময়তা ও প্রাণসঞ্চার করতে পারেন কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধর্মপাল’, মীর মশাররফ হোসেনের ‘বিষাদ-সিন্ধু’, সত্যেন সেনের ‘অভিশপ্ত নগরী’ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে বিবেচিত। রুশ ভাষায় লিখিত তলস্তয়ের কালজয়ী গ্রন্থ ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’, ভাসিলি ইয়ানের ‘চেঙ্গিস খান’ বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস : মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের প্রধান আশ্রয় পাত্র-পাত্রীর মনোজগতের ঘাত-সংঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। চরিত্রের অন্তর্জগতের জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটনই ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য। আবার সামাজিক উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে নৈকট্যও লক্ষ করা যায়। সামাজিক উপন্যাসে যেমন মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত থাকতে পারে, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত থাকতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে কাহিনি অবলম্বন মাত্র, প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে মানবমনের জটিল দিকগুলো সার্থক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। বিশ্বসাহিত্যে ফরাসি লেখক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার লিখিত ‘মাদাম বোভারি’, রুশ লেখক দস্তয়ভস্কি লিখিত ‘ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট’ এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ‘চতুরঙ্গ’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র ‘চাঁদের অমাবস্যা’ ও ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উজ্জ্বল উদাহরণ।

রাজনৈতিক উপন্যাস : সমাজ-বিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তি যে রাজনীতি সেই রাজনৈতিক ঘটনাবলি, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট চরিত্রের কর্মকাণ্ড যে উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করে তাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলে। এ ধরনের উপন্যাসে রাজনৈতিক ক্ষোভ-বিক্ষোভ, আন্দোলন-সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিপুল পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', গোপাল হালদারের 'ত্রয়ী' উপন্যাস—'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝড় ও ঝরাপাতা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ও 'ঢোড়াই চরিতমানস', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন', শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক', জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই', আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' প্রভৃতি।

আঞ্চলিক উপন্যাস : অঞ্চল বিশেষের মানুষ ও তাদের যাপিত জীবন এবং স্থানিক রং ও স্থানিক পরিবেশবিধৌত জীবনাচরণ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা হয় তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের 'কাঁশবনের কন্যা' ও 'সমুদ্রবাসর' প্রভৃতি নাম এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

রহস্যোপন্যাস : রহস্যোপন্যাসে ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য রহস্যময়তা সৃষ্টি এবং উপন্যাসের উপান্ত পর্যন্ত তা ধরে রাখা। এ জাতীয় উপন্যাসে রহস্য উদঘাটনের জন্য পাঠক রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায় থাকে। দীনেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, কাজী আনোয়ার হোসেন প্রমুখ লেখক বাংলা ভাষায় বহু রহস্যোপন্যাস লিখেছেন। ফেলুদা সিরিজ, কিরীটী অমনিবাস, মাসুদ রানা সিরিজ, কুয়াশা সিরিজ প্রভৃতি এ জাতীয় উপন্যাসের দৃষ্টান্ত।

চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস : মানুষের মনোলোকে বর্তমানের অভিজ্ঞতা, অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের কল্পনা এক সঙ্গে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহের ভাষিক বর্ণনা দিয়ে চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস লিখিত হয়। আইরিশ লেখক জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' এমনই একটি বিখ্যাত উপন্যাস। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'কাঁদো নদী কাঁদো' চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস হিসেবে পরিচিত।

আত্মজৈবনিক উপন্যাস : ঔপন্যাসিক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে যখন আন্তরিক শিল্পকুশলতায় উপন্যাসে রূপদান করেন তখন তাকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলে। এ ধরনের উপন্যাসে লেখকের ঔপন্যাসিক কল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাঁর ব্যক্তি জীবনের নানা অন্তর্ময় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঘটনাসূত্র। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এ ধরনের উপন্যাসের দৃষ্টান্ত।

রূপক উপন্যাস : সাহিত্যের রূপকাশ্রয় কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। তবে কখনো কখনো ঔপন্যাসিক তাঁর রচনায় উপস্থাপিত কাহিনি কাঠামোর অন্তরালে কোনো বিশেষ ব্যতিক্রমধর্মী রূপকাশ্রয়ী বক্তব্যের সাহায্যে উপন্যাসের শিল্পরূপ প্রদান করেন। এ ধরনের উপন্যাসকে রূপক উপন্যাস বলা হয়। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক জর্জ অরওয়েলের রূপক উপন্যাস 'অ্যানিমেল ফার্ম'— যেখানে পাত্রপাত্রী মানুষ নয় জন্তু-জানোয়ার। রূপক উপন্যাস সৃষ্টিতে শওকত ওসমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর 'ক্রীতদাসের হাসি', 'সমাগম', 'রাজা উপাখ্যান', 'পতঙ্গ পিঞ্জর' রূপক উপন্যাসের সার্থক দৃষ্টান্ত।

বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার সূচনা ঘটে উনিশ শতকে। টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে **১৮৫৮** সালে প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' নামের কাহিনিগ্রন্থ। আধুনিক উপন্যাসের বেশ কিছু লক্ষণ, যেমন – জীবনযাপনের বাস্তবতা, ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশ এবং মানবিক কাহিনি ইত্যাদি এ উপন্যাসে ফুটে ওঠে এবং একই সঙ্গে কিছু সীমাবদ্ধতাও সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের প্রথম ষাট বছরে এ দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা উপন্যাস পাঠের উপযোগী জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি একজন সার্থক ঔপন্যাসিকের আগমনকে ক্রমশ অনিবার্য করে তোলে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। কাহিনি বিন্যাস এবং চরিত্রচিত্রণসহ উপন্যাস রচনার শৈল্পিক কৌশল সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনিই প্রথম জীবনের গভীর দর্শন-পরিস্রুত ব্যক্তি-মানুষের কাহিনি উপস্থাপন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই অতীতচারী কল্পনার প্রাধান্য এবং সমকালীন জীবনের স্বল্প উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কেবল 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস দুটিতে সমকালীন জীবন ও বাস্তবতা মোটামুটি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের জটিল সমস্যা ও তীব্র সংকটের কাহিনি তিনি ওই দুই উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা উপন্যাসের বিকাশের পথ উন্মোচন করেছেন।

বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ধারায় প্রধান শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি সামাজিক, পারিবারিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যক্তিজীবনের সংকটমুখ্য কাহিনি রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চোখের বালি', 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'ঘরে-বাইরে', 'শেষের কবিতা'। তিনিই প্রথম রূপায়ণ করেন প্রকৃত নাগরিক জীবন। উদার মানবতাবাদী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। ধর্ম, আদর্শ ও সংস্কার নয়— মানব জীবন অনেক বেশি মূল্যবান— এই বিবেচনা তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসেই উপস্থিত। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর 'গোরা', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি বৃহত্তর জীবনের যাবতীয় প্রসঙ্গই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে বাংলা উপন্যাস তুমুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, আর জনপ্রিয়তম ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসের বিষয় বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিন্দু সমাজের গ্রামীণ ও গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনি। তাঁর অন্তরঙ্গ ভাষা এবং অনবদ্য বর্ণনা-কৌশল বাংলা সাহিত্যে বিরল। সামাজিক সংস্কারের পীড়নে নারীর অসহায়তার করুণ চিত্র অঙ্কনে তিনি অদ্বিতীয়। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সামাজিক বাস্তবতার পাশাপাশি মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার ইচ্ছাসঞ্জাত মানব মনের জটিলতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি উপন্যাসে।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সময়ে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বাস্তবতা দ্রুত বদলে যায়। মানুষের পারিবারিক জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিক সংকট। একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব এবং অন্যদিকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেরণা সাধারণ মানুষকে যেমন করে তোলে অস্থির তেমনি তাকে করে তোলে অধিকার-সচেতন। এই নতুন সামাজিক বাস্তবতায় নতুন দিগন্ত সন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে যুক্ত হন নতুন ধারার কয়েকজন লেখক। এঁরা মানুষের মনোলোকের জটিল রহস্য সন্ধানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁদের কাছে সাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে সমাজের দরিদ্র এবং অবজ্ঞাত মানুষের জীবন। এঁরা হলেন : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিন লেখক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রধান ঔপন্যাসিক হিসেবে বিবেচিত হন। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত', তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রাম', এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এক ঐতিহাসিক পটভূমিতেই বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, নজিবর রহমান প্রমুখ লেখকের আবির্ভাব ঘটে। বিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে আবির্ভূত হন কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ। ১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলা নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়। নতুন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এখানে সাহিত্য সাধনা নতুন মাত্রা লাভ করে। সূচনায় বাংলাদেশের উপন্যাস, আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারার অনুসারী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শওকত ওসমান, আবু রুশদ্ প্রমুখ লেখকের হাত ধরে এগিয়ে চলে। উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় ব্যক্তি, সমাজ ও সমগ্র জীবনের বিশ্লেষণমূলক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলটি ছিল পাকিস্তানের এক ধরনের উপনিবেশ। ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবন বিকশিত হলেও গ্রামীণ জীবন ছিল পশ্চাৎপদ। অন্ধ কুসংস্কার, ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব, দারিদ্র্যসহ নানা সমস্যায় বিপন্ন ও বিপর্যস্ত ছিল মানুষের জীবন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ও বাংলাদেশের উজ্জ্বল অভ্যুদয়ের মাধ্যমে বাঙালির জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয় নতুন উদ্দীপনা। নাগরিক জীবনে যেমন লাগে আধুনিকতার ছোঁয়া তেমনি শেকড়-সন্ধানী গ্রামীণ জীবনেও সৃষ্টি হয় নবতর উদ্দীপনা। এরই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ রচনা করেন নানা ধরনের উপন্যাস। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাসের নাম দেয়া হলো :

আবুল ফজলের 'রাঙা প্রভাত', সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী', আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', শওকত ওসমানের 'জননী' ও 'ক্রীতদাসের হাসি', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো', শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' ও 'সারেং বউ', সরদার জয়েনউদ্দীনের 'অনেক সূর্যের আশা', শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা', রশীদ করিমের 'উত্তম পুরুষ', জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে', আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত', আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ি', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' ও 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', সৈয়দ শামসুল হকের 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন', আহমদ ছফার 'ওঙ্কার', হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি', মাহমুদুল হকের 'জীবন আমার বোন', রিজিয়া রহমানের 'বং থেকে বাংলা', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা', সেলিনা হোসেনের 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' ও 'হাঙর নদী গ্রেনেড', হুমায়ুন আহমেদের 'নন্দিত নরকে' ও 'জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প' এবং শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' ইত্যাদি।

'লালসালু'-র প্রকাশতথ্য

'লালসালু' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। ঢাকা-র কমরেড পাবলিশার্স এটি প্রকাশ করে। প্রকাশক মুহাম্মদ আতাউল্লাহ। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার কথাবিতান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই উপন্যাসটির ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই উপন্যাসটির দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নওরোজ কিতাবিস্তান 'লালসালু' উপন্যাসের দশম মুদ্রণ প্রকাশ করে।

১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে 'লালসালু' উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ করাচি থেকে প্রকাশিত হয় 'Lal Shalu' নামে। অনুবাদক ছিলেন কলিমুল্লাহ।

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদ। L'arbre sans racines নামে প্রকাশিত গ্রন্থটি অনুবাদ করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ -র সহধর্মিণী অ্যান-মারি-থিবো। প্যারিস থেকে এ অনুবাদটি প্রকাশ করে Editions du Seuil প্রকাশনী। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে এ অনুবাদটির পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ। 'Tree without Roots' নামে লন্ডনের Chatto and Windus Ltd. এটি প্রকাশ করেন। ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজেই এই ইংরেজি অনুবাদ করেন।

পরবর্তীকালে 'লালসালু' উপন্যাসটি জার্মান ও চেক ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

'লালসালু' উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাস 'লালসালু'। রচনাটিকে একজন প্রতিভাবান লেখকের দুঃসাহসী প্রচেষ্টার সার্থক ফসল বলে বিবেচনা করা হয়। ঢাকা ও কলকাতার মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন তখন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অস্থির ও চঞ্চল। ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, আবার নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গড়ে তোলার উদ্দীপনা ইত্যাদি নানা রকম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আবর্তে মধ্যবিত্তের জীবন তখন বিচিত্রমুখী জটিলতায় বিপর্যস্ত ও উজ্জীবিত। নবীন লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, এই চেনা জগৎকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাসের জন্য গ্রামীণ পটভূমি ও সমাজ-পরিবেশ বেছে নিলেন। আমাদের দেশ ও সমাজ মূলত গ্রামপ্রধান। এদেশের বেশির ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে। এই বিশাল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন দীর্ঘকাল ধরে অতিবাহিত হচ্ছে নানা অপরিবর্তনশীল তথাকথিত অনাধুনিক বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে। এই সমাজ থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বেছে নিলেন তাঁর উপন্যাসের পটভূমি, বিষয় এবং চরিত্র। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি গ্রামীণ সমাজ; বিষয় সামাজিক রীতি-নীতি, ও প্রচলিত ধারণা বিশ্বাস; চরিত্রসমূহ একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু, শোষিত, দরিদ্র গ্রামবাসী, অন্যদিকে শঠ, প্রতারক, ধর্মব্যবসায়ী এবং শোষক-ভূস্বামী।

'লালসালু' একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। এর বিষয় : যুগ-যুগ ধরে শেকড়গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব। গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী মজিদ প্রতারণাজাল বিস্তারের মাধ্যমে কীভাবে নিজের শাসন ও শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তারই বিবরণে সমৃদ্ধ 'লালসালু' উপন্যাস। কাহিনিটি ছোট, সাধারণ ও সামান্য; কিন্তু এর গ্রন্থনা ও বিন্যাস অত্যন্ত মজবুত। লেখক সাধারণ একটি ঘটনাকে অসামান্য নৈপুণ্যে বিশ্লেষণী আলো ফেলে তাৎপর্য-মণ্ডিত করে তুলেছেন।

শ্রাবণের শেষে নিরাক পড়া এক মধ্যাহ্নে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের প্রবেশের নাটকীয় দৃশ্যটির মধ্যেই রয়েছে তার ভণ্ডামি ও প্রতারণার পরিচয়। মাছ শিকারের সময় তাহের ও কাদের দেখে যে, মতিগঞ্জ সড়কের ওপর একটি অপরিচিত লোক মোনাজাতের ভঙ্গিতে পাথরের মূর্তির মতোন দাঁড়িয়ে আছে। পরে দেখা যায়, ওই লোকটিই গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে সমবেত গ্রামের মানুষকে তিরস্কার করছে, 'আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পিরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?' অলৌকিকতার অবতারণা করে মজিদ নামের ওই ব্যক্তি জানায় যে, পিরের স্বপ্নাদেশে মাজার তদারকির জন্যে তার এ গ্রামে আগমন। তার তিরস্কার ও স্বপ্নাদেশের বিবরণ শুনে গ্রামের মানুষ ভয়ে এবং শ্রদ্ধায় এমন বিগলিত হয় যে তার প্রতিটি হুকুম তারা পালন করে গভীর আগ্রহে। গ্রামপ্রান্তের বাঁশঝাড়সংলগ্ন কবরটি দ্রুত পরিচ্ছন্ন করা হয়। ঝালরওয়ালা লালসালুতে ঢেকে দেওয়া হয় কবর। তারপর আর পিছু ফেরার অবকাশ থাকে না। কবরটি অচিরেই মাজারে এবং মজিদের শক্তির উৎসে পরিণত হয়। যথারীতি সেখানে আগরবাতি, মোমবাতি জ্বলে; ভক্ত আর কৃপাপ্রার্থীরা সেখানে টাকা পয়সা দিতে থাকে প্রতিদিন। কবরটিকে মোদাচ্ছের পিরের বলে শনাক্তকরণের মধ্যেও থাকে মজিদের সুগভীর চাতুর্য। মোদাচ্ছের কথাটির অর্থ নাম-না-জানা। মজিদের স্বগত সংলাপ থেকে জানা যায়, শস্যহীন নিজ অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে-পড়া মজিদ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এমন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসলে এই প্রক্রিয়ায় ধর্ম ব্যবসায়ীদের আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা এ দেশের গ্রামাঞ্চলে বহুকাল ধরে বিদ্যমান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রামীণ সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যথাযথভাবেই এখানে তুলে ধরেছেন।

মাজারের আয় দিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মজিদ ঘরবাড়ি ও জমিজমার মালিক হয়ে বসে এবং তার মনোভূমির এক অনিবার্য আকাঙ্ক্ষায় শক্ত-সমর্থ লম্বা চওড়া একটি বিধবা যুবতীকে বিয়ে করে ফেলে। আসলে স্ত্রী রহিমা ঠাণ্ডা ভীতু মানুষ। তাকে অনুগত করে রাখতে কোনো বেগ পেতে হয় না মজিদের। কারণ, রহিমার মনেও রয়েছে গ্রামবাসীর মতো তীব্র খোদাভীতি। স্বামী যা বলে, রহিমা তাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। রহিমার বিশ্বাস তার স্বামী অলৌকিক শক্তির অধিকারী। প্রতিষ্ঠা লাভের সাথে সাথে মজিদ ধর্মকর্মের পাশাপাশি সমাজেরও কর্তা-ব্যক্তি হয়ে ওঠে। গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উপদেশ নির্দেশ দেয়– গ্রাম্য বিচার-সালিশিতে সে-ই হয়ে ওঠে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রধান ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে মাতব্বর খালেক ব্যাপারীই তার সহায়ক শক্তি। ধীরে ধীরে গ্রামবাসীর পারিবারিক জীবনেও নাক গলাতে থাকে সে। তাহেরের বাপ-মার মধ্যেকার একান্ত পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে তাহেরের বাপের কর্তৃত্ব নিয়েও সে প্রশ্ন তোলে। নিজ মেয়ের গায়ে হাত তোলার অপরাধে হুকুম করে মেয়ের কাছে মাফ চাওয়ার এবং সেই সঙ্গে মাজারে পাঁচ পয়সার সিন্নি দেয়ার। অপমান সহ্য করতে না পেরে তাহেরের বাপ শেষ পর্যন্ত নিরুদ্দেশ হয়। খালেক ব্যাপারীর নিঃসন্তান প্রথম স্ত্রী আমেনা সন্তান কামনায় অধীর হয়ে মজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী পিরের প্রতি আস্থাশীল হলে মজিদ তাকেও শাস্তি দিতে পিছপা হয় না। আমেনা চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তাকে তালাক দিতে বাধ্য করে মজিদ। কিন্তু তবু মাজার এবং মাজারের পরিচালক ব্যক্তিটির প্রতি আমেনা বা তার স্বামী কারুরই কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয় না।

গ্রামবাসী যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে মজিদের মাজারকেন্দ্রিক পশ্চাৎপদ জীবন ধারা থেকে সরে যেতে না পারে, সে জন্য সে শিক্ষিত যুবক আক্কাসের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সে আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়। মজিদ এমনই কূট-কৌশল প্রয়োগ করে যে আক্কাস গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক গ্রাম, সমাজ ও মানুষের বাস্তব-চিত্র 'লালসালু' উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসটি শিল্পিত সামাজিক দলিল হিসেবে বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় সংযোজন।

'লালসালু'র প্রধান উপাদান সমাজ-বাস্তবতা। গ্রামীণ সমাজ এখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থবির, যুগযুগ ধরে এখানে সক্রিয় এই অদৃশ্য শৃঙ্খল। এখানকার মানুষ ভাগ্য ও অলৌকিকত্ব গভীরভাবে বিশ্বাস করে। দৈবশক্তির লীলা দেখে নিদারুণ ভয় পেয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখে নয়তো ভক্তিতে আপ্লুত হয়। কাহিনির উন্মোচন-মুহূর্তেই দেখা যায়, শস্যের চেয়ে টুপি বেশি। যেখানে ন্যাংটো থাকতেই বাচ্চাদের আমসিপারা শেখানো হয়। শস্য যা হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। সুতরাং ওই গ্রাম থেকে ভাগ্যের সন্ধানে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যে-গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে চায় সেই গ্রামেও একইভাবে কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের জয়-জয়কার। এ এমনই এক সমাজ যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেবলই শোষণ আর শোষণ– কখনো ধর্মীয়, কখনো অর্থনৈতিক। প্রতারণা, শঠতা আর শাসনের জটিল এবং সংখ্যাবিহীন শেকড় জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পরতে পরতে ছড়ানো। আর ওই সব শেকড় দিয়ে প্রতিনিয়ত শোষণ করা হয় জীবনের প্রাণরস। আনন্দ, প্রেম, প্রতিবাদ, সততা– এই সব বোধ এবং বুদ্ধি ওই অদৃশ্য দেয়ালে ঘেরা সমাজের ভেতরে প্রায়শ ঢাকা পড়ে থাকে। এই কাজে ভূস্বামী, জোতদার এবং ধর্মব্যবসায়ী একজন আর একজনের সহযোগী।

কারণ স্বার্থের ব্যাপারে তারা একাট্টা– পথ তাদের এক। একজনের আছে মাজার, অন্যজনের আছে জমিজোত প্রভাব প্রতিপত্তি। দেখা যায়, অন্য কোথাও নয় আমাদের চারপাশেই রয়েছে এরূপ সমাজের অবস্থান। বাংলাদেশের যে-কোনো প্রান্তের গ্রামাঞ্চলে সমাজের ভেতর ও বাইরের চেহারা যেন এরূপ একই রকম।

আবার এই বদ্ধ, শৃঙ্খলিত ও স্থবির সামাজিক অবস্থার একটি বিপরীত দিকের চিত্রও আছে। তা হলো, মানুষের প্রাণধর্মের উপস্থিতি। মানুষ ভালোবাসে, স্নেহ করে; কামনা-বাসনা এবং আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়। নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও বাসনার কারণে সে নিজেকে আলোকিত ও বিকশিত করতে চায়। সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভয়ের বাধা ছিন্ন করে সহজ প্রাণধর্মের প্রেরণায় আত্মশক্তির জাগরণ ঘটাতে চায়। কোনো ক্ষেত্রে যদি সাফল্য ধরা না-ও দেয় তবু কিন্তু স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বেঁচে থাকে। প্রজন্ম পরম্পরায় চলতে থাকে তার চাওয়া ও না-পাওয়ার সাংঘর্ষিক রক্তময় হৃদয়ার্তি। এটা অব্যাহত থাকে মানব সম্পর্কের মধ্যে, দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবনে, এমনকি ব্যক্তি ও সমষ্টির মনোলোকেও।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানবতাবাদী লেখক। মানব-মুক্তির স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাঁর সাহিত্য সাধনার কেন্দ্রে সক্রিয়। এ দেশের মানুষের সুসংগত ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের অন্তরায়গুলিকে তিনি তাঁর রচিত সাহিত্যের পরিমণ্ডলেই চিহ্নিত করেছেন; দেখিয়েছেন কুসংস্কারের শক্তি আর অন্ধবিশ্বাসের দাপট। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও সমাজ সরল ও ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে কীভাবে বিভ্রান্ত ও ভীতির মধ্যে রেখে শোষণের প্রক্রিয়া চালু রাখে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ তিনি দিয়েছেন 'লালসালু' উপন্যাসে। ধর্মবিশ্বাস কিন্তু তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য নয়– তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ধর্ম ব্যবসায় এবং ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অন্ধত্ব। তিনি সেই সমাজের চিত্র তুলে ধরেন যেখানে 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি'। তিনি মনে করেন, ধর্ম মানুষকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে, পারস্পারিক মমতার পথে নিয়ে এসেছে; কিন্তু ধর্মের মূল ভিত্তিটাকেই দুর্বল করে দিয়েছে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। এ কারণে মানুষের মন আলোড়িত, জাগ্রত ও বিকশিত তো হয়ইনি বরং দিন দিন হয়েছে দুর্বল, সংকীর্ণ এবং ভীত। স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে এক শ্রেণির লোক যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানান ভণ্ডামি ও প্রতারণার আশ্রয় নেয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আঘাত তার বিরুদ্ধে। লেখক সামাজিক এই বাস্তবতার চিত্রটিই এঁকেছেন 'লালসালু' উপন্যাসে; উন্মোচন করেছেন প্রতারণার মুখোশ।

অত্যন্ত যত্ন নিয়ে রচিত একটি সার্থক শিল্পকর্ম 'লালসালু' উপন্যাস। এর বিষয় নির্বাচন, কাহিনি ও ঘটনাবিন্যাস গতানুগতিক নয়। এতে প্রাধান্য নেই প্রেমের ঘটনার, নেই প্রবল প্রতিপক্ষের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বসংঘাতের উত্তেজনাকর ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে চমক সৃষ্টির চেষ্টা। অথচ মানবজীবনের প্রকৃত রূপ আঁকতে চান তিনি। মানুষেরই অন্তর্ময় কাহিনি বর্ণনা করাই লক্ষ্য তাঁর। ফলে চরিত্র ও ঘটনার গূঢ় রহস্য, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁকে দেখাতে হয়েছে যা জীবনকে তার অন্তর্গত শক্তিতে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করে। যে ঘটনা বাইরে ঘটে তার অধিকাংশেরই উৎস মানুষের মনের লোভ, ঈর্ষা, লালসা, বিশ্বাস, ভয়, প্রভুত্ব কামনাসহ নানারূপ প্রবৃত্তি। বাসনাবেগ ও প্রবৃত্তি মানুষের মনে সুপ্ত থাকে বলেই বাইরের বিচিত্র সব ঘটনা ঘটাতে তাকে প্ররোচিত করে। ধর্ম-ব্যবসায়ীকে মানুষ ব্যবসায়ী হিসেবে শনাক্ত করতে না পেরে ভয় পায়। কারণ, তাদের বিশ্বাস লোকটির পেছনে সক্রিয় রয়েছে রহস্যময় অতিলৌকিক কোনো দৈবশক্তি। আবার ধর্ম-ব্যবসায়ী ভণ্ড ব্যক্তি যে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করে তা নয়, তার মনেও থাকে সদা ভয়, হয়ত কোনো মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণা ও বুদ্ধির মাধ্যমে তার গড়ে তোলা প্রতিপত্তির ভিত্তিটাকে ধসিয়ে দেবে। নরনারীর অবচেতন ও সচেতন মনের নানান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই এভাবে লেখকের বিষয় হয়ে উঠেছে 'লালসালু' উপন্যাসে।

চরিত্র-সৃষ্টি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে অসাধারণ কুশলী শিল্পী তা তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। 'লালসালু' উপন্যাসের শৈল্পিক সার্থকতার প্রশ্নে সুসংহত কাহিনিবিন্যাসের চাইতে চরিত্র নির্মাণের কুশলতার দিকটি ভূমিকা রেখেছে অনেক বেশি। 'লালসালু' একদিক দিয়ে চরিত্র-নির্ভর উপন্যাস।

এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ। শীর্ণদেহের এই মানুষটি মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য, ভয় ও শ্রদ্ধা, ইচ্ছা ও বাসনা-সবই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। আর সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এই চরিত্রকেই লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন; বারবার অনুসরণ করেছেন এবং তার ওপরই আলো ফেলে পাঠকের মনোযোগ নিবন্ধ রেখেছেন। উপন্যাসের সকল ঘটনার নিয়ন্ত্রক মজিদ। তারই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। আর তাই মজিদের প্রবল উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে পড়ে মহব্বতনগর গ্রামের সামাজিক পারিবারিক সকল কর্মকাণ্ডে।

মজিদ একটি প্রতীকী চরিত্র— কুসংস্কার, শঠতা, প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক সে। প্রচলিত বিশ্বাসের কাঠামো ও প্রথাবদ্ধ জীবনধারাকে সে টিকিয়ে রাখতে চায়, ওই জীবনধারার সে প্রভু হতে চায়, চায় অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতে। এজন্য সে যে-কোনো কাজ করতেই প্রস্তুত, তা যতই নীতিহীন বা অমানবিক হোক। একান্ত পারিবারিক ঘটনার রেশ ধরে সে প্রথমেই বৃদ্ধ তাহেরের বাবাকে এমন এক বিপাকে ফেলে যে সে নিরুদ্দেশ হতে বাধ্য হয়। নিজের মাজারকেন্দ্রিক শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ অনুভব করে সে আওয়ালপুরের পির সাহেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। ব্যাপারটি রক্তপাত পর্যন্ত গড়ায় এবং নাস্তানাবুদ পির সাহেবকে শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করতে সে বাধ্য করে। সে খালেক ব্যাপারীকে বাধ্য করে তার সন্তান-আকাঙ্ক্ষী প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে। আর আক্কাস নামের এক নবীন যুবকের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। এ ভাবেই মজিদ তার প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠাকে নিরঙ্কুশ করে তোলে।

মহব্বতনগরে মজিদ তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করলেও এর ওপর যে আঘাত আসতে পারে সে বিষয়ে মজিদ অত্যন্ত সজাগ। সে জানে, স্বাভাবিক প্রাণধর্মই তার ধর্মীয় অনুশাসন এবং শোষণের অদৃশ্য বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। ফলে ফসল ওঠার সময় যখন গ্রামবাসীরা আনন্দে গান গেয়ে ওঠে তখন সেই গান তাকে বিচলিত করে। ওই গান সে বন্ধ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। রহিমার স্বচ্ছন্দ চলাফেরায় সে বাধা দেয়। আক্কাস আলিকে সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিত অপমানিত করে। মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজের জাগতিক প্রতিষ্ঠার ভিতটিকে মজবুত করার জন্যে এ সবই আসলে তার হিসেবি বুদ্ধির কাজ। সে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তার বিশ্বাস সুদৃঢ় কিন্তু প্রতারণা বা ভণ্ডামির মাধ্যমে যেভাবেই হোক সে তার মাজারকে টিকিয়ে রাখতে চায়। এরপরও মাঝে মাঝে তার মধ্যে হতাশা ভর করে। মজিদ কখনো কখনো তার প্রতি মানুষের অনাস্থা অবলোকন করে নিজের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একেকবার আত্মঘাতী হওয়ার কথা ভাবে। মাজার প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যে কূট-কৌশল অবলম্বন করেছে তার সব কিছু ফাঁস করে দিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবে।

প্রতিষ্ঠাকামী মজিদ স্বার্থপরতা, প্রতিপত্তি আর শোষণের প্রতিভূ। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের পর নিঃসন্তান জীবনে সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একপ্রকার শূন্যতা উপলব্ধি করে। এই শূন্যতা পূরণের অভিপ্রায়ে অল্পবয়সী এক মেয়েকে বিয়ে করে সে। প্রথম স্ত্রী রহিমার মতো দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা ধর্মের ভয়ে ভীত নয়। এমনকি, মাজারভীতি কিংবা মাজারের অধিকর্তা মজিদ সম্পর্কেও সে কোনো ভীতি বোধ করে না। তারুণ্যের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী তার মধ্যে জীবনের চঞ্চলতা ও উচ্ছলতা অব্যাহত থাকে। মজিদ তাকে ধর্মভীতি দিয়ে আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়। জমিলা তার মুখে থুথু দিলে ভয়ানক ক্রুদ্ধ মজিদ তাকে কঠিন শাস্তি দেয়। তার মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র না হয়ে তার ক্ষমতাবান সত্তাটি নিষ্ঠুর শাসনের মধ্যেই পরিতৃপ্তি খোঁজে। রহিমা যখন পরম মমতায় মাজার ঘর থেকে জমিলাকে এনে শুশ্রূষা আরম্ভ করে তখন মজিদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় তুমুল আলোড়ন। মজিদের মনে হয়, 'মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেনো ওলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম হয়'। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হয়। নবজন্ম হয় না তার। মজিদ শেষ পর্যন্ত থেকে যায় জীবনবিরোধী শোষক এবং প্রতারকের ভূমিকায়।

মজিদ একটি নিঃসঙ্গ চরিত্র। উপন্যাসেও একাধিকবার তার ভয়ানক নৈঃসঙ্গ্যবোধের কথা বলা হয়েছে। তার কোনো আপনজন নেই যার সঙ্গে সে তার মনের একান্তভাব বিনিময় করতে পারে। কারণ, তাঁর সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক কেবলই বাইরের– কখনো প্রভাব বিস্তারের বা নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব আরোপের– কখনোই অন্তরের বা আবেগের নয়। সে কখনোই আবেগী হতে পারে না। কারণ তার জানা আছে আন্তরিকতা ও আবেগময়তা তার পতনের সূচনা করবে। আর তাতেই ধসে পড়তে পারে তিলতিল করে গড়ে তোলা তার মিথ্যার সাম্রাজ্য।

এসব সত্ত্বেও মজিদ যে আসলেই দুর্বল এবং নিঃসঙ্গ– এই সত্যটি ধরা পড়ে রহিমার কাছে। ঝড়ের রাতে জমিলাকে শাসনে ব্যর্থ হয়ে মজিদ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কীভাবে তরুণী বধূ জমিলাকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখবে সেই চিন্তায় একেবারে দিশেহারা বোধ করে। এরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যেই জীবনে প্রথম হয়ত তার মধ্যে আত্মপরাভবের সৃষ্টি হয়। নিজের শাসক-সত্তার কথা ভুলে গিয়ে রহিমার সামনে মেলে ধরে ব্যর্থতার আত্মবিশ্লেষণমূলক স্বরূপ : "কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও?" ওই ঘটনাতেই রহিমা বুঝতে পারে তার স্বামীর দুর্বলতা কোথায় এবং তখন ভয়, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির মানুষটি তার কাছে পরিণত হয় করুণার পাত্রে।

খালেক ব্যাপারী 'লালসালু' উপন্যাসের অন্যতম প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। ভূ-স্বামী ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ায় তাঁর কাঁধেই রয়েছে মহব্বতনগরের সামাজিক নেতৃত্ব। উৎসব-ব্রত, ধর্মকর্ম, বিচার-সালিশসহ এমন কোনো কর্মকাণ্ড নেই যেখানে তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়। নিরাক-পড়া এক মধ্যাহ্নে গ্রামে আগত ভণ্ড মজিদ তার বাড়িতেই আশ্রয় গ্রহণ করে। একসময় যখন সমাজে মজিদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খালেক ব্যাপারী ও মজিদ পরস্পর বজায় রেখেছে তাদের অলিখিত যোগসাজশ।

অবশ্য নিয়মও তাই। ভূ-স্বামী ও তথাকথিত ধর্মীয় মোল্লা-পুরোহিতদের মধ্যে স্ব স্ব প্রয়োজনে অনিবার্যভাবে গড়ে ওঠে নিবিড় সখ্য। কারণ দুদলের ভূমিকাই যে শোষকের। আসলে মজিদ ও খালেক ব্যাপারী দুজনেই জানে : 'অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উলটা পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক। হাজার বছর ধরেই শোষক শ্রেণির অপকর্মের চিরসাথী ধর্মব্যবসায়ীরা। তারা সম্মিলিত উদ্যোগে সমাজে টিকিয়ে রাখে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার। শিক্ষার আলো, মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও অধিকারবোধ সৃষ্টির পথে তৈরি করে পাহাড়সম বাধা– যাতে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত থাকে বিকশিত মানব চেতনা থেকে। এরই ফলে সফল হয় শোষক। শুধু ভূস্বামী শোষক কেন, যে কোনো ধরনের শোষকের ক্ষেত্রে একথা সত্য। তারা শোষণের স্বার্থে ধর্মব্যবসায়ীদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। একারণেই মজিদের সকল কর্মকাণ্ডে নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছে খালেক ব্যাপারী। এমনকি মজিদের প্রভাব প্রতিপত্তিও মেনে নিয়েছে অবনত মস্তকে; যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিজের একান্ত প্রিয় প্রথম স্ত্রী আমেনা বিবিকে তালাক দেয়া।

'লালসালু' উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খালেক ব্যাপারীর উপস্থিতি থাকলেও সে কখনোই আত্মমর্যাদাশীল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারেনি। আমরা জানি যে, ধর্মব্যবসায়ীরা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হিসেবে জাহির করে সাধারণ মানুষের ওপর প্রভুত্ব করে। ফলে শোষকরাও তাদের অধীন হয়ে যায়। কিন্তু শোষকদের হাতে যেহেতু থাকে অর্থ সেহেতু তারাও ধর্মব্যবসায়ীদের অর্থের শক্তিতে অধীন করে ফেলে। কিন্তু এখানে খালেক ব্যাপারীর চরিত্রে আমরা সে দৃঢ়তা কখনোই লক্ষ করি না। বরং প্রায় সব ক্ষেত্রেই মজিদের কথার সুরে তাকে সুর মেলাতে দেখা যায়। ফলে মজিদ চরিত্রের সঙ্গে সে কখনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়নি। তার অর্থের শক্তি সবসময় মাজার-শক্তির অধীনতা স্বীকার করেছে। তাঁর এই চারিত্রিক দৌর্বল্য ইতিহাসের ধারা থেকেও ব্যতিক্রমী।

মজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমা 'লালসালু' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। লম্বা চওড়া শারীরিক শক্তিসম্পন্না এই নারী পুরো উপন্যাস জুড়ে স্বামীর ব্যক্তিত্বের কাছে অসহায় হয়ে থাকলেও তার চরিত্রের একটি স্বতন্ত্র মাধুর্য আছে। লেখক নিজেই তার শক্তিমত্তাকে বাইরের খোলস বলেছেন, তাকে ঠাণ্ডা ভীতু মানুষ বলে পরিচিতি দিয়েছেন। তার এই ভীতি-বিহ্বল, নরম কোমল শান্ত রূপের পেছনে সক্রিয় রয়েছে ঈশ্বর-বিশ্বাস, মাজার-বিশ্বাস এবং মাজারের প্রতিনিধি হিসেবে স্বামীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও ভক্তি। ধর্মভীরু মানুষেরা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের কারণে যে কোমল স্বভাবসম্পন্ন হয় রহিমা তারই একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সমগ্র মহব্বতনগরের বিশ্বাসী মানুষদেরই সে এক যোগ্য প্রতিনিধি। স্বামী সম্পর্কে মাজার সম্পর্কে তার মনে কোনো প্রশ্নের উদয় হয় না, সে সর্বদাই নির্দ্বিধায় মেনে নেয় স্বামীর মুখ থেকে উচ্চারিত ধর্মের সকল বিধান। মাজার সংক্রান্ত সকল কাজকর্মের পবিত্রতা রক্ষা এবং তার নিজের সকল গার্হস্থ্য কর্ম প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই সে একান্তভাবে সৎ এবং নিয়মনিষ্ঠ। মাজার নিয়ে যেমন রয়েছে তার ভীতি ও ভক্তি, তেমনি এই মাজারের প্রতিনিধির স্ত্রী হিসেবেও রয়েছে তার মর্যাদাবোধ। এই মর্যাদাবোধ থেকেই সে গ্রামের মাজার ও মাজারের প্রতিনিধি সম্পর্কে গুণকীর্তন করে, তার শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস তুলে ধরে এবং এভাবে সে নিজেকেও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। হাসুনির মায়ের সমস্যা যখন সে তার স্বামীর কাছে জানায় কিংবা আমেনা বিবির সংকট মুহূর্তে তার পাশে গিয়ে অবস্থান নেয় তখন তার মধ্যে মাজার-প্রতিনিধির স্ত্রী হিসেবে গর্ববোধ কাজ করে। এ গর্ববোধ ছাড়াও এখানে সক্রিয় থাকে নারীর প্রতি তার একটি সহানুভূতিশীল মন। রহিমার মনটি স্বামী মজিদের তুলনায় একেবারেই বিপরীতমুখী।

মজিদের কর্তৃত্বপরায়ণতা, মানুষের ধর্মভীরুতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের দুরভিসন্ধি প্রভৃতির বিপরীতে রহিমার মধ্যে সক্রিয় থাকে কোমল হৃদয়ের এক মাতৃময়ী নারী। সেটি জমিলা প্রসঙ্গে লক্ষ করা যায়। তাদের সন্তানহীন দাম্পত্য-জীবনে মজিদ যখন দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব করে তখন রহিমার মধ্যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি হয় না। এর মূলে সক্রিয় তার স্বামীর প্রতি অটল ভক্তি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাস্তবতার প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এবং সরল ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু জমিলা যখন তার সতীন হিসেবে সংসারে আসে তখনও সামাজিক গার্হস্থ্য বাস্তবতার কারণে যেটুকু ঈর্ষা সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল তাও অনুপস্থিত থাকে তার ওই হৃদয়সংবেদী মাতৃমনের কারণে। জমিলা তার কাছে সপত্নী হিসেবে বিবেচিত হয় না রবং তার মাতৃহৃদয়ের কাছে সন্তানতুল্য বলে বিবেচিত হয়। এ পর্যায়ে জমিলাকে কেন্দ্র করে তার মাতৃত্বের বিকাশটি পূর্ণতা অর্জন করে যখন মজিদ জমিলার প্রতি শাসনের খড়ুগ তুলে ধরে।

স্বামীর সকল আদেশ নির্দেশ উপদেশ সে যেভাবে পালন করেছে সেইভাবে জমিলাও পালন করুক সেটি সেও চায় কিন্তু সে পালনের ব্যাপারে স্বামীর জোর-জবরদস্তিকে সে পছন্দ করে না। স্বামীর প্রতি তার দীর্ঘদিনের যে অটল ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য এক্ষেত্রে তাতে ফাটল ধরে। এক্ষেত্রে তার ধর্মভীরুতাকে অতিক্রম করে মুখ্য হয়ে ওঠে নিপীড়িত নারীর প্রতি তার মাতৃহৃদয়ের সহানুভূতি। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যাকে মনে হয়েছিল ব্যক্তিত্বহীন, একমাত্র আনুগত্যের মধ্যেই ছিল যার

জীবনের সার্থকতা, সেই নারীই উপন্যাসের শেষে এসে তার মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বময় হয়ে ওঠে। রহিমা চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে এখানেই লেখকের সার্থকতা।

নিঃসন্তান মজিদের সন্তান-কামনাসূত্রে তার দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে আগমন ঘটে জমিলার। শুধু সন্তান-কামনাই তার মধ্যে একমাত্র ছিল কীনা, নাকি তরুণী স্ত্রী-প্রত্যাশাও তার মাঝে সক্রিয় ছিল তা লেখক স্পষ্ট করেননি। কিন্তু বাস্তবে আমরা লক্ষ করি তার গৃহে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে যার আগমন ঘটে সে তার কন্যার বয়সী এক কিশোরী। জমিলার চরিত্রে কৈশোরক চপলতাই প্রধান। এই চপলতার কারণেই দাম্পত্য সম্পর্কের গাম্ভীর্য তাকে স্পর্শ করে না। এমনকি তার সপত্নী রহিমাও তার কাছে কখনো ঈর্ষার বিষয় হয়ে ওঠে না। রহিমা তার কাছে মাতৃসম বড়বোন হিসেবেই বিবেচিত হয় এবং তার কাছ থেকে সে তদ্রূপ স্নেহ আদর পেয়ে অভিমান-কাতর থাকে। রহিমার সামান্য শাসনেও তার চোখে জল আসে। তার ধর্মকর্ম পালন কিংবা মাজার-প্রতিনিধির স্ত্রী হিসেবে তার যেরূপ গাম্ভীর্য রক্ষা করা প্রয়োজন সে-ব্যাপারে তার মধ্যে কোনো সচেতনতাই লক্ষ করা যায় না ওই কৈশোরক চপলতার কারণে। প্রথম দর্শনে স্বামীকে তার যে ভাবী শ্বশুর বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, বিয়ের পরেও সেটি তার কাছে হাস্যকর বিষয় হয়ে থাকে ওই কৈশোরক অনুভূতির কারণেই। ধর্মপালন কিংবা স্বামীর নির্দেশ পালন উভয় ক্ষেত্রেই তার মধ্যে যে দায়িত্ববোধ ও সচেতনতার অভাব তার মূলে রয়েছে এই বয়সোচিত অপরিপক্বতা। মাজার সম্পর্কে রহিমার মতো সে ভীতিবিহ্বল নয় কিংবা মাজারের পবিত্রতা সম্পর্কেও নয় সচেতন এবং এই একই কারণে মাজারে সংঘটিত জিকির অনুষ্ঠান দেখার জন্য তার ভিতরে কৌতূহল মেটাতে কোথায় তার অন্যায় ঘটে তা উপলব্ধির ক্ষমতাও তার হয় না। সুতরাং স্বামী মজিদ যখন এসবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তার অনুচিত কর্ম সম্পর্কে তাকে সচেতন করে, তখন সেসবের কিছু তার কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না। সুতরাং তাকে শাসনের ব্যাপারে মজিদের সকল উদ্যোগই তার কাছে অত্যাচার কিংবা নিপীড়ন বলে মনে হয় এবং এই পীড়ন থেকে মুক্তি লাভের জন্য মজিদের মুখে যে সে থুথু নিক্ষেপ করে সেটাও তার মানসিক অপরিপক্বতারই ফল। এমনকি মাজারে যখন তাকে বন্দি করে রেখে আসে মজিদ তখন সেই অন্ধকারের নির্জনে ঝড়ের মধ্যে ছোট মেয়েটি ভয়ে মারা যেতে পারে বলে রহিমা যখন আতঙ্কে স্বামীর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তখনও জমিলাকে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দেখা যায়। এরূপ আচরণের মূলেও সক্রিয় থাকে তার স্বল্প বয়সোচিত ছেলেমানুষি, অপরিপক্বতা। অর্থাৎ এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'লালসালু' উপন্যাসে একটি প্রাণময় সত্তার উপস্থিতি ঘটিয়েছেন। শাস্ত্রীয় ধর্মীয় আদেশ নির্দেশের প্রাবল্যে পুরো মহব্বতনগর গ্রামে যে প্রাণময়তা ছিল রুদ্ধ, জমিলা যেন সেখানে এক মুক্তির সুবাতাস। রুদ্ধতার নায়ক যে মজিদ, ঔপন্যাসিক সেই মজিদের গৃহেই এই প্রাণময় সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

একদিকে সে নারী অন্য দিকে সে বয়সে তরুণী— এই দুটিই তার প্রাণধর্মের এক প্রতীকী উদ্ভাসন। এ উপন্যাসে মজিদের মধ্য দিয়ে যে ধর্মতন্ত্রের বিস্তার ঘটেছে তার পেছনে পুরুষতন্ত্রও সক্রিয়। সুতরাং নির্জীব ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে সজীব প্রাণধর্মের জাগরণের ক্ষেত্রে এ নারীকে যথাযথভাবেই আশ্রয় করা হয়েছে। জমিলা হয়ে উঠেছে নারীধর্ম, হৃদয়ধর্ম বা সজীবতারই এক যোগ্য প্রতিনিধি।

'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ ও খালেক ব্যাপারীর পরিবার ছাড়া আরেকটি পরিবারের কাহিনি গুরুত্ব লাভ করেছে। সেটি তাহের-কাদের ও হাসুনির মায়ের পরিবার। এদের পিতামাতার কলহ এবং তাই নিয়ে মজিদের বিচারকার্যের মধ্য দিয়ে তাহের-কাদেরের পিতা চরিত্রটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। উপন্যাসে এটিই একমাত্র চরিত্র যে মজিদের আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপারে অবিশ্বাস পোষণ করেছে, বিচার সভায় প্রদর্শন করেছে অনমনীয় দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব। তার নির্ভীক যুক্তিপূর্ণ ও উন্নত-শির অবস্থান নিশ্চিতভাবে ব্যতিক্রমধর্মী। সে মজিদের বিচারের রায় অনুযায়ী নিজ মেয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে ঠিকই কিন্তু তা মজিদের প্রতি শ্রদ্ধা বা আনুগত্যবশত নয়। মানবিক দায়িত্ববোধ থেকেই সে এ কাজ করেছে। তবে এর পরপরই তার নিরুদ্দেশ গমনের ঘটনায় এই চরিত্রের প্রবল ব্যক্তিত্বপরায়ণতা ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে। এই আচরণের মধ্য দিয়ে মজিদের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদও ব্যক্ত হয়েছে।

'লালসালু' উপন্যাসের কাহিনি অত্যন্ত সুসংহত ও সুবিন্যস্ত। কাহিনি-গ্রন্থনায় লেখক অসামান্য পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনির বিভিন্ন পর্যায়ে নাট্যিক সংবেদনা সৃষ্টিতে লেখক প্রদর্শন করেছেন অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা, ধর্মতন্ত্র ও ধর্মবোধের দ্বন্দ্ব, ধর্মতন্ত্র-আশ্রয়ী ব্যবসাবৃত্তি ও ব্যক্তির মূলীভূত হওয়ার প্রতারণাপূর্ণ প্রয়াস, অর্থনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে ধর্মতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য নাড়ির যোগ প্রভৃতি বিষয়কে লেখক এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ভাষায় রূপায়ণ করেছেন। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শেকড়হীন বৃক্ষপ্রতিম মজিদ, ধর্মকে আশ্রয় করে মহব্বনগরে প্রতিষ্ঠা-অর্জনে প্রয়াসী হলেও তার মধ্যে সর্বদাই কার্যকর থাকে অস্তিত্বের এক সূক্ষ্মতর সংকট। এরূপ সংকটের একটি মানবীয় দ্বন্দ্বময় রূপ সৃষ্টিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সার্থকতা বিস্ময়কর।

শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে—প্রদেশেরও; হয়ত-বা আরও দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখ থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিন-মান-ক্ষণের সবুর ফাঁসির শামিল। তাই তারা ছোটে, ছোটে।

অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন ঝিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌঁছোয় এ-দেশে তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাঁকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এইখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারুকাঁটা হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এদের বহির্মুখ উন্মত্ততা আগুনের হল্কার মতো পুড়িয়ে দেয় দেহ। রেলগাড়ির খুপরিগুলো থেকে আচমকা জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ-বা ভয় পেয়ে কেউ-বা অপরিসীম কৌতূহলে মুখ বাড়ায়, দেখে আবছা-অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে থাকা লোকদের। কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা? এ লাইনে যারা নতুন তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। কিন্তু এরা ছোটে। ছোটে আর চিৎকার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এতগুলো খুপরির মধ্যে কোনটাতে চড়লে কপাল ফাটবে—তাই যেন খুঁজে দেখে। ইতিমধ্যে আত্মীয়-স্বজন, জানপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারও জামা ছেঁড়ে, কারও টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুম্‌ড়ে যায়। কারও-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা—যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না—কী করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়—এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকড়া। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।

অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ ঝনঝন করে লোহালক্কড়ের ঝংকারে, উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ ওঠে ছুটে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায়। পানি খায় ঠিক মানুষের মতোই। আর অপেক্ষা করে। ধৈর্যের কাঁটা নড়ে না।

কেনই বা নড়বে? নিশুতি রাতে যে-দেশে এসে পৌঁছেছে সে-দেশ এখন অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও সে জানে যে, তাতে শস্য নেই। বিরান মাঠ, সর-ভাঙ্গা পাড় আর বন্যা-ভাসানো ক্ষেত। নদীগহ্বরেও জমি কম নেই।

সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোর বেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা ছেলেও আমসিপাড়া পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবির বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফ্‌জ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন-একটা ভাব জাগে। হাফেজ তার। বেহেশতে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন-একটা ভাব জাগে। শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে-দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে

তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরও আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোনো-এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব, কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দুরান্ত কোনো এক অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতালার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে চেয়ে আরও ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খন্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁদিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলসানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবদলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলীর মসজিদ–এমন কি গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়ত বাহে-মুলুকে, নয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রামে-যে গ্রামে পৌঁছুতে হলে, কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল– সেখানেও।

এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়ত একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যান। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

সে এই দুর্গম অঞ্চলে মিহি কণ্ঠের আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়।

পরে মৌলবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।

–আপনার দৌলতখানা?

শিকারি বলে।

–আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলবির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে!

শিকারিও পাল্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মৌলবির মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতালার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। ক্বচিৎ কখনো হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-সাতবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে–মৌলবির গলা। বুনো ভারী হাওয়ায় তার হাল্কা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়ত চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।

কিন্তু সেটা শিকারির কল্পনা। আস্তানায় ফিরে এসে বন্দুকের নল সাফ করতে করতে শিকারি কল্পনা করে সে-কথা। তবে নতুন এক আলোর ঝলকে মৌলবির চোখ যে দীপ্ত হয়ে ওঠে সে কথা জানে না; ভাবতেও পারে না হয়ত।

একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায়–মাঠপ্রান্তর আর-বিস্তৃত ধানক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রং দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে।

এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙ্গিতে দু-দুজন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। নিস্পন্দ ধান-ক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেল। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়; ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না। গলুই-এ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে একজন– চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাঁকে ফাঁকে সাপের সর্পিল সূক্ষ্মগতিতে সে-দৃষ্টি এঁকেবেঁকে চলে।

বিস্তৃত ধানক্ষেতের এক প্রান্তে তাহের-কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে– চোখে তার তেমনি শিকারির সূচাগ্র একাগ্রতা। পেছনে তেমনি মূর্তির মতো বসে কাদের ভাইয়ের ইশারার অপেক্ষায় থাকে। দাঁড় বাইছে, কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নিচে পানি নয়, তুলো।

হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে ওঠে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই পেছনে আঙুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বাঁয়ে। একটু বাঁয়ে ক-টা শিষ নড়ছে–নিরাকপড়া বিস্তৃত ধানক্ষেতে কেমন স্পষ্ট দেখায় সে-নড়া। আরও বাঁয়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙুল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এসব নির্দেশই দেয়।

ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটুও শব্দ হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ, ধানের শিষ এখনো ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা মুহূর্ত। দূরে যে-কটা নৌকা ধান-ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিল, সেগুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মতো টান-হয়ে-ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে। তারপর দেখে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো সেই কালো দেহের ঊর্ধ্বাংশ কেঁপে উঠল, তীরের মতো বেরিয়ে গেল একটা কোঁচ। স-ঝাক্।

একটু পরে একটা বৃহৎ রুই মুখ হাঁ-করে ভেসে ওঠে।

আবার নৌকা চলে। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে।

একসময় ঘুরতে ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে। কাদের পেছনে বসে তেমনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তার আঙ্গুলের ইশারার জন্য। হঠাৎ এক সময় দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব। সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শিষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয়–সেদিকে দৃষ্টি নেই।

একসময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুঁটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহব্বতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্নের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা–নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন যাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল। চোখ বুজে আছে। কোটরাগত নিমীলিত সেই চোখে একটুও কম্পন নেই।

এভাবেই মজিদের প্রবেশ হলো মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা নাটকেরই পক্ষপাতি। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে ঢুকবে তার চেয়ে বেশি পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বত্থ গাছ থেকে নেমে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এই জন্যে যে, তার আগমন, মুহূর্তে সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসী নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর।

শীর্ণ লোকটি চিৎকার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাতব্বর রেহান আলি ছিল। জোয়ান মদ্দ কালু মতি, তারাও ছিল। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

–আপনারা জাহেল, বে-এলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পিরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি

রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিল সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙ্গা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছোট ইটগুলো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মতো। শেয়ালের বাসা হয়ত। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পিরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপও ছিল। হাঁপানির রোগী। সে দম খিঁচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

–আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ।

–মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিল। গোলাভরা ধান, গরু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যেই অমন বিদেশ-বিভুঁইয়ে সে বসবাস করছিল। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের খাতির-যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিল; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতিমধ্যে বার-কয়েক শুনেছে সে-কথা, তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

–উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন...

বলতে বলতে মজিদের কোটরাগত ক্ষুদ্র চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।

গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়ি-ঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লিদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝেছিল যে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিল, ভয়ও ছিল। কিন্তু জমায়েতের আধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখেনি।

জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। ইট-সুরকি নিয়ে সেই প্রাচীন কবর সদ্যমৃত কোনো মানুষের কবরের মতো নতুন দেহ ধারণ করল। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মতো সে কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগল, মোমবাতি জ্বলতে লাগল রাতদিন। গাছপালায় ঢাকা স্থানটি আগে স্যাঁতসেঁতে ছিল, এখন রোদ পড়ে খটখটে হয়ে উঠল; হাওয়ারও ভাঁপসা গন্ধ খড়ের মতো শুষ্ক হয়ে উঠল।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকরা আসতে লাগল। তাদের মর্মন্তুদ কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মতো অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগল দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা-ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠল। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর। জমি হলো, গৃহস্থালি হলো। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের যে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল, মাছের পিঠের মতো সালু কাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চললো। হয়ত সামনের দিকে, হয়ত কোথাও নয়। সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়। বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে ঘরে, তাই যথেষ্ট। তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে ক্বচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না হয় তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সে সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তা ছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড় বের করা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে। ভাবে, খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।

একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেক দিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিল।

শেষে সেই মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এল। নাম তার রহিমা। সত্যি সে লম্বা-চওড়া মানুষ! হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেল, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোঁয়ার ধামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়, কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।

তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।

ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে,

–অমন করি হাঁটতে নাই।

থমকে গিয়ে রহিমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,

–অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। এই মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা–থেমে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুনাহ্।

এ-কথা আগেও শুনেছে রহিমা। মুরুব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়রা বলেছে। মজিদের কথার বাইরে সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।

মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে রহিমার চোখে ভয়।

মধুরভাবে হেসে আবার বলে,

–অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে।

শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তেলাওয়াত শুরু করে। গলা ভালো তার, পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্নাহেনার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।

কাজ করতে করতে রহিমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'আলার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অব্যক্ত ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।

গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ–চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।

মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। কখনো ঘরোয়া হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মতো ভাগ করে ফেলে। সে-জমিকেই আবার রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়ত দুনিয়ার দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে তারা বর্বরতার নীচতায় নেমে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এল খাবড়া দলাগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন মাংসের মতো জমিও তখন প্রাণের চাইতে বড় হয়ে ওঠে। খাবলা খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি–ফাটলধরা জ্যৈষ্ঠের জমি–সব জমি একান্ত আপন; কোনটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয় জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়ত কাঠফাটা রোদ, হয়ত মুষলধারে বৃষ্টি–তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলা মাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ পানি-খাওয়া মোটা কর্কশ ত্বকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে–তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্নে, সস্নেহে সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আবার শেষ নেই। কার্তিকে পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন সে-জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা পরিশ্রম। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা–ছড়াবার সময় না-তাকায় দিগন্তের পানে, না-স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়ত চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে

জ্বলেপুড়ে মরে। নধর নধর হয়ে-ওঠা কচি কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কোঁদে কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্রতিবেশীর মাথায় দা বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাদেরই বুক বিমর্ষ আকাশের তলে কচি নধর ধান দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খাঁ খাঁ করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে–মন-কে মন।

এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষ দিক বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোনো এক দুপুরে কালো মেঘের সঙ্গে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়ত না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরত্তি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে। এবং হয়ত তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়ত করে না।

মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খেলাল করে আর সে-কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বরে গুতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহিমার শরীরেতো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহিমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শিষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের শামিল খেয়াল করে না? শ্যেন দৃষ্টিতে অবশ্যি চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।

জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা।

শুনে, সালুকাপড়ে ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা ভূত-পূজারী। তারা গুনাগার।

জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে!

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালুকাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা–এ-কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদ আত্মবিশ্বাস পায়।

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে,

–কলমা জানো মিঞা?

ঘাড় গুঁজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিঞা। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে ওঠে মজিদ বলে,

–হাসিও না মিঞা!

থতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিঞা।

সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিল। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে। চোখ কিন্তু তার পিটপিট করে। বলে,

–আমি গরিব মুরুক্ষ মানুষ।

খোদাকে হয়ত সে জানে। কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে–গাধার মতো পিঠে-ঘাড়ে সমান।

এবার খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে,

–কলমা জানস্ না ব্যাটা?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারী একটি মক্তব দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ে জুটে গেছে। ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি–যে-দেশ ছেড়ে এসেছে, যে-শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান–সেখানে একদা এক মক্তবে এই রকম করে সে আমসিপারা পড়ত।

অবশেষে মজিদ আদেশ দেয়।

–ব্যাপারীর মক্তবে তুমি কল্‌মা শিখবা।

ঘাড় নেড়ে তখুনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,

–গরিব মানুষ, খাইবার পাই না।

লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রতত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়ত মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মতো ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।

মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারী ধমকে বলে,

–হইছে হইছে, ভাগ্।

সে-রাতে দোয়া-দরুদ সেরে মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে যে-মাঠ দূরে আবছাভাবে মিলিয়ে গেছে সেখান থেকে তারার রাজ্য। ওধারে গ্রামে নিস্তব্ধ। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহব্বতনগর গ্রামে সে-শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখাপ্রাশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে। আজ এই লোকদেরই খালেক ব্যাপারী চাবুক মারুক, প্রতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না-করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ওই সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।

মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহিমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ-গ্রামেরই মেয়ে রহিমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করত–সবার মনে সে-ছবি স্পষ্ট। প্রথম

বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে। কিন্তু ওরাই আজ এসে চেনে না। কথা কয় অন্যভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে। খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সন্তর্পণে কথা কয়। কাঁদলেও চেপে চেপে কাঁদে। বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়।

মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহিমা।

রহিমা শোনে তাদের কথা। কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে ওঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মতো স্তব্ধ, বিচিত্র সেই মাজারের পানে। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোনো বেয়াদবি করে বসে সে-ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে কখনো। তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, কোন মারুফ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন– যাঁর রুহ এখনো মানুষের দুঃখ যাতনায় কাঁদে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আকুল হয়ে থাকে সদাসর্বদা?

কখনো কখনো অতি সঙ্গোপনে রহিমা একটা আর্জি জানায়। বলে, তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে। তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন। আর্জি জানায় চোখের আকুলতায়, এদিকে ঠোঁট পর্যন্ত কাঁপে না। অতি গোপন মনের কথা শিশুর সরলতায়, সালুকাপড়ে ঢাকা রহস্যময় মাজারের পানে চেয়ে বলে–না-হয় লজ্জা, না-হয় দ্বিধা। একদিন হঠাৎ এই সময় দমকা হাওয়া ছোটে, জঙ্গলের যে-কটা গাছ আজো অকর্তিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে। হাওয়া এসে এখানে সালুকাপড়ের প্রান্ত নাড়ে; কেঁপে-ওঠা মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে ওঠে রুপালি ঝালর। রহিমাও কেঁপে ওঠে, কী একটা মহাভয় তার রক্ত শীতল করে দেয়। মনে হয়, কে যেন কথা কইবে, আকাশের মহা-তমসার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জেগে উঠবে। আবার স্থির হয়ে যায়, মোমবাতির শিখাও নিষ্কম্প, স্থির হয়ে ওঠে! ওপরে আকাশভরা তারা তেমনি নীরব।

কোনোদিন রহিমা সারা মানবজাতির জন্যে দোয়া করে। ও-পাড়ার ছুনুর বাপ মরণরোগ যন্ত্রণা পাচ্ছে, তাকে শান্তি দাও। খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে–তার ওপর করুণা কর, রহমত কর। চার গ্রাম পরে বড় নদী। ক-দিন আগে সে-নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন তোমার রহমত হয়।

অনেক সময় অদ্ভুত আর্জি নিয়ে মেয়েলোকেরা আসে রহিমার কাছে। যেমন আসে ধান-ভানুনি হাসুনির মা। বহুদিন আগে নিরাক পড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মাছ ধরতে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর যারা প্রথম মজিদকে দেখেছিল, সেই তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা। সে এসে বলে,

–আমার এক আর্জি।

এমন এক ভঙ্গিতে বলে যে রহিমার হাসি পায়। কিন্তু মনে মনেই হাসে, গম্ভীর হয়ে থাকে বাইরে। হাসুনির মা বলে,

–আমার আর্জি-ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।

এবার ঈষৎ হেসে রহিমা বলে;

–ক্যান গো বিটি?

–জ্বালা আর সইহ্য হয় না বুবু। আল্লায় যেন আমারে সত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।

সকৌতুকে রহিমা প্রশ্ন করে,

–তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মরলে?

সেদিকে তার ভাবনা নেই। আপনা থেকেই যেন উত্তর জোগায় মুখে।

–তুমি নিবা বুবু। তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হমু।

রহিমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।

একদিন হাসুনির মা এসে বলে,

–আমার এক আর্জি বুবু।

–কও?

ওনারে কইবেন– বুড়াবুড়ি দুইগারে জানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতা'লা। কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহিমা প্রশ্ন করে,

–ওইটা আবার কেমন কথা হইল?

–হ, খাঁটি কথা কইলাম বুবু। দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভাল্ লাগে না।

বুড়ো বাপ তার ঢেঙা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কুঁকড়ানো। কিন্তু দুজনের মুখে বিষ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখুনি হবার জোগাড়। ঢেঙা লোকটি তেড়ে আসে বারবার, ঘুণ ধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ি ওদিকে নড়েচড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাঁপিয়ে-ঝাঁকিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়।

শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।

তাহের-কাদের, আর কনিষ্ঠ ভাই রতন–তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘোরে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙল-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে–আর বর্ষায় টেকে কিনা সন্দেহ। তারা চুপ করে শোনে।

অন্ধ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,

–হুনছস্ কথা, হুনছস?

ছেলেরা সমস্বরে বলে,

–ঠ্যাঙা বেটিরে, ঠ্যাঙা।

সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌড়ে আসে। তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে। কাদের বোঝায়,

–থাক, কইবার দেও। খোদাই তার শাস্তি করবো।

জন্মের কথা নিয়ে মায়ের উত্তর শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে বুকে যন্ত্রণা হয়। তাই রহিমাকে এসে বলে কথাটা।

–হয় বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক–নয় ওনারে কন, এর একটা বিহিত করবার।

হঠাৎ সমবেদনায় রহিমার চোখ ছলছল করে ওঠে। বলে,

–তুমি দুঃখ করিও না বিটি। আমি কমুনে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে। দুস্থা মেয়ে। স্বামী মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে আছে। বাড়িতে তিন তিনটে মর্দ ছেলে, বসে-বসে খায়। এক মুঠোর মতো যে-জমি, সে-জমিতে ওদের পেট ভরে না। তাই টানাটানি, আধ-পেটা খেয়ে দিন গুজরান। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের। সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।

রহিমা বলে,

–শ্বশুরবাড়িতে যাওনা ক্যান?

–অরা মনুষ্যি না।

–নিকা কর না ক্যান?

কয়েক মুহূর্ত থেমে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুবু।

জীবনে তার আর সখ নেই। তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠ ভরে ধান ফললে অন্তরে তার রং ধরে। বতোর দিনে বাড়ি-বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই। মুখে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোনো দিনে তাহের খোশ মেজাজে বলে,

–শরীলে রং ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?

বুড়ি আমের আঁটির মতো মুখটা বাড়িয়ে বলে,

–খানকির বেটি নিকা করবো বলাই তো মানুষটারে খাইছে!

মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ করে। বলে, ক্যামনে খাইছস্?

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। হেসে বলে,–গিলা খাইছি! মা-বুড়ি আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটাও একবার দেখিয়ে দিত।

দূরে ধানক্ষেত্রে ঝড় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে অফুরন্ত ঢেউ। ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায়; নিকা করবি মাগি, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুকে পেলে করে কি? তেল-চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে।

পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়। এলে বলে,–তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে। মজিদ ধম্‌কে ওঠে।

–কও না ক্যান?

ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,

–তা হুজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যাম্‌নে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারী গলায় বলে,

–আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মর্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোন হেই কথা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ-কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অন্ধকার দেখে, চেলা কাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ করবার জন্য। এর মধ্যে একদিন হয়ত সে শেষই হয়ে যেত–যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিত। কিন্তু সে-কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আস্তে বলে,

–বুড়ির দেমাক খারাপ হইছে হুজুর। আপনে যদি দোয়া পানি দ্যান–

আবার কতকক্ষণ নীরব থেকে মজিদ বলে,

–বিবিরে কইয়া দিয়ো, অমন কথা যদি আর কোনোদিন কয় তাইলে মছিবত হইব।

মাথা নেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেমে মাথা চুলকে বলে,

–জুহুর, কোত্থিকা হুনলেন বেটির কথা?

–তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো–কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।

সারাপথ ভাবে বুড়ো। কে বললো কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোনো বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।

এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিল। সারাজীবন দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাই-এর সাথে জায়গাজমি-সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মামলা-মকদ্দমা করে আজ সব দিক দিয়ে সে নিঃস্ব। জায়গাজমির মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি–যা দিয়ে একজনেরই পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুইচোখের বিষ মনে হয়। বুড়িটার হয়ত তার ছোঁয়াচ লেগেই অমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে ছিল সে। স্থির থাকতো না এক মুহূর্ত, নাচতো কেবল নাচতো, আর খই-এর মতো কথা ফুটতো মুখ দিয়ে। আজ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এই হাল হয়েছে।

বুড়ি যে ছেলেদের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মায় গিয়ে খচ করে ধরে। কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা।

বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহে। তবে কী হাসুনির মা বলেছে? তার তো ও-বাড়িতে যাতায়াত আছে।

একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে-কথা সে বিশ্বাস করে না।

যত ভাবে কথাটা, তত জ্বলে ওঠে বুড়ো। যে বলেছে সে কি কথাটার গুরুত্ব বোঝে না? কথাটা কী বাইরে ছড়াবার মতো? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না–তা যতই আলেম-খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন। তা ছাড়া, কথাটায় যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই কে বলতে পারে! এককালে বুড়ি উড়ুনি মেয়ে ছিল, তার হাসি আর নাচন দেখে পাগল হত কত লোক। বৈমাত্রেয় ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জনরব উঠেছিল।

একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে-কাণ্ডটা নাকি ঘটেছিল। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙানি খেয়েও কথাটা যখন স্বীকার করেনি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, তা দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

অন্দরে ঢুকেই সামনে দেখলে হাসুনির মাকে। দেখেই চড়চড় করে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মতো গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর

শুরু হয় প্রহার। প্রহার করতে করতে বুড়োর মুখে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা—ওরে ভাতার-খাইকা জারুনি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিল না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাত্র বুড়ো নয়।

সেদিন দুপুরে মুখে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেল মজিদের বাড়ি। মজিদ তখন জিরুচ্ছে, আর সে ঘরেই নিচে পাটিতে বসে রহিমা কাঁথায় শেষ কটা ফুরন দিচ্ছে।

হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ সটান ঘরে ঢুকে তার সামনেই রহিমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিল। প্রথমে কিছু বোঝা গেল না। কথা স্পষ্টতর হয়ে এলে এইটুকু বোঝা গেল যে, সে রহিমাকে বলছে : ওনারে কন্, আমার মওতের জন্য জানি দোয়া করে।

মজিদ হুঁকা টানে আর চেয়ে চেয়ে দেখে। ক্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে—এমন একটা বৌ-এর স্বপ্ন দেখতো প্রথম যৌবনে। রহিমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা। অপরাধ না করে থাকলেও মজিদ বলছে বলে যে-কোনো কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।

পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ কিন্তু হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার মেয়েকে মেরেছে। মেরেছে এই জন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে রহিমাকে বলে,

—অরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।

একটু পরে রহিমা বলে,

—ও যাইবার চায় না। ডরায়।

মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা-টানা মাথা নত করে নখ দিয়ে পাটি খুটছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্য এক মুহূর্ত কৌতূহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে,—থাক তাইলে এইখানে।

অপরাহ্ণে জমায়েত হয়। একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। ঢেড়া বুড়ো লোকটা শয়তানের খাম্বা; অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্বাস।

খালেক ব্যাপারীও এসেছে। মাতব্বর না হলে শাস্তি বিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদই দেয়, কিন্তু সেটা মাতব্বরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।

একটু তফাতে পাছার ওপর বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো।

খালেক ব্যাপারী বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে,

—তোমার বিবি কী বলে?

মুখ না তুলে বুড়ো বলে,

–হেই কথা আপনারা ব্যাক্কই জানেন।

কে একজন গলা উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিঞা।

বুড়ো ওদিকে একবার ফিরেও তাকায় না।

খালেক ব্যাপারী আবার প্রশ্ন করে,

–এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকবার চাও ক্যান?

কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমতো–এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর বলে,

–এইটা কি কওনের কথা? বুড়িমাগি ঝুটমুট একখান কথা কয়–তা বইলা আমি কি পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিমু?

ওর কথা বলার ভঙ্গি ব্যাপারীর মোটেই ভালো লাগে না। মজিদ নীরব হয়ে থাকে, কিন্তু উত্তর শুনে তারও চোখ জ্বলে ধিকিধিকি।

লোকটির উত্তরে কিন্তু ভুল নেই। তাই প্রত্যুত্তরের জন্য সহসা কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে বলে,

–কথা ঠিক কইরা কইবার পারো না?

জমায়েতের মধ্যে কয়েকটা গলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে,–কথা ঠিক কইরা কও মিঞা, কথা ঠিক কইরা কও।

বৈঠক শান্ত হলে খালের ব্যাপারী আবার বলে,

–তুমি তোমার মাইয়ারে ঠ্যাঙাইছ ক্যান?

–আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙাইছি!–লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তাহেরের বাপ, যেন ভয় নেই ডর নেই। অবশ্য হাতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আঙুলগুলো কাঁপছে। ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে– বাইরে যত ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?

ব্যাপারী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার হাত নেড়ে মজিদ তাকে থামিয়ে নিজে বলবার জন্য তৈরি হয়। ব্যাপারটা আগে গোড়া থেকে ব্যাপারীকে বুঝিয়ে বলেছিল সে, এবং ভেবেছিল তার পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারীই কাজটা ঠিকমতো চালিয়ে নেবে। কিন্তু তার প্রশ্নগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। বলছে আর যেন ঠাস্ করে মুখের ওপর চড় খাচ্ছে।

মজিদ গম্ভীর গলায় বলে, ভাই সকল! বলে থেমে তাকায় সবার পানে। পিঠ সোজা করে বসেছে, কোলের ওপর হাত। আসল কথা শুরু করবার আগে সে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে, মনে হয় সে ছুরা ফাতেহা পড়ে তার বক্তব্য শুরু করবে। কিন্তু আরেকবার 'ভাই সকল' বলে সে কথা শুরু করে। বলে, খোদাতা'লার কুদরত মানুষের বুঝবার ক্ষমতা নাই। দোষ গুণ সৃষ্ট মানুষ। মানুষের মধ্যে তাই শয়তান আছে, ফেরেস্তাও আছে। তাদের মধ্যে গুনাগার আছে, নেকবন্দ আছে। কুৎসা রটনাটা বড় গর্হিত কাজ। কিন্তু যারা শয়তানের চাতুরি বুঝতে পারে না, যারা তাদের লোভনীয় ফাঁদে ধরা দেয় এবং খোদার ভয়কে দিল থেকে মুছে ফেলে–তারা এইসব গর্হিত কাজে নিজেদের লিপ্ত করে। মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বস্তু; সে-রসনা বিষাক্ত সাপের রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রক্ষিপ্ত সে-রসনা তার বিষে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে সমগ্র পৃথিবীতে।

ঋজুভঙ্গিতে বসে গম্ভীর কণ্ঠে ঢালু সুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তব্ধ ঘরে তার কণ্ঠে একটা সুর তোলে, যে-সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।

একবার মজিদ থামে। শান্ত চোখ; কারও দিকে তাকায় না। দাড়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে তারপর আবার শুরু করে,

–পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পঞ্চম হিজরিতে প্রিয় পয়গম্বর বানি এল মুস্তালিখ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় তাঁর ছোট বিবি আয়েশা কী করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। এক নওজোয়ান সিপাই তাঁকে খুঁজে পায়। পেয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়দল হেঁটে প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাদের অন্তরে শয়তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব– যারা তারই চক্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বঞ্চিত করে রাখে, তাদেরই বিষাক্ত রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠল। হজরতের এতো পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটাতে লাগল। বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর। খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এয়া খোদা পরবদ্দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কেন এ-অকথ্য বদনাম সহ্য করবে? উত্তরে খোদাতা'লা মানবজাতিকে বললেন–

থেমে বিসমিল্লাহ পড়ে মজিদ ছুরায়ে আন-নূর থেকে খানিকটা কেরাত করে শোনায়। তার গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ মিহি সুরে ভেঙে পড়ে। স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝংকার ওঠে। শুনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে।

হঠাৎ একসময়ে মজিদ কেরাত বন্ধ করে সরাসরি তাহেরের বাপের পানে তাকায়। যে-লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়েছিল, তার চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ধত ভাবটাও যেন নেই। চোখাচোখি হতে সে চোখ নাবায়।

কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে থেকে গলা উঠিয়ে মজিদ বলে যে, খোদাতা'লার ভেদ তাঁরই সৃষ্ট বান্দার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উদ্ধত করেও সৃষ্টি করেছেন তাকে, মাটির মতো করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, মানুষের কাছে আপন সংসার, আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়। তাদেরই সুখ-শান্তির জন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের সঙ্গে লড়াই করে। আপন সংসারের ভালো ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কিন্তু যে মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাঙতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙুল ওঠায়। তার গুনাহ্ বড় মস্ত গুনাহ্ তার শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি।

হঠাৎ মজিদের গলা ঝনঝন করে ওঠে।

–তুমি কী মনে করো মিঞা? তুমি কি মনে করো তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?

যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারীর মতো লোকের মুখের ওপর ঠাস্ ঠাস্ জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ–এতদিন পর আজ সন্দেহ! বহুদিন আগে তার বউ যখন চড়ুই পাখির মতো নাচত, হাসিখুশি উচ্ছলতায় চারিদিকে আলো ছড়াতো, তখন যে-জনরব উঠেছিল সে-কথাই তার স্মরণ হয়। কোনদিন সে-কথা

সে বিশ্বাস করেনি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতোও, সে তাকে তালাক দিতে পারত। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেমানান দেখাত না। কিন্তু আজ এত দিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিল, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ শুধু কঙ্কাল, পচনধরা মাংসের রদ্দি খোলস–তাকে নিয়ে সে কী করবে? অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে যে-ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে আবার বলে,

–কী মিঞা? তোমার দিলে কি ময়লা আছে? তুমি কি ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোনো কথা?

মজিদ থামলে ঘরময় রুদ্ধনিঃশ্বাসের স্তব্ধতা নামে এবং সে-স্তব্ধতার মধ্যে তার কেরাতের সুরব্যঞ্জনা আবার যেন আপনা থেকেই ঝংকৃত হয়ে ওঠে। সে ঝংকায় মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।

তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যই অমন ঝুটমুট কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশেষে অসহায়ের মতো তাহেরের বাপ বলে,

–কী কমু? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?

–কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, থই পাচ্ছে না কোথাও।

–তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙাইছ ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীল হইছে ক্যান?

সভা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিভ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না। বরঞ্চ তাকে দেখে মনে এখন বিদ্বেষ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছটফট করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।

হঠাৎ ঋজু হয়ে বসে মজিদ চোখ বোজে। তারপর সে বিসমিল্লাহ পড়ে আবার কেরাত শুরু করে। মুহূর্তে মিহি মধুর হয়ে ওঠে তার গলা, শান্তির ঝরনার মতো বেয়ে-বেয়ে আসে, ঝরে-ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়।

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজি বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কাঁদে, ব্যাঘাত করে না তার কান্নায়। অবশেষে কান্না থামলে মজিদ শান্ত গলায় বলে,

–তুমি কিংবা তোমার বিবি গুনাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাপ চাইবা, তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখবা। আর মাজারে সিন্নি দিবা পাঁচ পইসার।

মজিদ নিজে তার মাফ দাবি করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হুকুম তামিল করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হয়, সারা গ্রামের জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্লজ্জভাবে সায় দিয়ে এসেছে বুড়ির কথায়। সেকথার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, বরঞ্চ পরিষ্কারভাবে বলে এসেছে সে-কথা সত্যিই। এবং লোককে এ-কথাও জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ের কথা দোষিণীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে। কারণ তার মেরুদণ্ড নেই। সে-কথা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ রক্ত চড়চড় করে ওঠে। ভাবে, ওঠে গিয়ে চেলাকাট দিয়ে এ-মুহূর্তেই বুড়ির আমসিপানা মুখখানা ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদে দেহ ছেয়ে থাকে। চুপচাপ শুয়ে কেবল ভাবে। পৌরুষের গর্ব ধুলিসাৎ হয়ে আছে যেন।

আর সে ওঠেই না। বুড়ি মাঝে মাঝে শান্ত গলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে,

–দেখ তো, ব্যাটা কি মরলো নাকি?

ছেলেরা ধমকে ওঠে মায়ের ওপর। বলে, কী যে কও! মুখে লাগাম নাই তোমার? হতাশ হয়ে বুড়ি বলে,

–তাই ক। আমার কি তেমন কপালডা!

আর মারবে না প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বড় ভয়ে-ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে এসেছিল। ভয় যে, সেখানে যা বলেছে, কিন্তু একবার হাতে-নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন করে ফেলবে বুড়ো। সে এখন অবাক হয়ে ঘুরঘুর করে। উঁকি মেরে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটি চেয়ে দেখে কখনো-কখনো। কখনো-বা আড়াল থেকে শুষ্ক গলায় প্রশ্ন করে,

–বাপজান, খাইবা না?

বাপ কথা কয় না।

দু-দিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে-ভারী কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে; মহব্বত নগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দি পাখির মতো আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মতো শোঁ করে নেবে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতির মতো ঠেলে এগিয়ে যায়।

ঝড় এলে হাসুনির মার হই হই করার অভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেল রে, ছাগলটা কোথায় গেল রে, লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা কোথায় গেল রে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি করে, আথালি-পাথালি ছুটোছুটি করে, আর কী-একটা আদিম উল্লাসে তার দেহ নাচে।

ঝড় আসছে হু-হু করে, কিন্তু হাসুনির মা মুরগিটা খুঁজে পায় না। পেছনে ঝোপঝাড়ে দেখে, বাইরে যায়, ওধারে আমগাছে আশ্রয় নিয়েছে কি না দেখে, বৃষ্টির ঝাপটায় বুজে আসা চোখে পিট-পিট করে তাকিয়ে কুর-কুর আওয়াজ করে ডাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শেষে ভাবে, কী জানি, হয়ত বাপের মাচার তলেই মুরগিটা গিয়ে লুকিয়েছে। পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকে মাচার তলে উঁকি মারতেই তার বাপ হঠাৎ কথা বলে। গলা দুর্বল, শূন্য-শূন্য ঠেকে। বলে,

–আমারে চাইরডা চিড়া আইনা দে।

মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছু চিড়াগুড় এনে দেয়।

বাপ গবগব করে খায়। ক্ষিধা রাক্ষসের মতো হয়ে উঠেছে।

চিড়া কটা গলাধঃকরণ করে বলে,

–পানি দে ।

মেয়ে ছুটে পানি আনে। সর্বাঙ্গ তার ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। অনুতাপ আর মায়া-মমতায় বাপের কাছে সে গলে গেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে।

বুড়ো ঢকঢক করে পানি খায়। তারপর একটু ভাবে। শেষে বলে,

–আর চাইরডা চিড়া দিবি মা?

মেয়ে আবার ছোটে। চিড়া আনে আরও, সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে।

দু-দিনের রোজা ভেঙে বুড়ো ধনুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে মাচার ওপর অনেকক্ষণ বসে-বসে ভাবে, দৃষ্টি কোণের অন্ধকারের মধ্যে নিবদ্ধ।

বাইরে হাওয়া গোঙিয়ে-গোঙিয়ে ওঠে, ঘরের চাল হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় গুমরায়। সিক্ত কাপড়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেয়ে নীরব হয়ে থাকে। হঠাৎ কেন তার চোখ ছলছল করে। তবে ঘরের অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখের মধ্যে সে-অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়।

অবশেষে বাপ বলে–মাইয়া, তোর কাছে মাপ চাই। বুড়া মানুষ, মতিগতির আর ঠিক নাই। তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে-দিন।

মেয়ে কী বলবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোঁজার অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে আরও পানি আসে, হু হু করে, অর্থহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো কোথায় চলে গেল। কেউ বলতে পারল না গেল কোথায়। ছেলেরা অনেক খোঁজে। আশপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে তিন ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে। কেউ বলে, নদীতে ডুবছে। তাই যদি হয় তবে সন্ধান পাবার জো নেই। খরস্রোতা বিশাল নদী, সে-নদী কোথায় কত দূরে তার দেহ ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

ঘরে বুড়ি স্তব্ধ হয়ে থাকে। যে তার মৃত্যুর জন্য এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা কয় না। হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি-মধুর কোরান তেলাওয়াত শুনেছে অনেক দিন। সে আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,

–আল্লা-আল্লা কও মা।

বুড়ি তখন জেগে ওঠে কয়েকবার শিশুর মতো বলে, আল্লা, আল্লা–

মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে যে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ–যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে–সব খোদা ভালোর জন্যই করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমন নিত্যনিয়ত তিনি যা করেন তার গূঢ়তত্ত্ব বোঝাও দুষ্কর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত মানুষের মঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।

ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথায় ভেসে উঠেছে কি না জানার জন্য কৌতূহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি, তাদের মধ্যে অবশ্য প্রশ্নটি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে– প্রশ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ, উঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থই পায় না। যেখানে জন্ম-মৃত্যু, ফসল হওয়া–না–হওয়া, বা খেতে পাওয়া-না-পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে একটি লোকের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা কতখানি আর কৌতূহল জাগাতে পারে। যা মানুষের স্মরণে জাগ্রত হয়ে থাকে বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজিদের সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিল, পাপের জ্বালায় কেমন অস্থির-অস্থির করেছিল-যেন দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তানের শক্তি ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল সে-কান্নার মধ্যে।

এ বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মতো চির নীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘ্যনীয় রহস্যে আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই সম্ভব মহাসত্যকে ভেদ করা, অনাবৃত করা। মজিদের ক্ষুদ্র চোখ দুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টি-রহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়–সে-কথা এরা বোঝে।

হাসুনির মার মনেও প্রশ্ন নেই। মাসগুলো ঘুরে এলে বরঞ্চ বাপের নিরুদ্দেশ হবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পায়।

–খোদার জিনিস খোদা তুইলা লইয়া গেছে!

তারপর মার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানে।

–বাপ আমাগো নেকবন্দ মানুষ আছিল।

বুড়ি কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপচাপ থাকে।

প্রথম প্রথম হাসুনির মা মজিদের বাসায় আসত না। লজ্জা হতো। মার লজ্জা নেই বলে তার লজ্জা। তারপর ক্রমে ক্রমে আসতে লাগল। কখনো কৃচিৎ মজিদের সামনাসামনি হয়ে গেলে মাথায় আধহাত ঘোমটা টেনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াত, আর বুকটা দুরু দুরু কাঁপত ভয়ে। বতোর দিনে এ-বাড়িতে যাতায়াত যখন বেড়ে গেল তখন একদিন উঠানে একেবারে সামনাসামনি হয়ে গেল। মজিদের হাতে হুঁকা। হাসুনির মা ফিরে দাঁড়িয়েছে এমন সময়ে মজিদ বলে,

–হুঁকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেও গো বিটি।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হুঁকাটা নেয়। বুক কাঁপতে থাকে ধপধপ করে, আর লজ্জায় চোখ বুজে আসতে চায়।

হুঁকাটা দিতে গিয়ে মজিদ কয়েক মুহূর্ত সেটা ধরে রাখে। তারপর হঠাৎ বলে, আহা!

তার গলা বেদনায় ছলছল করে।

তারপর থেকে সংকোচ আর ভয় কাটে। ক্রমে ক্রমে সে খোলা–মুখে সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া শুরু করে। না করে উপায় কী! বতোর দিনে কাজের অন্ত নেই। মানুষ তো রহিমা আর সে। ধান এলানো-মাড়ানো, সিদ্ধ করা, ভানা–কত কাজ।

একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনির মা তার পুরানো আর্জি জানায়। রহিমাকে বলে,

–ওনারে কন, খোদায় জানি আমার মওত দেয়।

হঠাৎ রহিমা রুষ্ট স্বরে বলে,

–অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বালা আইসে।

পরদিন মজিদ একটা শাড়ি আনিয়ে দেয়। বেগুনি রং, কালো পাড়। খুশি হয়ে হাসুনির মা মুখ গম্ভীর করে। বলে,

–আমার শাড়ির দরকার কী বুবু? হাসুনির একটা জামা দিলে ও পরত খন।

হঠাৎ কী হয়, রহিমা কিছু বলে না। অন্যদিন হলে, কথা না বলুক অন্তত হাসত। আজ হাসেও না।

পৌষের শীত। প্রান্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপায়। গভীর রাতে রহিমা আর হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করে। খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে সারা উঠানটা। ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সে-কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাঁপের। যেন শতসহস্র সাপ শিস দেয়।

শেষ রাতের দিকে মজিদ ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সে-ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে–আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে–আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ আশ-পাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে শিরশির করে। তাই শোনে আর আশ-পাশ করে মজিদ। তারই মধ্যে কখন দ্রুততর, ঘনতর হয়ে ওঠে মুহূর্তগুলো।

এক সময় মজিদ আবার বেরিয়ে আসে। এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জ্বল বাহু-কাঁধ-গলার জন্য যে–রহিমাকে সে লক্ষ করেনি, সে–রহিমাকেই ডাকে। ডাকের স্বরে প্রভুত্ব! দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন। খড়কুটোর আলোর জন্য ওপরে আকাশ তেমনি অন্ধকার। সীমাহীন সে-আকাশ এখন কালো আবরণে সীমাবদ্ধ। মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।

রহিমা ঘরে এলে মজিদ বলে,

–পা-টা একটু টিপা দিবা?

এ-গলার স্বর রহিমা চেনে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মূর্তির মতো কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,

–ওই ধারে এত কাম ফজরের আগে শেষ করন লাগবো।

–থোও তোমার কাজ! মজিদ গর্জে ওঠে। গর্জাবে না কেন। যে-ধান সিদ্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। সে মালিকানায় এক আনারও অংশীদার নেই কেউ।

রহিমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি ফসল ধরেছে। ঝুঁকে–ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোকে। শীতের রাতে ভারী হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ!

অন্ধকারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ। মনের অস্থিরতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কি কোনো কথা? তবে জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্রভুও অস্থির-অস্থির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম, ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। উঠানে আগুন নিভে এসেছে, উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহিমা ফিরে এসে মুখ তুলে চায় না। হাসুনির মা দাঁতে চিবিয়ে দেখছিল, ধান সিদ্ধ হয়েছে কি না। সেও তাকায় না রহিমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে।

তারপর পূব আকাশ হতে স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, শ্লথগতি আলো এসে রাতের অন্ধকার যখন কাটিয়ে দেয় তখন হঠাৎ ওরা দুজনে চমকে ওঠে। মজিদ কখন ওঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গ্রীষ্ম প্রত্যুষের ঝিরঝির হাওয়ার মতো ভেসে আসে!

ওরা তাকায় পরস্পরের পানে। নতুন এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে। তাঁর নামোচ্চারণে সংকোচ কাটে।

লোকদের সে যাই বলুক, বতোর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোন পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগড়ার পর মগড়া ধানে ভরে ওঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে-চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে।

শুনে মজিদ মুখ গম্ভীর করে। দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার রহমত। খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, আর তানার দোয়া।
শুনে কারও কারও চোখ ছলছল করে ওঠে, আর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। কেন আসবে না। ধান হয়েছে এবার। মজিদের ঘরে যেমন মগড়াগুলো উপচে পড়ছে ধানের প্রাচুর্যে, তেমনি ঘরে-ঘরে ধানের বন্যা। তবে জীবনে যারা অনেক দেখেছে, যারা সমঝদার, তারা অহংকার দাবিয়ে রাখে। ধানের প্রাচুর্যে কারও কারও বুকে আশঙ্কাও জাগে।
বস্তুত, মজিদকে দেখে তাদের আসল কথা স্মরণ হয়। খোদার রহমত না হলে মাঠে-মাঠে ধান হতে পারে না। তাঁর রহমত যদি শুকিয়ে যায়–বর্ষিত না হয়, তবে খামার শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে। বিশেষ দিনে সে-কথাটা স্মরণ করবার জন্য মজিদের মতো লোকের সাহায্য নেয়। তার কাছেই শোকর গুজার করবার ভাষা শিখতে আসে। অপূর্ব দীনতায় চোখ তুলে মজিদ বলে, দুনিয়াদারি কি তার কাজ? খোদাতা'লা অবশ্য দুনিয়ার কাজকামকে অবহেলা করতে বলেননি, কিন্তু যার অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কি আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে? –বলে মজিদ চোখ পিট-পিট করে–যেন তার চোখ ছলছল করে উঠেছে। যে শোনে সে মাথা নাড়ে ঘন-ঘন। অস্পষ্ট গলায় সে আবার বলে,
–খোদার রহমত সব।

আরও বলে যে, সে-রহমতের জন্য সে খোদার কাছে হাজারবার শোকরগুজারি করে। কিন্তু আবার দু-মুঠো ভাত খেতে না পেলেও তার চিন্তা নেই। খোদার ওপর যার প্রাণ-মন-দেহ ন্যস্ত এবং খোদার ওপর যে তোয়াক্কল করে, তার আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে ভাবনা! বলতে বলতে এবার একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মজিদের মুখে, কোটরাগত চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।

তার যে-চোখে দিগন্তপ্রসারী দূরত্ব জেগে ওঠে, সে-চোখ ক্রমশ সূক্ষ্ম ও সূচাগ্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

–তোমার কেমন ধান হইল মিঞা?

তুমি বলুক আপনি বলুক সকলকে মিঞা বলে সম্বোধন করার অভ্যাস মজিদের। লোকটি ঘাড় চুলকে নিতি-বিতি করে বলে,-যা-ই হইছে তা-ই যথেষ্ট। ছেলেপুলে লইয়া দুই বেলা খাইবার পারুম।
আসলে এদের বড়াই করাই অভ্যাস। পঞ্চাশ মন ধান হলে অন্তত একশ মন বলা চাই। বতোর দিনে উঁচিয়ে উঁচিয়ে রাখা ধানের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো চাই। লোকটির ধান ভালোই হয়েছে, বলতে গেলে গত দশ বছরে এমন ফসল হয়নি। কিন্তু মজিদের সামনে বড়াই করা তো দূরের কথা, ন্যায্য কথাটা বলতেই তার মুখে কেমন বাধে। তা ছাড়া, খোদার কালাম জানা লোকের সামনে ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কী কথা বললে কি হবে বুঝে না ওঠে সতর্কতা অবলম্বন করে।
কথার কথা কয় মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লক্ষ থাকে না। তার অন্তরে ক্রমশ যে আগুন জ্বলে উঠছে, তারই শিখার উত্তাপ অনুভব করে। সে-উত্তাপ ভালোই লাগে।
লোকটি অবশেষে ওঠে দাঁড়ায়। তবে যাবার আগে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে যে, মজিদ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। এবং যে-আগুন জ্বলে উঠছিল অন্তরে, তা মুহূর্তে নির্বাপিত হয়। সংক্ষেপে ব্যাপারটি হলো এই। -গৃহস্থদের গোলায়-গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পিরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির–যত্নটা হয়, মানুষের মেজাজটাও খোলাসা থাকে। যেবার আকাল পড়ে, সেবার অতি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা ঢেলে থাকতে ভরসা হয় না পির সাহেবদের।

দিন কয়েক হলো তিন গ্রাম পরে এক পির সাহেব এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খঁ তাঁর পুরোনো মুরিদ। তিনি সেখানই উঠেছেন।

পির সাহেবের যথেষ্ট বয়স। লোকে বলে, এক কালে আগুন ছিল তাঁর চোখে, আর কণ্ঠে বজ্রনিনাদ। একদা তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক স্থান থেকে নাকি খোদার বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড পথশ্রম স্বীকার করে এ-দূর দেশে আসেন। সে কত দিন আগে তা পির সাহেবও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্তু এ-অজ্ঞতা স্বীকার্য নয় বলে কোনো এক পাঠান বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে হিসাব মিলিয়ে সে-স্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়।

যে-দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সঙ্গে আজ অবশ্য কোনো সম্বন্ধ নেই–কেবল বৃহৎ খড়ুগনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি ছাড়া। ময়মনসিংহ জেলার কোনো এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করছেন বলে তাঁদের ভাষাটাও এমন বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে যে, মুরিদানির কাজ করবার প্রাক্কালে উত্তর-ভারতে কোনো-এক স্থানে গিয়ে তাঁকে উর্দু জবান এস্তেমাল করে আসতে হয়েছিল।

পির সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই; তাঁর সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে-গল্প তাঁর রুহানি তাকত ও কাশ্‌ফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জানাজা–পড়ানো খোন্‌কার-মোল্লার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উঁচুতে, কিন্তু রুহানি তাকত তার নেই বলে অন্তরে-অন্তরে দীনতা বোধ করে। কখনো-কখনো খোলাখুলিভাবে লোকসমক্ষে সে-দীনতা ব্যক্ত করে। কিন্তু করে এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে, তা মহৎ ব্যক্তির দীনতা প্রকাশের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে মজিদ নিশ্চিন্ত থাকে।

কিন্তু জাঁদরেল পিররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ কিন্তু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে।

অন্যের আত্মার শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা, প্রকাশের কথা নয়। অতএব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও সে আশ্চর্য ধৈর্যসহকারে অন্যের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে। বলে, খোদাতা'লার ভেদ বোঝা কি সহজ কথা? কার মধ্যে তিনি কী বস্তু দিয়েছেন সে কেবল তিনিই বলতে পারেন।

এবার মজিদের মন কিন্তু কদিন ধরে থম থম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পির সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পির সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্নিকটে গিয়ে তার নুরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারও চোখ ঝলসে যায়, কারও এমন চোখ–ভাসানো কান্না পায় যে, তার এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা, তারা পির সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক-গন্ধ-ভারী বুকের হাওয়াও লাভ করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মজিদ গম্ভীর হয়ে থাকে। রহিমা গা টেপে, কিন্তু টেপে যেন আস্ত পাথর। অবশেষে মজিদকে সে প্রশ্ন করে-আপনার কী হইছে?

মজিদ কিছু বলে না।

উত্তরের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহিমা হঠাৎ বলে,

–এক পির সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?

পাথর এবার হঠাৎ নড়ে। আবছা অন্ধকারে মজিদের চোখ জ্বলে ওঠে। ক্ষণকাল নীরব থেকে হঠাৎ কটমট করে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে,

–মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?

প্রশ্নটা কৌতূহলের নয় দেখে রহিমা দমে গেল। তারপর আর কোনো কথা হয় না। এক সময় রহিমা পাশে শুয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ে।

মজিদ ঘুমোয় না। সে বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার কিছু একটা না করলে নয়। আজও অপরাহ্নে সে দেখেছে, মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে-দলে লোক চলছে উত্তর দিকে।

মজিদ ভাবে আর ভাবে। রাত যত গভীর হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষের নির্বোধ বোকামির জন্য আর তার অকৃতজ্ঞতার জন্য একটা মারাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। সে ছটফট করে একটা নিষ্ফল ক্রোধে।

একসময় ভাবে, ঝালর-দেয়া সালুকাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে, একদিন মাথায় খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলে দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায় তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন। মজিদ তার ঘরবাড়ি বিক্রি করে সরে পড়বে দুনিয়ার অন্য পথে-ঘাটে। এ-বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কি যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে?

অবশ্য এ-ভাবনা গভীর রাতে নিজের বিছানায় শুয়েই সে ভাবে। যখন মাথা শীতল হয়, নিষ্ফল ক্রোধ হতাশায় গলে যায়, তখন সে আবার গুম হয়ে থাকে। তারপর শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ একটি চিকন বুদ্ধিরশ্মি প্রতিফলিত হয়।

শীঘ্র তার চোখ চকচক করে ওঠে, শ্বাস দ্রুততর হয়। উত্তেজনায় আধা ওঠে বসে অন্ধকার ভেদ করে রহিমার পানে তাকায়। পাশে সে অঘোর ঘুমে বেচাইন।

তাকেই অকারণে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে-চেয়ে দেখে মজিদ, তারপর আবার চিত হয়ে শুয়ে চোখখোলা মৃতের মতো পড়ে থাকে।

মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌঁছল তখন সূর্য হেলে পড়েছে। মতলুব মিঞার বাড়ির সামনেকার মাঠটা লোকে-লোকারণ্য। তার মধ্যে কোথায় যে পির সাহেব বসে আছেন বোঝা মুশকিল। মজিদ বেঁটে মানুষ। পায়ের আঙুলে দাঁড়িয়ে বকের মতো গলা বাড়িয়ে পির সাহেবকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালো মাথার সমুদ্রে দৃষ্টি কেবল ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

একজন বললে যে, বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন। তখন মাঘের শেষাশেষি। তবু জন-সমুদ্রের উত্তাপে পির সাহেবের গরম লেগেছে বলে তাঁর গায়ে হাতির কানের মতো মস্ত ঝালরওয়ালা পাখা নিয়ে হাওয়া করছে একটি লোক। কেবল সে-পাখাটা থেকে-থেকে নজরে পড়ে।

মুখ তুলে রেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল মজিদ। সামনে শত শত লোক সব বিভোর হয়ে বসে আছে, কেউ কাউকে লক্ষ করবার কথা নয়। মজিদকে চেনে এমন লোক ভিড়ের মধ্যে অনেক আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ আজ তাকে চেনে না। যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পির সাহেব আজ দফায়-দফায় ওয়াজ করছেন। যখন ওয়াজ শেষ করে তিনি বসে পড়েন তখন অনেকক্ষণ ধরে তার বিশাল বপু দ্রুত শ্বসনের তালে-তালে ওঠা-নাবা করে, আর শুভ্র চওড়া কপালে জমে ওঠা বিন্দু-বিন্দু ঘাম খোলা মাঠের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে। পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি জোরে হাত চালায়।

এ-সময় পির সাহেবের প্রধান মুরিদ মতলুব মিয়া হুজুরের গুণাগুণ সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলে। একথা সর্বজনবিদিত যে, সে বলে, পির সাহেব সূর্যকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণ দিয়ে বলে হয়ত তিনি এমন এক জরুরি কাজে আটকে আছেন যে ওধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না হুকুম দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য এক আঙুল নড়তে পারে না। শুনে কেউ আহা-আহা বলে, কারও-বা আবার ডুকরে কান্না আসে।

কেবল মজিদের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে সে মূর্তিবৎ বসে থাকে। আধা ঘণ্টা পরে শীতের দ্বিপ্রাহরিক আমেজে জনতা ঈষৎ ঝিমিয়ে এসেছে, এমনি সময়ে হঠাৎ জমায়েতের নানাস্থান থেকে রব উঠল। একটা ঘোষণা মুখে-মুখে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল। –পির সাহেব আবার ওয়াজ করবেন।

পির সাহেবের আর সে-গলা নেই। সূক্ষ্ম তারের কম্পনের মতো হাওয়ায় বাজে তাঁর গলা। জমায়েতের কেউ না কেউ প্রতি মুহূর্তে হা-হা করে উঠছে বলে সে-ক্ষীণ আওয়াজও সব প্রান্তে শোনা যায় না। কিন্তু মজিদ কান খাড়া করে শোনে এবং শোনবার প্রচেষ্টার ফলে চোখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পির সাহেবের গলার কম্পমান সূক্ষ্ম তারের মতো ক্ষীণ আওয়াজই আধ ঘণ্টা ধরে বাজে। তারপর বিচিত্র সুর করে তিনি একটা ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।

বলেন, সোহবতে সোয়ালে তুরা সোয়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)। শুনে জমায়েতের অর্ধেক লোক কেঁদে ওঠে। তারপর তিনি যখন বাকিটা বলেন–সোহবতে তোয়ালে তুরা তোয়ালে কুনাদ (কুসঙ্গ তেমনি তাকে আবার খারাপ করে) –তখন গোটা জমায়েতেরই সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, সকলে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।

বসে পড়ে পির সাহেব পাখাওয়ালার পানে লাল-হয়ে-ওঠা চোখে তাকিয়ে পাখা-সঞ্চালন দ্রুততর করবার জন্য ইশারা করছেন এমন সময়ে সামনের লোকেরা সব ছুটে গিয়ে পির সাহেবকে ঘেরাও করে ফেলল। হঠাৎ পাগল হয়ে উঠেছে তারা। যে যা পারল ধরল, –কেউ পা, কেউ হাত, কেউ আস্তিনের অংশ।

তারপর এক কাণ্ড ঘটল। মানুষের ভাবমত্ততা দেখে পির সাহেব অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের ক্রন্দনরত জমায়েতের নিকটবর্তী লোকগুলো সহসা এই আক্রমণ তাঁর বোধ হয় সহ্য হলো না। তিনি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজ ভঙ্গিতে মাথার ওপরে গাছটার ডালে ওঠে গেলেন। দেখে হায়-হায় করে উঠল পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা, আর তা-শুনে জমায়েতও হায়-হায় করে উঠল। সাঙ্গ-পাঙ্গরা তখন সুর করে গীত ধরলে এই মর্মে যে, তাদের পির সাহেব তো শূন্যে ওঠে গেছেন, এবার কী উপায়!

পির সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস-ভারী পা দোলাচ্ছেন।

ফাগুনের আগুনে দ্রুত বিস্তারের মতো পির সাহেবের শূন্যে ওঠার কথা দেখতে-না-দেখতে ছড়িয়ে গেল। যারা তখন ফারসি বয়েতের অর্থ না বুঝে কেবল সুর শুনেই কেঁদে উঠেছিল, এবার তারা মড়া কান্না জুড়ে বসল। পির সাহেব কি তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু গেলে, অজ্ঞ-মূর্খ তারা পথ দেখবে কী করে?

জোয়ারি ঢেউয়ের মতো সম্মুখে ভেঙে এল জনস্রোত। অনেক মড়া-কান্না ও আকুতি-বিকুতির পর পির সাহেব বৃক্ষডাল হতে অবশেষে অবতরণ করলেন।

বেলা তখন বেশ গড়িয়ে এসেছে, আর মাঠের ধারে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে সে মাঠেরই বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমন সময় পির সাহেবের নির্দেশে একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে,

–ভাই সকল, আপনারা সব কাতারে দাঁড়াইয়া যান।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গেল।

নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাৎ সারা মাঠটা যেন কেঁপে উঠল। শত শত নামাজরত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায় নিঃসঙ্গ একটা গলা আর্তনাদ করে উঠল।

সে-কণ্ঠ মজিদের।

–যতসব শয়তানি, বেদাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা! নামাজ ভেঙে কেউ কথা কইতে পারে না। তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগালি শুনলে।

মোনাজাত হয়ে গেলে সাঙ্গ-পাঙ্গদের তিনজন এগিয়ে এল। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন করল,

–চেঁচামিচি করতা কিছকা ওয়াস্তে?

লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না।

মজিদ বললে,

–কোন নামাজ হইলে এটা?

–কাহে? জোহরকা নামাজ হুয়া।

উত্তর শুনে আবার চিৎকার করে গালাগাল শুরু করল মজিদ। বললে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া?

সাঙ্গ-পাঙ্গরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পির সাহেবের হুকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে যে এলেম শিখে এসেছে সে বোঝানোর পন্থাটা প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু ভাদ্র মাস ছেকে ছায়া আছলি এক-এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু, দু-কদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় আছে।

মজিদ বলে মাপো। এবং পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেল না তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিল তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যেই ছিল।

শুনে মজিদ কুৎসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মুখ খিস্তি করে বললে,

–কেন, তখন তোগো পির ধইরা রাখবার পারল না সুরুযটারে? তারপর সরে গিয়ে সে বজ্রকণ্ঠে ডাকলে,

–মহব্বতনগর যাইবেন কে কে?

মহব্বতনগর গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কারও কারও মনে ভয়ও হয়েছিল–এই বুঝি পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে! এবার তার ডাক শুনে একে-একে তারা ভিড় থেকে খসে এল।

মতিগঞ্জের সড়কে ওঠে ফিরতিমুখো পথ ধরে মজিদ একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে থুথু ফেলে, তওবা কেটে, নিঃশ্বাসের নিচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল। সঙ্গের লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্ক রেখা।

সে-রাত্রে ব্যাপারীকে নিয়ে এক জরুরি বৈঠক বসল। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের পানে কয়েকবার তাকালো। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে। শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথ-চালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মজিদ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করল–ভাই সকলরা, সকলে অবগত আছেন যে, বেদাতি কোনো কিছু খোদাতা'লার অপ্রিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ কথাও তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশল সহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে রূপ যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে মুখোশ চিনে ফেলতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। তা ছাড়া শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দুর্বলতার জন্য তার সমস্ত কারসাজি ভণ্ডুল হয়ে যায়। তা হলো বেদাতি কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেল, তাহলে তার শয়তানি রইলো কোথায়।

ভনিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে। আউয়ালপুরে তথাকথিত যে-পির সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিকই আছে–যে মুখোশকে ভুল করে মানুষ তার কবলে গিয়ে পড়বে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সে উদ্দেশ্যে তথাকথিত পিরটি কৌশলে চরিতার্থ করবার চেষ্টায় আছেন। পাঁচওয়াক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটু ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরুহ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ইমানদার মানুষ–যাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ কাজা করেননি–তাঁরা খোদার কাছে গুনাহ্ করছেন।

এ পর্যন্ত বলে বিস্ময়াহত স্তব্ধ লোকগুলোর পানে মজিদ কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরও কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারী বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজখাঁই গলাই প্রশ্ন করে, হুনলেনতো ভাই সকল?

সাব্যস্ত হলো, অন্তত, এ-গ্রামের কোনো মানুষ পির সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

এরপর মহব্বতনগরের লোক আওয়ালপুরে একেবারে গেল যে না, তা নয়। কিন্তু গেল অন্য মতলবে। পরদিন দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পির সাহেবের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেল দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্নে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতি বগলে করিমগঞ্জ গেল। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলল, বেহেশত ও দোজখের জলজ্যান্ত বর্ণনাও করল কতক্ষণ।

কালু মিয়া গোঙায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা ফাটিয়ে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে মস্ত ব্যান্ডেজ তার মাথায়। দেখে সে মাথা নাড়ে, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মস্ত বড় পরীক্ষা-ক্ষেত্র তা মধুর সুললিত কণ্ঠে বুঝিয়ে বলে। কালু মিয়া শোনে কি-না কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব বোধ করে। কম্পাউন্ডারকে ডাক্তার মনে করে বলে, –পোলাগুলিরে একটু দেখবেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে! ওদের যত্ন নিলে আপনারও ছোয়াব হইব।

ভাং-গাঁজা খাওয়া রসকসশূন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউন্ডারের। প্রথমে দুটো পয়সার লোভে তার চোখ চকচক করে উঠেছিল, কিন্তু ছোয়াবের কথা শুনে একবার আপাদমস্তক মজিদকে দেখে নেয়। তারপর নিরুত্তরে হাতের শিশিটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অন্যত্র চলে যায়।

গ্রামে ফিরে মজিদ কালু মিয়ার বাপের সঙ্গে দু-চারটে কথা কয়। বুড়ো এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। মজিদ নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছে বলে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে। হুঁকা তুলে নেবার আগে মজিদ বলে,

–কোনো চিন্তা করবানা মিয়া। খোদা ভরসা। তারপর বলে যে, হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে সে নিজেই বলে এসেছে, ওদের যেন আদরযত্ন হয়। ডাক্তারকে অবশ্য কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, গিয়ে দেখে, এমনিতেই শাহি কাণ্ডকারখানা। ওষুধপত্র বা সেবা শুশ্রূষার শেষ নাই।

খুব জোরে দম কষে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আরও শোনায় যে, তবু তার কথা শুনে ডাক্তার বলেন, তিনি দেখবেন ওদের যেন অযত্ন বা তকলিফ না হয়। তারপর আরেকটা কথার লেজুড় লাগায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যে; এবং সজ্ঞানে সুস্থ দেহে মিথ্যে কথা কয় বলে মনে-মনে তওবা কাটে। কিন্তু কী করা যায়। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়।

বলে, ডাক্তার সাহেব তার মুরিদ কি না তাই সেখানে মজিদের বড় খাতির।

বাইরে নিরুদ্বিগ্ন ও স্বচ্ছন্দ থাকলেও ভেতরে-ভেতরে মজিদের মন ক-দিন ধরে চিন্তায় ঘুরপাক খায়। আওয়ালপুরে যে পির সাহেব আস্তানা গেড়েছে তিনি সোজা লোক নন। বহু-পুরুষ আগে দীর্ঘ পথ শ্রম স্বীকার করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে শানদার জোব্বাজুব্বা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন, তাঁর রক্ত ভাটির দেশের মেঘ-পানিতেও একেবারে আ-নোনা হয়ে যায়নি। পান্‌সা হয়ে গিয়ে থাকলেও পির সাহেবের শরীরে সে-ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী ব্যক্তিরই রক্ত। কাজেই একটা পাল্টা জবাবের অস্বস্তিকর প্রত্যাশায় থাকে মজিদ। মহব্বতনগরের লোকেরা আর ওদিকে যায় না। কাজেই, আক্রমণ যদি একান্ত আসেই আগে-ভাগে তার হদিশ পাবার জো নেই। সে জন্য মজিদের মনে অস্বস্তিটা রাতদিন আরও খচখচ করে।

মজিদ ও-তরফ থেকে কিছু একটা আশা করলে কী হবে, তিন গ্রাম ডিঙিয়ে মহব্বতনগরে এসে হামলা করার কোনো খেয়াল পির সাহেবের মনে ছিল না। তার প্রধান কারণ তাঁর জইফ অবস্থা। এ-বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈ-হাঙ্গামা আর ভালো লাগে না। সাগরেদদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রধান মুরিদ মতলুব খাঁ, একটা জঙ্গি ভাব দেখালেও হুজুরের নিস্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পির সাহেব অপরিসীম উদারতা দেখিয়ে বলেন, কুত্তা তোমাকে কামড়ালে তুমিও কি উল্টো তাকে কামড়ে দেবে? যুক্তি উপলব্ধি করে সাগরেদরা নিরস্ত হয়। তবু স্থির করে যে, মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এধারে আসে তবে একহাত দেখে নেয়া যাবে। সেদিন কালুদের কল্লা যে ধড় থেকে আলাদা করতে পারেনি, সে-জন্য মনে প্রবল আফসোস হয়।

গ্রামের একটি ব্যক্তি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্দরের লোক, আর তার তাগিদটা প্রায় বাঁচা-মরার মতো জোরালো। পির সাহেবের সাহায্যের তার একান্ত প্রয়োজন। না হলে জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

সে হলো খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, আজ তিরিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হুতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেত, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তানু বিবিকে ফি-বৎসর আস্ত-আস্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না। দেখা-সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পির সাহেবের আগমন-সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিল যে, এবার হয়ত বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নতুন এক আগন্তুক ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠবে তখন তার জন্যও নানি-বুড়ির ডাক পড়বে। শেষে নানি-বুড়ি মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা করে বলবে, ওস্তাদের মার শেষ কাটালে।

কিন্তু মুশকিল হলো কথাটা পাড়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারীকে নিরালা পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চোখের পলকের জন্য পেলেও তখন আবার জিহ্বা নড়ে না। ফিকিরফন্দি করতে করতে এদিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসল। কিন্তু আমেনা বিবি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাড়া যায় না। সারা জীবন যে-মেয়েলোকের সন্তান হয়নি, পির সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সে-ও কোলে ছেলে পেয়েছে।

একদিন লজ্জা-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পির সাবের থিকা একটু পানিপড়া আইনা দেন না।

শুনে অবাক হয় ব্যাপারী। নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনোদিন জ্বরজারি, পেট কামড়ানি পর্যন্ত হয় না।–

–পানিপড়া ক্যান?

আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরও দীর্ঘতর করে, আর তার মনের কথা ব্যাপারী যেন বিনা উত্তরেই বোঝে,–তাই দোয়া করে মনে মনে।

উত্তর পায় না বলেই ব্যাপারী বোঝে। তারপর বলে,-আইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যে, পির সাহেবের ত্রিসীমানায় আর তো ঘেঁষা যায় না। অবশ্য পির সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউয়ের খাতিরে পানিপড়ার জন্য তাঁর কাছে যেতে বাধতো না, কারণ পির নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান ডেকেও সে-নামকে অন্তরে-অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না। গাভুর-চাষা-মাঠাইলরা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারী তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা স্বচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হলো শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পির ডাকা। এবং সমাজের মূল হলো একটি লোক–যার আঙুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে-বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হলো মজিদ। জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কী করে এমন খাপে-খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উল্‌টো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

সে-জন্য সে ভাবিত হয়, দু-দিন আমেনা বিবির কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে। অবশেষে বিবির কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই হয়ত একটা উপায় ঠাহর করে ব্যাপারী।

ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক ভাই থাকে। নাম ধলা মিয়া। বোকা কিছিমের মানুষ, পরের বাড়িতে নির্বিবাদে খায়-দায় ঘুমায়, আর বোন-জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাগে যে, নড়ার নাম করে না বছরান্তেও। আড়ালে-আড়ালে থাকে। কৃচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে দুটি কথা হয় কি হয় না, কোনোদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারী হয়ত-বা শালার সঙ্গে খানিক মস্করাও করে।

তাকে ডেকে ব্যাপারী বললে : একটা কাম করেন ধলা মিয়া।

ব্যাপারীর সামনে বসে কথা কইতে হলে চরম অস্বস্তি বোধ করে সে। কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব তাকে অস্থির করে রাখে। কোনোমতে বলে,

–কী কাম দুলা মিয়া?

কী তার কাজ ব্যাপারী আগাগোড়া বুঝিয়ে বলে। আগে প্রথম বিবির দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভণিতা সহকারে বর্ণনা করে। তারপর বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং আওয়ালপুর তাকে রওনা হতে হবে শেষরাতের অন্ধকারে–যাতে কাকপক্ষীও খবর না পায়। আর সেখানে গিয়ে তাকে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ-গ্রামে থেকে গেছে এ-কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না। বলবে যে, করিমগঞ্জের ওপারে তার বাড়ি। বড় বিপদে পড়ে এসেছে পির সাহেবের দোয়া পানির জন্য। তার এক নিকটতম নিঃসন্তান আত্মীয়ার একটা ছেলের জন্য বড় সখ হয়েছে। সখের চেয়েও যেটা বড় কথা, সেটা হলো এই যে, শেষ পর্যন্ত কোনো ছেলেপুলে যদি না-ই হয় তবে বংশের বাতি জ্বালাবার আর কেউ থাকবে না। মোট কথা, ব্যাপারটা এমন করুণভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুনে পির সাহেবের মন গলে যেন পানি হয়ে যায়।

বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তায় মুরুব্বি। তবু ধমকে-ধামকে কথা বলে ব্যাপারী। পরগাছা মুরুব্বিকে আবার সম্মান, তার সঙ্গে আবার কেতাদুরস্ত কথা।

–কি গো ধলা মিয়া, বুঝলান নি আমার কথাডা?

–জি বুঝছি। কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় কাত করে ধলা মিয়া জবাব দেয়। প্রস্তাব শুনে মনে মনে কিন্তু ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যে এই যে, আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ পড়ে এবং সবাই জানে যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমত দেবংশি।

কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কি একাকী ওই তেঁতুল গাছের সন্নিকটে ঘেঁষা যায়? ভাবনার মধ্যে এও ছিল যে, যে-সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনেছে, তারপর কোন সাহসে পা দেয় মতলুব খাঁর গ্রামে। তেঁতুল গাছের ফাড়াটা কাটলেও ওইখানে গিয়ে পির সাহেবের দজ্জাল সাঙ্গ-পাঙ্গদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া নেহাত সহজ হবে না। নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই সে লুকোবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ধরা পড়ে যাবে না, কী বিশ্বাস! কে কখন চিনে ফেলে কিছু ঠিক নেই। যে ঢেঙা লম্বা ধলা মিঞা।

–ভাবেন কী? হুমকি দিয়ে ব্যাপারী প্রশ্ন করে।

–জি, কিছু না!

তবু কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে ব্যাপারী বলে,

–আরেক কথা। কথাডা জানি আপনার বইনে না হুনে। আপনারে আমি বিশ্বাস করলাম।

–তা করবার পারেন।

সারাদিন ধলা মিয়া ভাবে, ভাবে। ভাবতে-ভাবতে ধলা মিঞার কালা মিঞা বনে যাবার যোগাড়। বিকেলের দিকে কিন্তু একটা বুদ্ধি গজায়। ব্যাপারীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরের ঘরে বসে নলের হুঁকায় টান দিচ্ছিল, হঠাৎ সেটা নামিয়ে রেখে সে সরাসরি বাইরে চলে যায়। তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে হাঁটতে থাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দিকে। হাঁটার ঢং দেখে পথে দু-চারজন লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়–তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাইরেই দেখা হয় মজিদের সঙ্গে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। কাছে গিয়ে গলা নিচু করে সে বললে,

–আপনার লগে একটু কথা আছিল।

গলাটা বিনয়ে নম্র হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

খালেক ব্যাপারী তখন যে-দীর্ঘ ভণিতা সহকারে আমেনা বিবির মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিল, তারই ওপর রং ফলিয়ে, এখানে-সেখানে দরদের ফোঁটা ছিটিয়ে, এবং ফেনিয়ে-ফুলিয়ে দীর্ঘতর করে ধলা মিয়া কথা পাড়ে। বলে, মেয়েমানুষের মন, বড় অবুঝ। নইলে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারই পানিপড়া খাবার সাধ জাগবে কেন আমেনা বিবির? কিন্তু মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন আর নিস্তার থাকে না। খালেক ব্যাপারী আর কী করে। ধলা মিয়াকে ডেকে বলে দিল, আওয়ালপুরে গিয়ে পির সাহেবটির কাছ থেকে সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।

মজিদ নীরবে শোনে। হঠাৎ তার মুখে ছায়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তারপর সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

–তা কখন যাইবেন আওয়ালপুর?

ধলা মিয়া হঠাৎ ফিচ্‌কি দিয়ে হাসে।

–আওয়ালপুর গেলে কী আর আপনার কাছে আহি? কী কেলা পানি পড়াডা দিব হে লোকটা? বেচারির মনে মনে যখন একটা ইচ্ছা ধরছে তখন ফাঁকির কাম কি ঠিক হইব? –আমি কই, আপনেই দেন পানিপড়াডা–আর কথাডা একদম চাইপা যান।

অনেকক্ষণ মজিদ চুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুখে ছায়া আসে, যায়! তার পানে চেয়ে আর তার দীর্ঘ নীরবতা দেখে ধলা মিঞার সব উত্তেজনা শীতল হয়ে আসে। অবশেষে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে,

–কী কন?

–কী আর কমু। এই সব কাম কি চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কি আইন-আদালত না মামলা-মকদ্দমা? দলিল-দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতালার কালাম জাল হয় না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।

মুহূর্তে ধলা মিয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে ভয়ে। রাতের অন্ধকারে দেবংশি তেঁতুলগাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তাছাড়া পির সাহেবের ডাণ্ডাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও গলা শুকিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হয়ত ভয়টাকে হজম করে নিয়ে ভগ্নগলায় ধলা মিয়া বলে,

–আপনে না দিলে না দিলেন। কিন্তু হেই পিরের কাছে আমি যামু না।

–যাইবেন না ক্যান? এবার একটু রুষ্ট স্বরে মজিদ বলে, ব্যাপারী মিয়া যখন পাঠাইতেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?

উক্তিটা দুইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পেরে ধলা মিয়া বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অবশেষে কথাটার সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,

–হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামুনে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলা মিয়ার মতলব, শেষ রাতে ওঠে গ্রামের বাইরে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের দিকে ফিরে এসে মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পির সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাপারী যে-টাকা

দিবে তার অর্ধেক বেমালুম পকেটস্থ করে বাকিটা মজিদকে দেবে। মজিদ প্রায় ঘরের লোক। ব্যাপারীর কাছে তার দাবি-দাওয়া নেই। দিলেও চলে, না দিলেও চলে। তবু কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখকেও চাপা দিতে হয়।

–তাইলে পাকাপাকি কথা হইল। ভরদুপুরে আমি আসুম নে পানিপড়া নিবার জন্য। তারপর তাড়াতাড়ি বলে, ঠগের পিছনে বেহুদা টাকা ঢালন কি বিবেক-বিবেচনার কাম?

টাকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট এবং লোভনীয় বটে। কিন্তু তবু মজিদ তার কথায় অটল থাকে। নিমরাজিও হয় না। কঠিন গলায় বলে,

–না, আপনে আওয়ালপুরেই যান।

এতক্ষণ পর ধলা মিয়া বোঝে যে, মজিদের কথাটা রাগের। খাতিরে ব্যাপারী মজিদের নির্দেশের বরখেলাফ করে সে-ঠক-পীরের কাছেই লোক পাঠাবে পড়াপানি আনবার জন্য–সেটা তার পছন্দসই নয়। না হবারই কথা। ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মতো।

ধলা মিঞা ভারীমুখ নিয়ে প্রস্থান করে। ঘরে ফিরে আবার ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কোনো বুদ্ধি ঠাহর করবার আগেই মজিদ এসে উপস্থিত হয় ব্যাপারীর বৈঠকখানায়।

যতক্ষণ নতুন এক ছিলিম তামাক সাজানো হয় কল্কিতে, ততক্ষণ দুজনে গরু-ছাগলের কথা কয়। দুয়েক বাড়িতে গরুর ব্যারামের কথা শোনা যাচ্ছে! মজিদের ধামড়া গাইটা পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। রহিমা কত চেষ্টা করছে কিন্তু গাইটা দানা-পানি নিচ্ছে না মুখে। খাচ্ছেও না কিছু, দুধও দিচ্ছে না এক ফোঁটা।

তামাক এলে কতক্ষণ নীরবে ধূমপান করে মজিদ। তারপর একসময় মুখ তুলে প্রশ্ন করে,

–হেই পিরের বাচ্চা পির শয়তানের খবর কী? এহনো ইমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাছে না সট্‌কাইছে?

প্রশ্ন শুনে খালেক ব্যাপারী ঈষৎ চমকে ওঠে, তারপর তার চোখের পাতায় নাচুনি ধরে। চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ব্যাপারীর মনে হয়, তামাক-ধোঁয়ার পশ্চাতে মজিদের চোখ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এবং সে-চোখ দিয়ে সে তার মনের কথা কেতাবের অক্ষরগুলোর মতো আগাগোড়া অনায়াসে পড়ে ফেলছে।

–কী জানি, কাইবার পারি না। অবশেষে ব্যাপারী উত্তর দেয়। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হয় গলাটা যেন ধসে গেছে হঠাৎ। সজোরে একবার কেশে নিয়ে বলে, হয়ত গেছে গিয়া।

মজিদ আস্তে বলে,

–তাহলে আর তানার কাছে লোক পাঠাইয়া কী করবেন?

–লোক পাঠামু তানার কাছে? বিস্ময়ে ব্যাপারী ফেটে পড়ে। কিন্তু মজিদের শীতল চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে বোঝে যে, মিথ্যা কথা বলা বৃথা। শুধু বৃথা নয়, চেষ্টা করলে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশও দেখাবে। যে করেই হোক, মজিদ খবরটা জেনেছে।

একবার সজোরে কেশে ধসে যাওয়া গলাকে অপেক্ষাকৃত চাঙা করে তুলে ব্যাপারী বলে,

–হেই কথা আমিও ভাবতাছি। আছে কি না আছে-হুদাহুদি পাঠানো। তবু মেয়েমানুষের মন। সতীন আছে ঘরে। ক্যামনে কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে। তা যাক। পাইলে পাইল, না পাইলে নাই। আসলে মন-বোঝান আর কী। ঠগ-পিরের পানিপড়ায় কি কোনো কাম হয়?

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ব্যাপারী ধীরে-ধীরে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। বলে, মজিদকে সে বলে-বলে করেও বলতে পারেনি। আসল কথা তার সাহস হয়নি, পাছে মজিদ মনে ধরে কিছু। কথাটা মজিদের যে পছন্দ হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে হুঁকায় জোর টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে চোখ গম্ভীর করে তোলে। ব্যাপারীর মতো বিস্তর জমিজমার মালিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়। শুনে পুলকিত হবারই কথা। ব্যাপারী আরও বলে যে, ধলা মিয়াকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে-ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মহব্বতনগরের লোক। তা ছাড়া, এ-গ্রামের কেউ যেন তাকে আওয়ালপুর যেতে না দেখে, কারণ তাহলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করা হয় খোলাখুলিভাবে।

ধলা মিয়ারে যতটা বেকুফ ভাবছিলাম, ব্যাপারী বলে, ততটা বেকুফ হে না। হে ভাবছে ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী। তানার যখন একটা ছেলের সখ হইছেই–

মজিদ বাধা দেয়। ধলা মিয়ার গুণচর্চায় তার আকর্ষণ নেই। হঠাৎ মধুর হাসি হেসে বলে,

–খালি আমার দুঃখডা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিকা ঠগ-পির বেশি হইল? আমার মুখে কি জোর নাই?

–আহা-হা, মনে নিবেন না কিছু। মেয়েমানুষের মন। দূর থিকা যা হোনে তাতেই ঢলে।

–কথাডা ঠিক কইছেন। মজিদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে। তারপর বলে, তয় কথা কি, তাগো কথা হুনলে পুরুষমানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়। তাগো কথা হুনলে কি দুনিয়া চলে?

ব্যাপারীর মস্ত গোঁফে আর ঘন দাড়িতে পাক ধরেছে। মজিদের কথায় সে গভীরভাবে লজ্জা পায়। তখনকার মতো মজিদের ভঙ্গিতেই বলে,

–ঠিকই কইছেন কথাডা। কিন্তু কী করি এহন। কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।

–তানারে কন, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে-বেড়ি খুলবো?

পেটে বেড়ি পড়ার কথা সম্পূর্ণ নতুন শোনায়। শুনে ব্যাপারীর চোখ হঠাৎ কৌতূহলে ভরে ওঠে। সে ভাবে, বেড়ি, কিসের বেড়ি?

মজিদ হাসে! ব্যাপারীর অজ্ঞতা দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,

–পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারও পড়ে সাত প্যাঁচ, কারও চোদ্দো। একুশ বেড়িও দেখছি একটা। তয় সাতের উপরে হইলে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দো প্যাঁচ।

ব্যাপারী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

–আমার বিবিরডা ছাড়ান যায় না?

–ক্যান যায় না? তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগব কয় প্যাঁচ তানার। কথাটা শুনে ব্যাপারী আবার না ভাবে যে মজিদ তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে–তাই তাড়াতাড়ি বলে, এর একটা উপায় আছে।

উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহ্‌রি না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারও সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুদ্ধচিত্তে সারা দিন কোরান শরিফ পড়তে হবে। সন্ধ্যার দিকে এফতার না করে মাজার শরিফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া-দরুদ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরি করে তাকে পান করতে দেবে। তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘুরতে হবে।

যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করে উঠবে। ব্যথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আর সাত পাকে যদি ব্যথা না ওঠে?

—তয় বুঝতে হইব যে, তানার চোদ্দো প্যাঁচ কি আরও বেশি। সাত প্যাঁচ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

তারপর মজিদ আবার গরুছাগলের কথা পাড়ে। একসময় আড়-চোখে ব্যাপারীর পানে তাকিয়ে দেখে, গৃহপালিত জীবজন্তুর ব্যারামের কথায় তেমন মনোযোগ যেন নেই তার। আরও দু-চারটে অসংলগ্ন কথার পর মজিদ ওঠে পড়ে।

ফেরবার পথে মোল্লা শেখের বাড়ির কাছে কাঁঠালগাছের তলে একটা মূর্তি নজরে পড়ে। মূর্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল না, তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। মগরেবের কিছু দেরি আছে, কিন্তু শীতসন্ধ্যা ধোঁয়াটে বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে-মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মজিদের এক পলক দেরি হয় না। সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে আলতোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার ভঙ্গিতে মুখ হাতে ঢাকে। আরও কাছে গিয়ে মজিদ থমকে দাঁড়ায়, দাঁড়িতে হাত সঞ্চালন করে কয়েক মুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে,

—কী গো হাসুনির মা?

যে-কান্নার ভঙ্গিতে তখন হাতে মুখ ঢেকেছিল সে এবার মজিদের প্রশ্নে আস্তে নাকিসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটেছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।

আকস্মিক উদ্বেগ বোধ করে মজিদ। মেয়েটার চলন-বলন কেমন যেন নম্র। বয়স হলেও আনাড়ি বেঠিকপানা ভাব। হাতে নিলে যেন গলে যাবে। মাস-খানেক আগে একদিন শেষরাতে খড়কুটোর উজ্জ্বল আলোয় যার নগ্ন বাহু-পিঠ-কাঁধ দেখেছিল মজিদ, সে যেন ভিন্ন কোনো মানুষ। এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

কণ্ঠে দরদ মাখিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—কী হইছে তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাৎ-ফ্যাৎ করে হাসুনির মা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে,

—মা মরছে!

বজ্রাহত হবার ভান করে মজিদ। আর তার মুখ দিয়ে অভ্যাসবশত সে-কথাটাই নিঃসৃত হয়, যা আজ কতশত বছর যাবৎ কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে উচ্চারণ করে আসছে। তারপর বলে,

—আহা, ক্যামনে মরল গো বিটি?

—অ্যামনে।

এমনি মারা গেছে কথাটা কেমন যেন শোনায়। পলকের মধ্যে মজিদের স্মরণ হয় তাহেরের বৃদ্ধ ঢেঙা বাপের বিচারের দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুতাপ বোধ করে না মজিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার প্রশ্ন করে,

—ছ্যামড়ারা কই?

—আছে। ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেরায়া নায়ের মাঝি হইব।

—দাফন-কাফনের যোগাড়যন্ত্র করতাছেনি?

—করতাছে। মোল্লা শেখে জানাজা পড়ব।

খেলাল তুলে হঠাৎ দাঁত খোচাতে থাকে মজিদ, কপালে ক-টা রেখা ফোটে। তারপর চিন্তিত গলায় বলে,

—মওতের আগে খোদার কাছে মাফ চাইছিলনি তহুর মা?

ধাঁ করে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোখে ভয় ঘনিয়ে ওঠে।

—মাফ চাইছিল কি না কইবার পারি না!

কয়েক মুহূর্ত মজিদ নীরব থাকে। এ-সময়ে কপালে আরও কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে। কিছু না বললেও হাসুনির মা বোঝে, মজিদ তার মায়ের কবরের আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্যুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ধক্যের শেষ স্তরে কারও মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কুকড়ানো রগ-ঝোলা যে-মৃত দেহটি এখনো ঘরের কোণে নিস্পন্দভাবে পড়ে আছে সে-দেহটিকে নিয়ে যখন পেছনের জঙ্গলের ধারে কদমগাছের তলে কবর দেয়া হবে, তখন হয়ত দমকা হাওয়ার মতো বুকে সহসা হাহাকার জাগবে। তারপর শীঘ্র আবার মিলিয়ে যাবে সে-হাহাকার। কিন্তু তার মা নিঃসঙ্গ সে-কবরে লোকচোখের অন্তরালে অকথ্য যন্ত্রণাভোগ করবে—এ-কথা ভাবতেই মেয়ের মন ভয়ে ও বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। কলাপাতার মতো কেঁপে ওঠে সে প্রশ্ন করে,

—মায়ের কবরে আজাব হইব?

সরাসরি কথাটার উত্তর দিতে মজিদের মুখে বাধে। থেমে বলে,

—খোদা তারে বেহেস্ত-নসিব কর, আহা।

একবার আড়চোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরণ-ভীতির মতো গাঢ় ছায়া দেখে হয়ত-বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে, তার জন্য লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না।

তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করে মজিদ। বাঁ ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ কাজা হবে না তো?

পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পির সাহেবের পানিপড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হয়েছিল; কিন্তু পেটে বেড়ির কথা শুনে এবং প্যাঁচ যদি সাতটির বেশি না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত করতে পারবে শুনে শীঘ্র মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশার সঞ্চার হলো। আস্তে-আস্তে একটা ভয়ও এল মনে। প্যাঁচ যদি সাতের বেশি হয়, চোদ্দো কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউয়ের তো সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিল আমেনা বিবি কিন্তু এসব কথা হলে বাতাসে কথা শুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি কারও সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ে।

মাথায় ঘোমটা, মুখটা ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শিরা এসে দেখে-দেখে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবির সঙ্গে নিচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।

দুপুরের কিছু আগে মজিদের বাড়ি থেকে রহিমা আসে। হাতে ঘষা-মাজা তামার গ্লাসে পানি। এমনি পানি নয়-পড়াপানি। মজিদ বলে পাঠিয়েছে গোসল করার আগে আমেনা বিবি পেটে পানিটা যেন ঘষে। দোয়া-দরুদ পড়া পানি, তার প্রতিটি ফোঁটা পবিত্র। কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

রহিমা সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে যায় না। পান-সাদা খায়, তানু বিবির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কয়। একসময় তানু বিবি প্রশ্ন করে,

—বইন, আপনেও তো মাজারের পাশে সাত পাক দিছেন, না?

—আমি দেই নাই।

—দেন নাই? বিস্মিত হয়ে তানু বিবি বলে। —তয় তানি ক্যামনে জানলেন আপনার চোদ্দো প্যাঁচ?

রহিমা লজ্জার হাসি হেসে বলে,

—তানি যে আমার স্বামী। স্বামী হইলে অ্যামনেই বোঝে।

তয় তানি বোঝেন না ক্যান? তানু বিবির তানি মানে খালেক ব্যাপারী।

রহিমা মুশকিলে পড়ে। দুই তানিতে যে প্রচুর তফাত আছে সে কথা কী করে বোঝায়! তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ। স্বামী বিস্তর জমিজমার মালিক বলে ভাবে, তার তুলনায় আর কেউ নেই। শেষে রহিমা আস্তে বলে,

—তানি যে খোদার মানুষ।

আমেনা বিবিকে গোসল করিয়ে বাড়িতে ফেরে রহিমা। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে,

—পড়া পানিডা নাপাক জাগায় পড়ে নাই তো?

—না। যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে।

সূর্য যখন দিগন্ত—সীমারেখার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন জোয়ান-মদ্দ দুজন বেহারা পালকি এনে লাগাল অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে।

এক ঢিলের পথ, কিন্তু ব্যাপারীর বউ হেঁটে যেতে পারে না।

ব্যাপারী হাঁকে, —কই তৈয়ার হইছেননি?

আমেনা বিবি আবছায়ার মধ্যে তখনো গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ছে। দুপুরের দিকে চেহারায় তবু কিছু জৌলুস ছিল, এখন বেলাশেষের ম্লান আলোয় একেবারে ফ্যাকাশে ঠেকে। তার চোখের সামনে আঁকাবাঁকা প্যাঁচানো অক্ষরগুলো নাচে, আবছা হয়ে গিয়ে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ছোট হয়ে আবার হঠাৎ বড় হয়ে যায়। আর শুষ্ক ঠোঁট-দুটো থেকে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

তানু বিবি গিয়ে ডাকে,

—ওঠ বুবু, সময় হইছে।

ডাক শুনে ফাঁসির আসামির মতো আমেনা বিবি চমকে ওঠে ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে। তারপর ছুরা শেষ করে কোরান শরিফ বন্ধ করে, গেলাফে ভরে, শেষে পালকস্পর্শের মতো আলগোছে তাতে চুমু খায়। সেটা ও রেহেল নিয়ে ওঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ তার মাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, আর শরীরটা টাল খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম করে। তানু বিবি ধরে ফেলে তাকে। তারপর একটু আদা-নুন মুখে দিয়ে ঘরের কোণেই মগরেবের নামাজটা আমেনা বিবি সেরে নেয়।

উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে আমেনা বিবি। পুরা ত্রিশ দিন রোজা রেখেও যে বিন্দুমাত্র কাহিল হয় না সে একদিনের রোজাতেই একেবারে ভেঙে গেছে। গায়ে-মাথায় বুটিদার হলুদ রঙের একটা চাদর দিয়েছে। সেটা বুকের কাছে চেপে ধরে গুটি-গুটি পায়ে হাঁটে। কিসের এত ভয় তাকে পিষে ধরেছে—ক-ঘণ্টায় যে-ভয় দীর্ঘ রোগভোগ-করা মানুষের মতো তাকে দুর্বল করে ফেলেছে? এক যুগেরও ওপরে যে নিঃসন্তান থাকতে পারল সে যদি জানে যে, ভবিষ্যতেও সে তেমনি নিঃসন্তান থাকবে, তবে এমন মুষড়ে যাবার কী আছে? এ-প্রশ্ন আমেনা বিবি তার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে।

তবে কথা হচ্ছে কী, তেরো বছরের কথা একদিনে জানেনি, জেনেছে ধাপে-ধাপে ধীরে-ধীরে, প্রতিবৎসরের শূন্যতা থেকে। সে-শূন্যতাও আবার পরবর্তী বছরের আশায় শীঘ্র ক্ষয়ে তেজশূন্য হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের

শূন্যতার কথা তেমনি বছরে-বছরে যদি জানে তবে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতায় হ্রাস পাবে, মনে কিছু-বা লাগলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহূর্তে সে-কথা জানলে বুক ভেঙে যাবে না, বেঁচে থাকবার তাগিদ কি হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে না?

সে-ভয়েই দু-কদমের পথ ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা পেরুতে গিয়ে আমেনা বিবির পা চলে না; সে-ভয়ের জন্যই জোর পায় না কোমরে, চোখে ঝাপসা দেখে। একবার ভাবে, ফিরে যায় ঘরে। কাজ কী জেনে ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক, দয়ালুদের মধ্যে দয়ালুতম সে-খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

কিন্তু গুটি-গুটি করে চললেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হলেও চলে লোকদের খাতিরে। ঢাকঢোল বাড়িয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হলে হয়ত-বা পারতো, মেয়েলোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা খুশির বশের মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমা করে না। এ-সমাজে কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে, সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না।

সমাজই আত্মহত্যার মাল-মসলা জুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের বেহুদাপনার জায়গা নেই।

মজিদ অপেক্ষা করছিল। বেহারারা পালকিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আস্তে নামিয়ে রাখল।

ব্যাপারী মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে, —নাববো?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটি পাগড়িও বেঁধেছে। মুখ গম্ভীর। বলে,

—তানারে নামাইয়া মাজার ঘরের ভিতরে নিয়া যান। থেমে বলে, তানার ওজু আছেনি?

ব্যাপারী ছুটে যায় পালকির কাছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিচু গলায় প্রশ্ন করে,

—আছেনি ওজু?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে।

—তয় নামেন।

মজিদ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সে চিকন সুরে দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে, গলায় বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্যের খেলা হতে থাকে। কিন্তু তাতে চোখের তীক্ষ্ণতা কাটে না। চোখ হঠাৎ তার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। পালকির পর্দা ফাঁক করে নামবার জন্য আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে-পায়ে। সাদা মসৃণ পা, রোদ, পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি। মজিদের গলার কারুকার্য আরও সূক্ষ্ম হয়।

হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখেছে। তবু পালকি থেকে নেমে সে যখন মাজার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আড় চোখে তার পানে তাকিয়ে মজিদ কিছুটা বিস্মিত হয়। নতুন বউয়ের মতো চোখ তার বোজা। তবে লজ্জায় যে নয় তা দ্বিতীয়বার তাকালেই বোঝা যায়। লজ্জায় ম্রিয়মাণ নতুন বউ-এর আত্মসচেতন রক্তাভা তাতে নেই। সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য এবং সে-মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।

আমেনা বিবি কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখটা আধাআধি খোলে। ঘরে ইতোমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। দুটো মোমবাতি ম্লানভাবে আলো ছড়ায়। সে-আলোর সামনে সে দেখে ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত চিরনীরব

মাজারটি। সে নীরবতা যেন বিস্ময়করভাবে শক্তিমান। আর সে-শক্তি বিদ্যুৎ-চমকের মতো শত-ফলায় বিচ্ছুরিত হয় প্রতি মুহূর্তে। মানুষের রক্তস্রোত যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনিতে। তথাপি মহাকাশের মতোই সে মাজার প্রগাঢ়ভাবে নীরব, আর মহাকাশের মতোই বিশাল ও অন্তহীন সে-নীরবতা। যে-আমেনা বিবি চোখ আধা খুলে তাকায় সেদিকে, সে আর পলক ফেলে না।

মজিদ আবার আড়চোখে তাকায় তার পানে। কী দেখে আমেনা বিবি? মাজারকে অমন করে কাউকে সে দেখতে দেখেনি। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তেমনি সূক্ষ্মসুরের লহরি খেলে। কিন্তু এবার সে থামে, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে গলা কাশে।

—তানারে বইবার কন।

ব্যাপারী বিবিকে বলে,

—বহেন।

মাজারের ধারটিতে আমেনা বিবি আস্তে বসে। তাকায় না কারও পানে। মাজারের নীরবতা যেন তার বুক ভরিয়ে দিয়েছে। সে আবার চোখ বুজে থাকে। মনে হয় তার শান্তি হয়েছে, আর আশা নেই। সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়ত মজিদের ভয় হয়। সে আর তাকায় না এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজের ক্ষুদ্র কোটরাগত চোখে চমক জাগে থেকে-থেকে।

ঘরের কোণে একটি পাত্রে পানি ছিল। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ অন্য ধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে, যে-পড়াপানি খেয়ে আমেনা বিবি পাক দেবে। তার ঠোঁট তেমনি বিড়বিড় করে, হাতে পানির পাত্রটা তুলে নেয়ায় হয়ত-বা তা ঈষৎ দ্রুততর হয়। ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোনো আদিম সাপের গতির মতো জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য। আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পালকি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল, সে-পাই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠতো তবে মজিদ রুপালি ঝালরওয়ালা চমৎকার সালু কাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেত। এবং যেত সেখানেই যেখানে নির্মল আলো হাওয়া রোগ-জীবাণু ভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, উন্মুক্ত বিশাল আকাশপথে—যেখানে কাদামাটি লাগেনি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে ওঠে ফণা ধরে না।

থেকে—থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার ক্ষুদ্র চোখ চক্কর খায়। কখনো তার দৃষ্টি খালেক ব্যাপারীর ওপরও নিবদ্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারীর মেদবহুল স্ফীত উদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে-বসে-থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারেনি তার স্থূল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্কর খায়। হলুদ রঙের বুটিদার চাদরে ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়েনা। তবু থেকে থেকে সেখানেই চক্কর খায় মজিদের ঘূর্ণমান দৃষ্টি।

একসময় মজিদ ওঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,

—পানিটা দেন।

ব্যাপারীও তার স্থূল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মতো স্তব্ধ মুখের সামনে সেটা ধরে। আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মতো। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে। সে হাতটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝংকার ওঠে।

আমেনা বিবি পাত্রটি কয়েক মুহূর্ত মুখের সামনে ধরে থাকে, তারপর তুলে ঠোঁটের কাছে ধরে। একটু পরে প্রগাঢ় নীরবতায় মজিদের সজাগ কানে সাবধানী বেড়ালের দুধ খাওয়ার মতো চুকচুক আওয়াজ এসে বাজে। পান করার অধীরতা নেই। খোদার নামছোঁয়া পানি, তালাবের সাধারণ পানি নয়। তা ছাড়া তৃষ্ণার পানিও নয় যে, শুষ্ক গলা নিমেষে শুষে নেবে সবটা। ধীরে ধীরে পান করে সে, বুকটা শীতল হয়। তারপর মুখ না ফিরিয়ে আস্তে শূন্য পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে। পায়ের মতো সুন্দর হাত। মোমবাতির ম্লান আলোয় মনে হয় সে হাত শুধু সাদা নয়, অদ্ভুতভাবে কোমল।

হাতটি যখন আবার চাদরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন মজিদ বলে,–তানারে উঠবার কন। এহন পাক দেওন লাগব।

আমেনা বিবি উঠে দাঁড়ায়! দাঁড়িয়েই মনে হয় বসে পড়বে, কিন্তু সামান্য দুলেই স্থির হয়ে যায়।

—আমি দোয়া-দরুদ পড়তাছি। তানারে পাক দিবার কন। ডাইন দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্লাহ কইবেন।

মজিদ কোণে বসে। একবার সামনে দিয়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায় তখন তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অন্ধকারে। কালো রঙের পাড়ের তলে থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে : একবার ডান পা, আরেকবার বাঁ। শব্দ হয় না। কাছাকাছি যখন আসে তখন মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কণ্ঠের সুর আরও মিহি করে তোলে।

এক পাক, দুই পাক। আমেনা বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে স্তব্ধতায় তার মুখ জমে আছে, সে স্তব্ধতায় বিন্দুমাত্র প্রাণ নেই। ও মুখ কখনো যেন কথা কয়নি, হাসেনি, কাঁদেনি। মনেও তার কিছু নেই। অতীতের স্মৃতির মতো মনে পড়ে কী একটা বাসনার কথা–বছরে বছরে যে-বাসনা অপূর্ণ থেকে আরও তীব্রতর হয়েছে। কী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূন্যতার কথা। কিন্তু সে-সব অতীতের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট। একটা মহাশক্তির সন্নিকটে এসে মানুষ আমেনা বিবির আর সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ নেই। একটা প্রখর-অত্যুজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে। সেখানে তার নিজের কথা আর চোখে পড়ে না।

এক পাক, দুই পাক। তারপর তিন পাকের অর্ধেক। ক-পা এগুলেই মজিদকে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের মতো কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অন্ধকার করে দিল। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্টা করল, হয়ত-বা তাকে আলিঝালি দেখলও। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখল না, জানল না প্যাঁচ পড়েছে তার পেটে, জানল না মাজারের মধ্যে শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, ক-পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে উঠত।

ব্যাপারী বিদ্যুৎগতিতে উঠে পড়ে অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলে,–কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মূর্ছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে-মুখে দাঁত লেগে আছে।

বাইরে মাজারে রহিমা আসে না। আজ আমেনা বিবি এসেছে বলে হয়ত আসত যদি না সঙ্গে থাকত ব্যাপারী। মাজার ঘরের বেড়ার ফুটোতে চোখ পেতে সে ব্যাপারটা দেখছিল। সঙ্গে হাসুনির মা-ও ছিল। রহিমা মনে-মনে স্থির করেছিল, পাক দেয়া চুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, সখ করে যে ফিরনিটা করেছে তা দেবে খেতে, তারপর দুয়েক খিলি পান চিবোতে চিবোতে দু-দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্প করবে। নিজে সে স্বল্প-ভাষী মানুষ, কিন্তু আমেনা বিবির হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের কোথায় যেন সমতা, যা-ই কথা হোক না কেন দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। কিন্তু ফুটো দিয়ে রহিমা যে-দৃশ্য দেখলো তারপর গল্প-গুজবের আশা তাকে ত্যাগ করতে হলো। ব্যাপারীর লজ্জা কাটিয়ে বাইরে এসে সে আর হাসুনির মা অতিথিকে ভেতরে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল পাঁজাকোল করে, মুখে কথা ফোটাবার উদ্দেশ্যে। সখ করে তৈরি করা ফিরনির কথা বা পান খেয়ে দু-দণ্ড গল্প করার কথা ভুলে গেল।

মজিদ আর ব্যাপারী মাজার ঘরেই চুপ হয়ে বসে রইল, দু-জনের মুখে চিন্তার রেখা। তারপর মজিদ আস্তে উঠে অন্দরঘরের বেড়ার পাশে বৈঠকখানায় গিয়ে হুঁকা ধরিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যাপারীকে ডেকে নিয়ে গেল। দু-জনেই এক এক করে হুঁকা টানে, কথা নেই কারও মুখে।

মজিদ ভাবে এক কথা। যে-আমেনা বিবির পিরের পানি পড়া খাবার সখ হয়েছিল সে-আমেনা বিবির ওপর, আকার-ইঙ্গিতে বা মুখের ভাবে প্রকাশ না করলেও মজিদের মনে একটা নিষ্ঠুর রাগ দেখা দিয়েছিল। তার একটা নিষ্ঠুর শাস্তিও সে স্থির করেছিল। আজ সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শাস্তি বিধানের সে প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরও নিষ্ঠুরতমভাবে শানিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে আমেনা বিবির মূর্চ্ছা যাওয়া সমস্ত কিছু যেন গোলমাল করে দিল। মুঠোর মধ্যে এসেও সে যেন ফস্কে গেল, যে-মজিদের ক্ষমতাকে সে এত দিন উপেক্ষা করেছে তার প্রতি আজও অবজ্ঞা দেখালো, তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে সুযোগ দিয়েও দিল না। দিয়েও দিল না বলে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখালো, সমস্ত আস্ফালনের মুখে চুন দিল।

হুঁকাটা রেখে হঠাৎ এবার ব্যাপারী কথা বলে। বলে,

—দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি।

মজিদ কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে,–রোজা রাখনে দুর্বল হইছিল কথাডা ঠিক, কিন্তু আমি যে পানিপড়াডা দিলাম–তা কিসের জন্য? শরীলে তাকত হইবার জন্য না? এমন তাছির হেই পানি পড়ার যে পেটে গেলে এক মাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে। শরীলের দুর্বলতার জন্য তিনি অজ্ঞান হন নাই।

মজিদ থামে। কী একটা কথা বলেও বলে না। ব্যাপারী মুখ ফিরিয়ে তাকায় মজিদের পানে, কতক্ষণ তার চিন্তিত-ব্যথিত চোখ চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর প্রশ্ন করে,

—তয় ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন?

—আপনে তানার স্বামী–ক্যামনে কই মুখের উপরে?

হঠাৎ ব্যাপারীর চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং তা একবার কানিয়ে চেয়ে লক্ষ করে দেখে মজিদ। ব্যাপারীর চোখে সন্দেহের জোয়ার আসুক, আসুক ক্রোধের অনলকণা। মজিদ আস্তে হুঁকাটা তুলে নেয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জ্যোৎস্না। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় একবিন্দু রক্ত–টাট্‌কা লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান জোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা। তাতে বিদ্বেষ নেই, পতিতের প্রতি ক্রোধ-ঘৃণা নেই, আছে শুধু অপরিসীম ব্যথাহত প্রশ্নের নিশ্চুপতা।

আচমকা ব্যাপারী মজিদের একটি হাত ধরে বসে। তার বয়স্ক গলায় শিশুর আকুলতা জাগে। বলে,

—কন, ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন? ভিতরে কী কোনো কথা আছে?

একবার বলে-বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে। মাথা নেড়ে বলে,

—না। কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তানারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে? তেরো বছর বয়সে ফুটফুটে যে মেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে এত বছর যাবৎ তার ঘরকন্না করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন মায়া-মহব্বত নাই। কিছু থাকলেও তানু বিবির আসার পর থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের বসবাসের পর একটা সম্বন্ধ আড়ালে-আবডালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাৎ তালাক দেবার কথা শুনে ব্যাপারী হকচকিয়ে ওঠে। তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের ম্লান জোৎস্নার পানে বেদনাভারী চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারী যখন কিছু বলে না তখন সে আলগোছে বলে,

—কথাডা কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তহুর বাপের কথা মনে আছেনি?

ব্যাপারী ভারী গলায় আস্তে বলে,

—আছে।

—হে তহুর বাপের কথা মাইনষেরা ভুইলা গেছে। এমন কি তার রক্তের পোলা-মাইয়ারাও ভুইলা গেছে। কিন্তু আমি ভুলবার পারি নাই। ক্যান জানেন?

যন্ত্রচালিতের মতো ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

—ক্যান?

—কারণ হেই ব্যাপার থিকা একটা সোনার মতো মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাডা হইল এই : পাক-দিল আর গুনাগার-দিল যদি এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুনাগার-দিলের শাস্তি দিবার চায় তখন পাক-দিলই শাস্তি পায়। তহুর বাপের দিল সাফ আছিল, তাই শাস্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুণাগার হইলাম।

বর্তমানে মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপারী কথাটা বোঝে। তার ও আমেনা বিবির দিল এক সুতায় বাঁধা। আমেনা বিবিকে শাস্তি দিতে হলে আগে সে-বন্ধন ছিন্ন করা চাই। অতএব তাকে তালাক দেয়া প্রয়োজন। মজিদ একবার ভুল করে একজন নিষ্পাপ লোককে এমন নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে যে, সে-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য অবশেষে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তাকে কষ্ট দিয়ে মজিদ নিজেও গুনাগার হয়েছে, পাপীও ভালো মানুষের ওপর দুষ্ট আত্মার মতো ভর করে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এমন ভুল মজিদ আর কখনো করবে না।

মজিদের হাত তখনো ব্যাপারী ছাড়েনি। সে-হাতে একটা টান দিয়ে ব্যাপারী অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

—আপনে কী কিছু সন্দেহ করেন?

—সন্দেহের কোনো কথা নাই। পানি পড়াডা খাইয়া তিনি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোনো কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইর মতো সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তানারে তালাক দেন।

এই সময়ে হাসুনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাঁড়াল। ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

—কী গো বিটি?

—তানার হুস হইছে। বাড়িতে যাইবার চাইতেছেন।

মজিদের হাত ছেড়ে ব্যাপারী ওঠে দাঁড়ালো। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পালকিটা অন্দরে পাঠিয়ে দিল।

আমেনা বিবিকে নিয়ে সে-পাল্কি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে চলে কিছুক্ষণ পরে গাছগাছলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মজিদ বৈঠকখানা ঘরের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্কভাবে খেলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে; দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। কোনো কথা না কয়ে হঠাৎ ব্যাপারী চলে গেল। তার মনের কথা জানা গেল না।

হঠাৎ একসময়ে একটা কথা স্মরণ হয় মজিদের। কথা কিছু না, একটা দৃশ্য-আবছা আলোয় দেখা কালো পাড়ের নিচে একটি সাদা কোমল পা। সে-পা দ্বিতীয়বার দেখল না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ। তারপর মনে মনেই সে হাসে। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে। কিন্তু সে-ফুল শয়তানের চক্রান্ত। মজিদ শক্ত লোক। সাত জন্মের চেষ্টায়ও শয়তান তাকে কোনো দুর্বল মুহূর্তে আচম্বিতে আক্রমণ করতে পারবে না। সে সদা হুঁশিয়ার।

কণ্ঠে দোয়া-দরুদের মিহি সুর তুলে মজিদ ভেতরে যায়।

এত বড় সমস্যা ব্যাপারীর জীবনে কখনো দেখা দেয়নি। নিজের চোখে কোনো গুরুতর অন্যায় দেখে যদি শরীরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠত তাহলে ব্যাপারটা সমস্যাই হতো না। আসল কথা জানে না, আবার একটা কিছু গোলযোগ যে আছে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মানুষ মজিদের কথা না হয় অবিশ্বাস করা যেত, কিন্তু যে-কথা জেনেছে মজিদ তা তার নিজের বুদ্ধির জোরে জানেনি। খোদার কালামের সাহায্যেই সে-কথা জেনেছে এবং মানুষ মজিদ তার অন্তরের বিবেচনার জন্যই তা খুলে বলতে পারেনি। হাজার হলেও তারা বন্ধু মানুষ। ব্যাপারী কষ্ট পাবে এমন কথা কী করে বলে।

বৈঠকখানা হুঁকার নীলাভ ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠে। ব্যাপারীর চোখে ধোঁয়া ভাসে, মগজেও কিছু গলিয়ে ঢুকে তার অন্তরদৃষ্টি আবছা করে দেয়। ব্যাপারী ভাবে আর ভাবে। মানুষের সঙ্গে হুঁ-হাঁ করে কথা কয়, দশ প্রশ্নে এক জবাব দেয়। একটা কথাই মনে ঘোরে। একসময়ে সেটা সোজা মনে হয়, একসময়ে কঠিন। একবার মনে হয় ব্যাপারটা হেস্ত-নেস্ত হয় একটিমাত্র শব্দের তিনবার উচ্চারণেই; আকেরবার মনে হয়, সে শব্দটা উচ্চারণ করাই ভয়ানক দুরূহ ব্যাপার। জিহ্বা খসে আসবে তবু সেটা বেরিয়ে আসবে না মুখ থেকে।

তেরো বছর বয়স থেকে যে তার ঘরে বসবাস করছে, তার জীবনের অলি-গলির সন্ধান করে। যদি কিছু নজরে পড়ে যায় হঠাৎ। দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই নজরে পড়ে না। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু কোনোদিন তার রূপের ঠাট ছিল না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিল না; চলনে-বলনে বেহায়াপনাও ছিল না। ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ। সে এমন কী অন্যায় করতে পারে?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই মজিদের একটা কথা হুংকার দিয়ে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। কথাটা মজিদ প্রায়ই বলে। বলে, মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না। তাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাসও নেই। এমন কাজ নেই দুনিয়াতে যা সে না করতে পারে এবং করলে সব সময়ে যে সমাজের কাছে ধরা পড়বে এমন নয়। কিন্তু খোদার কাছে কোনো ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। কথাটা ভাবতেই ব্যাপারীর কান দুটোতে রং ধরে। পশুপক্ষীকেও না জানতে দিয়ে কোনো গর্হিত কাজ ব্যাপারী কি কখনো করেনি? ব্যাপারীর মতো লোকও করেছে, যদিও আজ বললে হয়ত অনেকে তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে-কথা খোদাতা'লা ঠিক জানেন। তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।

না, মজিদের কথায় ভুল নেই। সহসা খালেক ব্যাপারী মনস্থির করে ফেলে। এবং এর তিন দিন পর যে-আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান-কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিল সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তব্ধ, বজ্রাহত মন

নিয়ে সেদিনের পালকিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায়নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পালকির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা দেয় না।

তবে পথে একটা জিনিস দেখলে হয়ত হঠাৎ তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসত। সেটা হলো থোতামুখের তালগাছটা। বহুদিনের গাছ, ঝড়ে-পানিতে আরও লোহা হয়ে উঠেছে যেন। প্রথম যৌবনে নাইয়র থেকে ফিরবার সময় পালকির ফাঁক দিয়ে এ-গাছটা দেখেই সে বুঝত যে, স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। ওটা ছিল নিশানা, আনন্দের আর সুখের।

সেদিন রাতে কে যেন একটা মস্ত মোমবাতি এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে মাজারের পাদদেশে, ঘটনা রোশনাই হয়ে উঠেছে। সে-আলোয় রুপালি ঝালরটা আজ অত্যধিক উজ্জ্বল দেখায়। মজিদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটা জিনিস। ঝালরের একদিকে ঔজ্জ্বল্য যেন কম; উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাতের মধ্যে ওইখানে কেমন একটু অন্ধকার! কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখে, ঝালরটার রুপালি ঔজ্জ্বল্য সেখানে বিবর্ণ হয়ে গেছে, সুতাগুলো খসেও এসেছে। দেখে মুহূর্তে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে। তার ভুরু কুঁচকে যায়, ঝালরের বিবর্ণ অংশটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার জীবনে শৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এই কয়েক গজ রুপালি চাকচিক্য। এর ঔজ্জ্বল্যই তার মনকে উজ্জ্বল করে রাখে; এর বিবর্ণতা তার মনকে অন্ধকার করে দেয়।

অবশ্য দু-বছর তিন বছর অন্তর মাজারের গাত্রাবরণ বদলানো হয় এবং বদলাবার খরচ বহন করে খালেক ব্যাপারীই। খরচ করে তার আফসোস হয় না। বরঞ্চ সুযোগটা পেয়ে নিজেকে শতবার ধন্য মনে করে। এদিকে মজিদও লাভবান হয়, কারণ পুরোনো গাত্রাবরণটি কেনবার জন্য এ-গ্রামে সে-গ্রামে অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে এবং প্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ততা বিচার করে দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে সেটা। কাজেই ঝালরটার কোনোখানে যদি রং চটে যায়, বা সালুকাপড়ের কোনো স্থানে ফাট ধরে তবে মজিদের চিন্তা করার কারণ নেই। কিন্তু তবু জিনিসটার প্রতি কী যে মায়া–তার সামান্য ক্ষতি নজরে পড়লেও বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদের সামনেই রহিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমেনা বিবির জন্য সারা দিন আজ মনটা ভারী হয়ে আছে। একটা প্রশ্ন কেবল ঘুরে-ফিরে মনে আসে। কেউ যদি হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কি ক্ষমা নেই? কী অন্যায়ের জন্য আমেনা বিবির এত বড় শাস্তিটা হলো তা অবশ্য জানে না, তবু সে ভাবতে পারে না আমেনা বিবি কিছু গর্হিত কাজ করতে পারে। আবার, করেনি এ-কথাও বা ভাবে কী করে? কারণ খোদাই তো জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে সে-অন্যায়ের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহিমা বিড় বিড় করে বলে, তুমি এত দয়ালু, খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।

সে বিড় বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায় যেন মাজারের সালু কাপড়টা ছেঁড়ে ফড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্য চমকে ওঠে মজিদ। মন তার ভারী। রুপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে-মন।

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিল বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশুনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়তে না তামাকের আড়তে চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে। মোদাব্বের মিঞা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিল। ভেবেছিল, এবার ছেলের একটা ভালো দেখে বিয়ে দিলে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্ত মনে তসবি টিপতে পারবে। বিয়ে দেবার তাগিতটা এই জন্য আরও বেশি বোধ করল যে, ছেলেটির রকম-সকম মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিল না। ছোটবেলা থেকে আক্কাস

কিছু উচক্কা ধরনের ছেলে। কিন্তু আজকাল মুরুব্বিদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরতর সন্দেহ নাকি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে তাকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে দেখে মুরুব্বিরা একেবারে নিরাশ হবার কোনো কারণ দেখল না। ভাবল, বিদেশি হাওয়ায় মাথাটা একটু গরম ধরেছে। তা দু-দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হবার লক্ষণ না দেখিয়ে আক্কাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল। বলে, ইস্কুল দেবে। কোত্থেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরুব্বিরা স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে দু-দুটো মক্তব বসানো হয়নি? সে কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনোখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?

আক্কাস যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। সে ঘুরতে লাগল চরকির মতো। ইস্কুলের জন্য দস্তুরমতো চাঁদা তোলার চেষ্টা চলতে লাগল, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদনপত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিল। কথা এই যে, ইস্কুলের জন্য সরকারের সাহায্য চাই।

বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারীর বাড়িতে গিয়ে উঠল। কোনো প্রকার ভণিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করল,

—কী হুনি ব্যাপারী মিঞা?

ব্যাপারী বলে, কথাডা ঠিকই।

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হলো। আক্কাস এল, আক্কাসের বাপ মোদাব্বের এল।

আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আক্কাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা।

সভা নীরব দেখে আক্কাস কী একটা কথা বলবার জন্য মুখ খুলেছে— এমন সময় মজিদ যেন হঠাৎ চেতনায় ফিরে এল। তারপর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠল কপালের রগ। ঠাস করে চড় মারার ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করল,

—তোমার দাড়ি কই মিঞা?

আক্কাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ইস্কুল হবে কী হবে না— সে আলোচনাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে দাড়ির কী সম্বন্ধ?

সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকালো আক্কাস। দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কারও ছাটা, কারও স্বভাবত হাল্কা ও ক্ষীণ; কারও-বা প্রচুর বৃষ্টি পানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মতো একরাশ দাড়ি। মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেত। কিন্তু সেদিন গেছে।

পূর্বোক্ত সুরে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—তুমি না মুসলমানের ছেলে—দাড়ি কই তোমার?

একবার আক্কাস ভাবে যে বলে, দাড়ির কথা তো বলতে আসেনি এখানে। কিন্তু মুরুব্বির সামনে আর যাই হোক বেয়াদপিটা চলে না। কাজেই মাথা নত করে চুপ করে থাকে সে।

দেখে মোদাব্বের মিঞা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গা ঢিলা করে। এতক্ষণ সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ছিল এই ভয়ে যে, উত্তরে বেয়াড়া ছেলেটা কী না জানি বলে বসে। মোদাব্বের মিঞা বলে,

—আমি কত কই দাড়ি রাখ ছ্যামড়া দাড়ি রাখ-তা হের কানে দিয়াই যায় না কথা।

খালেক ব্যাপারী বলে,

—হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠাণ্ডা থাকে।

ইংরাজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাড়ে। বলে যে, সে শুনেছে আক্কাস নাকি একটা ইস্কুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-কথা কী সত্যি?

আক্কাস অম্লান বদনে উত্তর দেয়,

—আপনি যা হুনছেন তা সত্য।

মজিদ দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করে। তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,

—তা এই বদ মতলব কেন হইল?

—বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজ-কাইল ইংরাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?

শুনে মজিদ হঠাৎ হাসে। হেসে এধার-ওধার তাকায়। দেখে আক্কাস ছাড়া সভার সকলে হেসে ওঠে। এমন বেকুবির কথা কেউ কি কখনো শুনেছে? শোন শোন, ছেলের কথা শোন একবার–এই রকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো-হো করে হাসে।

হাসির পর মজিদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্কাস মিঞা যে-দিনকালের কথা কইলা তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনষের মতি-গতির ঠিক নাই, খোদার প্রতি মন নাই; তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে–।

সকলে একবাক্যে সে-কথা স্বীকার করে। মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি। সাধারণ চাষাভুষা পর্যন্ত আজ কলমা জানে। তা ছাড়া লোকেরা নামাজ পড়ে পাঁচওক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকত আর শিরালি যপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচত; কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে, মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে-ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইত, বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত ধরত-আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিল, কিন্তু মজিদের একশ দোররার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে, ভাই সকল! পোলা মাইন্‌ষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে–তা নিয়ে আর কী কমু। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরি ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুইচারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্কাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তি বিধান হবে– এই আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেল। ব্যাপারীর নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বলে,

–বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন।

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক জানি শীতল হয়।

শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন– আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

একসময়ে আক্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,

–তয় ইস্কুলের কথাডা?

শুনে সকলে এমন চমকে ওঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটি কেমন তোতলায়। ধমকে তো তো করে বলে,

–চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না। মনে মনে সে খুশি হয় এই ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আস্তে ওঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারও মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মতো খামখেয়ালি বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়।

মসজিদের কথা চলতে থাকে। একসময়ে খরচের কথা ওঠে। মজিদ প্রস্তাব করে, গ্রামবাসী সকলেরই মসজিদটিতে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা হুড়কায় কারও না কারও যেন যৎকিঞ্চিৎ হাত থাকে। সেটা অবশ্য বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ একটা কানাকড়িও নেই এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য না করলেও গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে। তারা এই ভেবে তৃপ্তি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় খালেক ব্যাপারী তার এক সকাতর আর্জি পেশ করে। বলে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বারো আনা তাকে যেন বহন করতে দেওয়া হয়। তার জীবন আর ক-দিন। আর খায়েশ-খোয়াব বা আশা-ভরসা নাই, এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়। যা সামান্য টাকা-পয়সা আছে তা ধর্মের কাজে ব্যয় করতে পারলে দিলে কিছু শান্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথা কেমন যেন শোনায়। আমেনা বিবির ঘটনাটা সেদিন মাত্র ঘটল। কানাঘুষায় কথাটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই থেকে মানুষের মনে যেন একটা নতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে গিয়ে কষ্টিপাথরে ঘষলে জানা যায় আসল কথা, কিন্তু সে তো সব সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাজা বউদের দূর করার, আর গন্ডায় গন্ডায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

তবু যাহোক, মানুষের দিল বলে একটা বস্তু আছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে মানুষে মায়া হয়। তাই পরমাত্মীয়ের কোনো অন্যায়ে বুকে কঠিনতম আঘাত লাগে। ব্যাপারী আঘাত পেয়েছে। সে আঘাত এখনো শুকায়নি। তাই হয়ত দিলে শান্তি চায়।

মজিদ সভাকে প্রশ্ন করে,

–ভাই সকল, আপনাদের কী মত?

ব্যাপারীকে নিরাশ করবে–এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না। কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়।

মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হলো, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে, আধখানা আর আস্তই হোক–একজন লোক অন্তত একটা খরচ যেন বহন করে।

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আক্কাসের বদখেয়ালের কথা ওঠে। কিন্তু মোদাব্বের মিয়ার তখন জোশ এসে গেছে। রেগে উঠে সে বলে যে, ছেলে যদি অমন কথা ফের তোলে তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিল ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা গম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিস্ত্রি-কারিগর এসেছে, আর গতর খাটাবার জন্য তৈরি গ্রামের যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্গুনের পাগলা হাওয়া ছোটে। এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, ঝকঝকে রোদভাসা আকাশের তলে সে-দমকা হাওয়া কেমন বিচিত্র ঠেকে। তা ছাড়া শীতের হাওয়া শূন্য জমজমাট ভাবের পর আচমকা এই দমকা হাওয়া হঠাৎ মনের কোনো-এক অতল অঞ্চলকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে। ধুলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলোর কথা। কত বছর ধরে সে বসবাস করছে এ-দেশে। দশ, বারো? ঠিক হিসাব নেই, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাকপড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্রবেশ করেছিল এই মহব্বতনগর গ্রামে। সেদিন ছিল ভাগ্যান্বেষী দুস্থ মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক। বছরগুলো ভালোই কেটেছে এবং হয়ত ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

আজ দমকা হাওয়ার আকস্মিক আগমনে তার মনে ভবিষ্যতের কথাই জাগে। এবং তাই সারা দিন মনটা কেমন-কেমন করে। লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ভাসা–ভাসা ভাবে, কইতে-কইতে সে সহসা কেমন আনমনা হয়ে যায়।

সারা দিন হাওয়া ছোটে। সন্ধ্যার পরে সে-হাওয়া থামে। যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি আচমকা থেমে যায়। দোয়া-দুরুদ পড়ছিল মজিদ, এবার নিস্তব্ধতার মধ্যে গলাটা চড়া ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গলা নামিয়ে এধার-ওধার দেখে অকারণে, তারপর মাছের পিঠের মতো মাজারটার দিকে তাকায়। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। রুপালি ঝালরওয়ালা সালুকাপড়টার এক কোণে উলটে আছে।

সত্যিই সে চমকে ওঠে। ভেতরটা কিসে ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, স্রোতে ভাসমান নৌকায় চড়ে ধাক্কা খাওয়ার মতো ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খায়। কারণ, ঘরের ম্লান আলোয় কবরের সে-অনাবৃত অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখায়।

কার কবর এটা? যদিও মজিদের সমৃদ্ধির, যশমান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এই কবরটা, কিন্তু সে জানে না কে চিরশায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার একযুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে উঠেছিল, সে-কবরই ভীত করে তোলে তার মনকে। কবরের কাপড় উলটানো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে। এ নিঃসঙ্গতা কালের মতো আদিঅন্তহীন-যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র।

সে-রাতে রহিমা স্বামীর পা টিপতে টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। চিরকালের স্বল্পভাষিণী রহিমা কোনো প্রশ্ন করে না, কিন্তু মনে মনে ভাবে।

একসময়ে মজিদই বলে,

–বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত!

এমন কথা মজিদ কখনো বলে না। তাই সহসা রহিমা কথাটার উত্তর খুঁজে পায় না। তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর চড়িয়ে সে আস্তে বলে, আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি। কেমন মোটাতাজা পোলা।

প্রথমে মজিদ কিছুই বলে না। তারপর বলে,

–নিজের রক্তের না হইলে কি মন ভরে? কথাটা বলে আর মনে মনে অন্য একটা কথার মহড়া দেয়। মহড়া দেয়া কথাটা শেষে বলেই ফেলে। বলে, তা ছাড়া তার মায়ের জন্মের নাই ঠিক!

তারপর তারা অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। মজিদের নীরবতা পাথরের মতো ভারী। যে নিঃশব্দতা আজ তার মনে ঘন হয়ে উঠেছে সে নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মতো তা নিছক বাস্তব। এবং কথা হচ্ছে, পুষ্যি ছেলে তো দূরের কথা, রহিমাও সে-নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না। দূর হবে যদি নেশা ধরে। মজিদের নেশার প্রয়োজন।

ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ আবার হাহাকার করে ওঠে,

–আহা, খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিত!

মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে। তখন মাজারের অনাবৃত কোণটা মৃত মানুষের চোখের মতো দেখাচ্ছিল। তা দেখে হয়ত তার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মরণ হয়েছিল যে, জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের রক্ত পানি করা আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?

পরদিন সকালে মজিদ যখন কোরান শরিফ পড়ে তখন তার অশান্ত আত্মা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে মিহি চিকন কণ্ঠের ঢালা সুরে। পড়তে পড়তে তার ঠোঁট পিচ্ছিল ও পাতলা হয়ে ওঠে, চোখে আসে এলোমেলো হাওয়ার মতো অস্থিরতা।

বেলা চড়লে তার কোরান-পাঠ খতম হয়। উঠানে সে যখন বেরিয়ে আসে তখনো কিন্তু তার ঠোঁট বিড়বিড় করে–তাতে যেন কোরান-পাঠের রেশ লেগে আছে।

উঠানের কোণে আওলাঘরের নিচু চালের ওপর রহিমা কদুর বিচি শুকাবার জন্য বিছিয়ে দিচ্ছিল। সে পেছন ফিরে আছে বলে মজিদ আড়চোখে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখে কতক্ষণ। যেন অপরিচিত কাউকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলে না।

রাতে মজিদ রহিমাকে বলে,

–বিবি, একটা কথা।

শুনবার জন্যে রহিমা পা-টেপা বন্ধ করে। তারপর মুখটা তেরছাভাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পানে।

–বিবি, আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথি আনুম? সাথি মানে সতীন। সে-কথা বুঝতে রহিমার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলেই সহসা কোনো উত্তর আসে না মুখে।

রহিমাকে নিরুত্তর দেখে মজিদ প্রশ্ন করে,

–কী কও?

–আপনে যেমুন বোঝেন।

তারপর আর কথা হয় না। রহিমা আবার পা টিপতে থাকে বটে কিন্তু থেকে-থেকে তার হাত থেমে যায়। সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা এই মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্তবড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবার তার কিছু নেই।

জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদে মাঠ ফাটছে আর লোকদের দেহ দানা-দানা হয়ে গেছে ঘামাচিতে, এমন সময় মসজিদের কাজ শেষ হয়। এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই মজিদের দ্বিতীয় বিয়েও সম্পন্ন হয় অনাড়ম্বর দ্রুততায়। ঢাকঢোল বাজেনা, খানাপিনা মেহমান অতিথির হৈহুলস্থূল হয় না, অত্যন্ত সহজে ব্যাপারটা চুকে যায়।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারীকে সংগোপনে বলেছিল যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সব কিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

নতুন বউ-এর নাম জমিলা। জমিলাকে পেয়ে রহিমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায়-দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশ-পাশ আতরের গন্ধে ভুরভুর করে।

এক সময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

–হে নামাজ জানে নি?

রহিমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলে,

–জানে।

জানলে পড়ে না ক্যান?

জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহিমা সরাসরি উত্তর দেয়,

–পড়ব আর কি ধীরে-সুস্থে।

আড়ালে রহিমাকে মজিদ প্রশ্ন করে,

–তোমারে হে মানসম্মান করেনি?

–করে না? খুব করে। একরত্তি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালা। চোখ পর্যন্ত তোলে না।

তারা দু-জনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে-ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে। এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে - এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল।

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহি সুন্দর হাসির ঝংকার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনেনি। রহিমা জোরে হাসে না। সালুআবৃত মাজারের আশে-পাশে যারা আসে তারাও কোনোদিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার রোল ওঠে, কত জীবনের দুঃখবেদনা বরফ-গলা নদীর মতো হুহু করে ভেসে আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির ঝংকার ওঠে না কখনো। জীর্ণ গোয়ালঘরের মতো মক্তবে খিটখিটে মেজাজের মৌলবির সামনে প্রাণভয়ে তারস্বরে আমসিপারা-পড়া হতে শুরু করে অন্ন-সংস্থানের জন্য তিক্ততম সংগ্রামের দিনগুলোর মধ্যে কোথাও হাসির লেশমাত্র আভাস নাই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমুগ্ধ মানুষের মতো মজিদ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সামনের লোকটির পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভুরু।

পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,

–কে হাসে অমন কইরা?

জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুষ্টতা শোনা যায়। তাই যে-জমিলা মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওধারে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল লজ্জায়, সে আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে। কেউ উত্তর দেয় না।

মজিদ আবার বলে,

–মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও জানি কেউ হুনে না।

রহিমা এবার ফিসফিস করে বলে, হুনলানি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।

জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে। সে শুনেছে।

একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহিমা পাটি বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে আর অদূরে বেড়ার ওপর বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।

বুনতে-বুনতে জমিলা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। মজিদ বাড়িতে নেই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে। তবু সভয়ে চমকে ওঠে রহিমা বলে,

–জোরে হাইস না বই, মাইনষে হুনবো।

ওর হাসি কিন্তু থামে না। বরঞ্চ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচিত্রভাবে জীবন্ত সে হাসি, ঝরনার অনাবিল গতির মতো ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।

আপনা থেকে হাসি যখন থামে তখন জমিলা বলে,

–একটা মজার কথা মনে পড়ল বইলাই হাসলাম বুবু।

হাসি থেমেছে দেখে রহিমা নিশ্চিন্ত হয়। তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

–কী কথা বইন?

–কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা। সে-চোখ কৌতুকে নাচে।

–কও না।

বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,

–তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুবু বেড়ার ফাক দিয়া তানারে দেখাইছিল।

–কারে দেখাইছিল?

–আমারে। তয় দেইখা আমি কই; দ্যুত, তুমি আমার লগে মস্করা কর খোদেজা বুবু। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ। আর-হঠাৎ আবার হাসির একটা গমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে–আর, এইখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ি।

কথা শেষ করেছে কী অমনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু সে হাসি থামতে দেরি হলো না। রহিমার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেল।

সারা দুপুর পাটি বোনে, কেউ কোনো কথা কয় না। নীরবতার মধ্যে একসময়ে জমিলার চোখ ছল ছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভিমান গলা পর্যন্ত ওঠে ভারী হয়ে থাকে। রহিমার অলক্ষে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা তারপর কেঁদে ফেলে।

হাসি শুনে রহিমা যেমন চমকে উঠেছিল তেমনি চমকে ওঠে তার কান্না শুনে। বিস্মিত হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাঁদে আর পাটি বোনে, থেকে থেকে মাথা ঝেঁকে চোখ-নাক মোছে।

রহিমা আস্তে বলে,

–কাঁদো ক্যান বইন?

জমিলা কিছুই বলে না। পশলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহিমার পানে, তারপর হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কথা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্য তার প্রাণ জ্বলে। সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্য মনটা কাঁদে। বলে না যে, রহিমাকে হঠাৎ গম্ভীর হতে দেখে বুকে অভিমান ঠেলে এসেছিল এবং একবার অভিমান ঠেলে এলে কান্নাটা কী করে আসে সব সময়ে বোঝা যায় না। রহিমা উত্তরে হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নেয়, কপালে আস্তে চুমা খায়।

জমিলাই কিন্তু দু-দিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন? তার মনের হদিশ পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে কখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে—পূর্বাহ্নে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহিমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখ তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানবারও উপায় নেই।

একদিন সকালে কোত্থেকে মাথায় শনের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিল। কী তার বিলাপ, কী ধারালো তার অভিযোগ। তার সাতকুলে কেউ নেই, এখন নাকি তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে জাদুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাঁচের মতো ভেঙে খান-খান হয়ে গেল। মজিদ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর বিলাপ শেষ হয় না, গলার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কোমল হয় না। উত্তরে এবার সে কোমরে গোঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, সব দিলাম আমি, সব দিলাম। পোলাটার এইবার জান ফিরাইয়া দেন।

মজিদ আরও বোঝায় তাকে। ছেলে মরেছে, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশি পেয়ারের হয় সে আরও জলদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত ছেলের রুহের জন্য দোয়া করা; সে যেন বেহেশতে স্থান পায়, তার গুনাহ যেন মাফ হয়ে যায়—তার জন্য দোয়া করা।

কিন্তু এসব ভালো নছিহতে কান নেই বুড়ির; শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, তাতে দাউ-দাউ করে পুড়ে মরছে। মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে। অন্দরে আসতে দেখে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জমিলা, পাথরের মতো মুখ-চোখ। মজিদ থমকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার হুঁস নাই।

সেই থেকে মেয়েটির কী যেন হয়ে গেল। দুপুরের আগে মজিদকে নিকটে কোনো এক স্থানে যেতে হয়েছিল, ফিরে এসে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে হাত চেপে জমিলা মূর্তির মতো বসে আছে, ঝুরে আসা চোখে আশপাশের দিশা নাই।

রহিমা বদনা করে পানি আনে, খড়ম জোড়া রাখে পায়ের কাছে। মুখ ধুতে-ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ তারপর আবার আড়চোখে চেয়ে দেখে জমিলাকে। জমিলার নড়চড় নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিঁড়িতে এসে বসে। রহিমার হাত থেকে হুঁকাটা নিয়ে প্রশ্ন করে,

রহিমা একবার তাকায় জমিলার পানে। তারপর আঁচল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে আস্তে বলে,

—মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক হুঁকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—কিন্তু … ক্যান খারাপ করছে?

রহিমা সে-কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে,

—ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ওইরকম কইরা বসে না।

মজিদ হুঁকা টানে আর নীলাভ ধোঁয়ায় হাল্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার কোনো লক্ষণ দেখায় না তখন মজিদের মাথায় ধীরে ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে। মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হতো নানারকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কর্ত্রী-তবে না হয় বুঝত মন খারাপের অর্থ। কিন্তু বিবাহিতা একরত্তি মেয়ের আবার ওটা কী ঢং? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর-সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে-চলে। জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।

হঠাৎ মজিদ গর্জন করে ওঠে। বলে, আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে। ও কি ঘরে বালা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?

গর্জন শুনে রহিমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। জমিলাও এবার নড়ে। হঠাৎ কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাৎ ওঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায়।

সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব। সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভোঁতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে। বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে। মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে। একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটা কূল-কিনারহীন অথই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটখিটে হয়ে আছে। প্রশ্ন করলে কি একটা অতলতার প্রমাণ পাবে–এই ভয় মনে। মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এই দীর্ঘ এক যুগকালের মধ্যে বহু ভগ্ন, নির্মমভাবে আঘাত পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে। তাই আজ সকালে ওই সাতকুল খাওয়া শণের মতো চুল মাথায় বুড়িটার ছুরির মতো ধারালো তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু সে-বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেন?

মনে মনে ক্রোধে বিড়বিড় করে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে।

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়। মজিদের ঘুম আসে না। ঘুমের আগে জমিলার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। হয়ত এই মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে-ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্ত্বনার জন্য বা মিষ্টি-মধুর আশার কথার জন্য খাঁ-খাঁ করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে। তার সে শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিকিধিকি করে জ্বলে, মানে অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনল? যার কচি-কোমল লতার মতো হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিল–তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে-ধীরে?

তারপর কখন মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছিল। মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থামলে হঠাৎ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভারী হয়ে এল। তারই ভারিত্বে হয়ত চিন্তাক্ষত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেল। ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহু আকবার বলার অভ্যাস। তাই অভ্যাসবশত সে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখে জমিলা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝল না, তারপর ধাঁ করে ওঠে বসল। তারপর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সংযত করে অকম্পিত হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে কুপিটা ধরালো।

পাশের বারান্দার মতো ঘরটায় রহিমা শোয়। সেখানেই রহিমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

পরদিন জমিলার মুখের অন্ধকারটা কেটে যায়। কিন্তু মজিদের কাটে না। সে সারা দিন ভাবে। রাতে রহিমা যখন গোয়াল ঘরে গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুন-পানি মেশানো ভুসি গোলায় তখন বাইরের ঘর থেকে ফিরবার মুখে মজিদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। রহিমার মুখ ঘামে চকচক করে আর ভনভন করে মশায় কাটে তার সারা দেহ। পায়ের আওয়াজে চমকে ওঠে রহিমা দেখে, মজিদ। তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুসি গোলায়।

মজিদ একবার কাশে। তারপর বলে,

–জমিলা কই?

–ঘুমাইছে বোধ হয়।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস। মজিদ বলা-কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এই নিদারুণ ঘুমের জন্য। নামাজ তো দূরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না। যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে ওঠে ঢাকাঢোকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।

মজিদ এবার চাপা গলায় গর্জে ওঠে,

–ঘুমাইছে? তুমি কাম করবা, হে লাটবিবির মতো খাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি? ক্যান, এত ক্যান? থেমে আবার বলে, নামাজ পড়ছেনি?

নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলতে শুরু করেছিল, তবু টান হয়ে বসেছিল আধ ঘণ্টার মতো। তারপর কোনো প্রকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম দিয়েছে। কিন্তু তখন রহিমা পেছনে ছাপড়া দেওয়া ঘরটিতে বসে রান্না করছিল বলে সে-কথা সে জানে না।

–কী জানি, বোধ হয় পড়েছে।

–বোধ হয় বুধ হয় জানি না। খোদার কামে ওইসব ফাইজলামি চলে না। যাও, গিয়া তারে ঘুম থিকা তোল, তারপর নামাজ পড়বার কও।

রহিমা নিরুত্তরে ভুসি গোলানো শেষ করে। গাইটা নাসারন্ধ্র ডুবিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজ করে। ভুসি খেতে শুরু করে। কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া। সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে-পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধুয়ে এসে ঠাণ্ডা সে-হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে রহিমা যখন ধীরে ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার ঘুম কাঠের মতো। সে-ঘুম ভাঙে না। রহিমার গলা চলে, ধাক্কানি জোরালো হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে। এই সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাৎ এগিয়ে এসে এক হাত দিয়ে রহিমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। তার শক্ত মুঠির পেষণে মেয়েটির কব্জার কচি হাড় হয়ত মড়মড় করে ওঠে।

আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে ভেবে জমিলার চোখ ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠে প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ শ্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে। কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামটি করে না।

সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোনো কথাই সে বলবে না। নামাজ যে পড়েছে, এ কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে। মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করেনি কোনো দিন। আজ তার ঘরের এক রত্তি বউ–যাকে সে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিল বলে–সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অন্তরে যে ক্রোধ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে সে ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মতো ঘুরতে থাকে, ফুসতে থাকে। তার চেহারা দেখে রহিমার বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখেনি। কারণ সচরাচর সে যখন রাগে তখন তার রাগান্বিত মুখে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ধর্ম-সংস্কারের সদিচ্ছার কোমল আভা ছড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা।

–ওঠ বইন ওঠ, বহুত হইছে। নামাজ লইয়া কি রাগ করা যায়?

–রাগ? কিসের রাগ? মজিদ আবার গর্জে ওঠে। এই বাড়িতে আহ্লাদের জায়গা নেই। এই বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মূর্তি।

অবশেষে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝতে পারে না এরপর কী করবে। হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে,

দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে সতর্কতার গুণটা হারায়নি, সে–সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।

যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,

–ওই দিলে খোদার ভয় নেই। এইটা বড়ই আফসোসের কথা।

অর্থাৎ তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

পরদিন সকালে কোরান-পাঠ খতম করে মজিদ অন্দরে এসে দেখে, দরজার চৌকাঠের ওপর ক্ষুদ্র ঘোলাটে আয়নাটি বসিয়ে জমিলা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সিঁথি কাটছে। তেল জবজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া রোদের ঝলক লেগে জ্বলজ্বল করে। মজিদ যখন পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে তখন জমিলা পিঠটা কেবল টান করে যাবার পথ করে দেয়, তাকায় না তার দিকে।

এ সময়ে মজিদ নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে। মেছোয়াক করতে করতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে পায়চারি করে, পেছনে গাছ-গাছলার দিকে চেয়ে কী দেখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সযত্নে মেছোয়াক করে–দাঁতের আশে-পাশে, ওপরে-নিচে। ঘষতে ঘষতে ঠোঁটের পাশে ফেনার মতো থুথু জমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুকুরে গিয়ে দেহ রগড়ে গোসল করে আসে।

একটু পরে একটা নিমের ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ। আড়চোখে একবার তাকায় বউ-এর পানে। মনে হয়, ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই–মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

মেছোয়াক করতে করতে উঠানে চক্কর খায় মজিদ। একসময়ে সশব্দে থুথু ফেলে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুকুরঘাটে যেমন থাক থাক করে কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ি থাকে, তেমনি এটা গুঁড়ি বসানো। তারই নিচের ধাপে পা রেখে মজিদ আবার থুথু ফেলে, তারপর বলে,

–রূপ দিয়া কী হইব? মাইন্‌ষের রূপ ক-দিনের? ক-দিনেরই বা জীবন তার?

ক্ষীপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস-পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

মজিদ বলে চলে,

–তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্য হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব। তোমার দোষ কী?

জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি করছ, তা কি শক্ত গুনার কাম জানোনি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কি ডরাও না, দোজখের আঁগরে কি ডরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব। কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।

–তা ছাড়া, এই কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আস নাই তুমি! এই ঘর মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এইখানে তাঁনার রুহের দোয়া মানুষের শান্তি দেয়, সুখ দেয়। তাঁনার দিলে গোস্বা আসে এমন কাম কোনো দিন করিও না।

তারপর আরেকবার সশব্দে থুথু ফেলে মজিদ পুকুর ঘাটের দিকে রওনা হয়।

জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিতে তেমনি সতর্ক, কান খাড়া করে রাখা সশঙ্কিত হরিণের মতো। তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোস্তে মুখ দিতে গিয়ে খট্ করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়ত তেমনি কিছু একটা বোঝে সে। সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।

তারপর এক অদ্ভুত কান্ড ঘটে। দপ করে জমিলার চোখ জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, দাউ-দাউ করা শিখার মতো সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগ সহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

সেদিন বাদ-মগরেব শিরনি চড়ানো হবে। যে-দিন শিরনি চড়ানো হবে বলে মজিদ ঘোষণা করে সেদিন সকাল থেকে লোকেরা চাল-ডাল-মসলা পাঠাতে শুরু করে। সে চাল-ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে রহিমা তা দিয়ে খিচুড়ি বাঁধে। অন্দরের উঠানে সেদিন কাটা চুলায় ব্যাপারীর বড় বড় ডেকচিতে রান্না হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির হয়। জিকিরের পর খাওয়া-দাওয়া।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল-মসলা এল ব্যাপারীর বাড়ি থেকে। সেই শুরু। তারপর একসের আধসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মসলা আসতে থাকে। অপরাহ্নের দিকে অন্দরে উঠানে চুলা কাটা হলো। শীঘ্র সে-চুলা গনগন করে উঠবে আগুনে।

মগরেবের পর লোকেরা এসে বাইরের ঘরে জমতে লাগল। কে একজন মোমবাতি এনেছে ক-টা, তা ছাড়া আগরবাতিও এনেছে এক গোছা। বিছানো সাদা চাদরের ওপর মজিদ বসলে তার দুপাশে রাখা হলো দুটো দীর্ঘ মোমবাতি, আর সামনে একগোছা আগরবাতির জ্বলন্ত কাঠি। কাঠিগুলো এক ভাঙা চালের মধ্যে বসানো।

মজিদ আজ লম্বা সাদা আলখেল্লা পরেছে। পিঠ টান করে হাঁটু গেড়ে বসে সেটা গুঁজে দিয়েছে পায়ের নিচে পর্যন্ত। আর মাথায় পরেছে আধা পাগড়ি, পেছন-দিকটায় তার বিঘত খানেক লেজ।

যথেষ্ট দোয়া-দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে অতি ধীরে-ধীরে প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মতো। কারণ লোকেরা তখন পরস্পরের নিকট হতে দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিন্তু এই যোগশূন্যতার মধ্যে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে-নাবতে শুরু করেছে।

ঢিমেতেতালা ঢেউয়ের মতো ভাসতে-ভাসতে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে পরস্পরের সন্নিকটে। এ-ধীর গতিশীল অগ্রসর হবার মধ্যে চাঞ্চল্য নেই এখনো, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও নেই। খোদার অস্তিত্বের মতো তাদের লক্ষ্যের অবস্থান সম্পর্কে একটা নিরুদ্বিগ্ন বিশ্বাস।

সন্ধ্যাটি হাওয়া শূন্য। মোমবাতির শিখা স্থির ও নিষ্কম্প। অদূরে সালুকাপড়ে আবৃত মাছের পিঠের মতো মাজারটি মহাসত্যের প্রতীকস্বরূপ অটুট জমাট পাথরে নীরব, নিশ্চল।

কিন্তু ধীরে-ধীরে এদের গলা চড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে দুনে চলে জিকির। প্রত্যেক পরস্পরের সন্নিকটে আসতে থাকে এবং যে-মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষণে।

মজিদের চোখ ঝিমিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বারবার দেহ ঝুঁকে আসে। মুখের কথা আধা বুকে বিঁধে যায় আর তার অন্তরখনন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর থেকে ক্রমশ বলকে-বলকে একটা অস্পষ্ট বিচিত্র আওয়াজ বেরোয় শুধু। আর কতক্ষণ? পরস্পরের দাহ্য-চেতনা এবার মিলিত হবে-হচ্ছে করছে। একবার হলে মুহূর্তে সমস্ত কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়া-মমতা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে।

আওয়াজ বিচিত্রতর হতে থাকে। হু হু হু। আবার : হু হু হু। আবার–

অন্দরে উঠানে মজিদ নিজের হাতে যে-শিরনি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক করার ভার রহিমা-জমিলার ওপর। চাঁদহীন রাতে ঘন অন্ধকারের গায়ে বিরাট চুলা গনগন করে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহি-মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করে।

কাজের মধ্যে জমিলা উবু হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে বড় ডেকচিটাতে বলক-ওঠা চেয়ে-চেয়ে দেখে। সাহায্য করতে পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছে তারা অশরীরীর মতো নিঃশব্দে ঘুরে–ঘুরে কাজ করে। ধোয়া-পাকলা করে, লাকড়ি ফাড়ে, কিন্তু কথা কয় না কেউ।

বাইরে থেকে ঢেউ আসে জিকিরের। ডেকচিতে বলক-আসা দেখে জমিলা, আর সে-ঢেউয়ের গর্জন কান পেতে শোনে। সে-ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবক্তব্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় তখন একসময়ে হঠাৎ কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে জমিলা। সে-ঢেউ তাকে আচম্বিতে এবং অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। তারপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে! বালু তীরে যুগযুগ আঘাত পাওয়া শক্ত-কঠিন পাথর তো সে নয়। হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সে পিঠ সোজা করে বসে, তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এধার-ওধার চেয়ে শেষে রহিমার পানে তাকায়। গনগনে আগুনের পাশে কেমন চওড়া দেখায় তাকে কিন্তু কানের পাশে গোঁজা ঘোমটায় আবৃত মাথাটি নিশ্চয় : চোখ তার বাষ্পের মতো ভাসে।

পানিতে ডুবতে থাকা মানুষের মতো মুখ তুলে আবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা থই পায় না কোথাও। শেষে সে রহিমাকে ডাকে,

–বুবু!

রহিমা শোনে কি শোনে না। সে ফিরে তাকায়ও না, উত্তরও দেয় না। এদিকে ঢেউয়ের পর আরও ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ। হু হু হু। আবার : হু হু হু। দুনিয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আছে, আকাশে যেন তারা নেই।

তারপর একটু পরে চিৎকার ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর দ্রুততায় আসতে থাকা পর্বতপ্রমাণ অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। মুহূর্তে কী যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, মারাত্মক বন্যাকে যেন অবশেষে কারা রুখতে পারে না। এবার ভেসে যাবে জনমানব-ঘরবসতি, মানুষের আশা-ভরসা।

বিদ্যুৎ গতিতে জমিলা উঠে দাঁড়ায়। ক্ষীণ দেহে বৃদ্ধ বৃক্ষের মতো কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট কণ্ঠে আবার ডাকে,

–বুবু!

এবার রহিমা মুখ তুলে তাকায়। তার চওড়া দেহটি শান্ত দিনের নদীর মতো বিস্তৃত আর নিস্তরঙ্গ। উজ্জ্বল চোখ ঝলমল করছে বটে কিন্তু তাও শান্ত, স্পষ্ট। সে-চোখের দিকে জমিলা তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু অবশেষে কিছু বলে না। তারপর সে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ হয়েই থাকে। তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ হাওয়া করে, কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা করে আফসোস করে, কেউ-বা এ হট্টগোলের সুযোগে মজিদের অবশ পদযুগল মত্ত চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়। কেবল ক্ষয়ে-আসা মোমবাতি দুটো তখনো নিষ্কম্প স্থিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা লোকের নজরে বাইরের দিকে যায়। কেন যায় কে জানে, কিন্তু বাইরে গাছতলার দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। কে ওখানে? আলিঝালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই। সে আর দৃষ্টি ফেরায় না। তারপর একে একে অনেকেই দেখে। তবু মেয়েটি নড়ে না। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মতো রহস্যময় মনে হয়।

শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হয়। ধীরে ধীরে সে উঠে বসে তারপর চোখে অর্থহীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সবার দিকে তাকায়। একসময়ে সেও দেখে মেয়েটিকে। সে তাকায়, তারপর বিমূঢ় হয়ে যায়। বিমূঢ়তা কাটলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে চোখ।

অবশেষে কী করে যেন মজিদ সরল কণ্ঠে হাসে। সকলের দিকে চেয়ে বলে,

–পাগলি ঝিটা। একটু থেকে আবার বলে, নতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে।

তারপর হাততালি দিয়ে উঁচু গলায় মজিদ হাঁকে, এই বিটি ভাগ! ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ করে জ্বলে।

হয়ত তার চোখের আগুনের হল্কা লেগেই ঘোর ভাঙে জমিলার। হঠাৎ সে ভেতরের দিকে চলতে থাকে, তারপর শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার জিকির শুরু হয়। কিন্তু কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে, জিকির আর জমে না। লোকেরা মাথা দোলায় বটে কিন্তু থেকে থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্রতায় নিক্ষিপ্ত হয় গাছতলার দিকে। কাঙালের মতো তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়। মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়। জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে। ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে, কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন গুঁড়িয়ে ভস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে। কেশে একে একে সকলের পানে তাকায়। তারপর বলে,

–ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোনো কারণে আপনারা বেচাইন আছেন। কী তার কারণ?

কেউ উত্তর দেয় না। কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে। কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ তারপর বলে, আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে গোগ্রাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের। কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশভাবে চুপচাপ।

নিভন্ত চুলার পাশে রহিমা তখনো বসে আছে, পাশে নাবিয়ে রাখা খিচুড়ির ডেকচি। বুড়ো আওলাদ আন্দরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। এবার খালি বর্তন নিয়ে আসে ভেতরে।

একটু পরে মজিদও আসে। রহিমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিধা হয়ে বসে। ভাবে, রান্না ভালো হলো কী খারাপ হলো এইবার মতামত জানাবে মজিদ। কাছে এসে মজিদ কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না। কেমন চাপা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে,

–হে কই?

রহিমা চারধারে তাকায়। কোথাও জমিলা নেই। মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাৎ ওঠে চলে গেল তারপর আর সে এদিকে আসেনি। আস্তে রহিমা বলে,

–বোধ হয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়মিড় করে এবার মজিদ বলে,

–ও যে একদম বাইরে চইলা গেল, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহিমা। জমিলা বাইরে গিয়েছিল? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে,

–হে বাইরে গেছিল?

তখনো দাঁত কিড়মিড় করে মজিদের। উত্তরে শুধু বলে,

–হ!

তারপর হনহনিয়ে ভেতরে চলে যায়।

রহিমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে। তার হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

পরে সেদিনকার মতো জমিলাকে ডাকতে সাহস হয় না। নিভন্ত হুঁকাটা পাশে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির কাছাকাছি গুম হয়ে বসে ছিল মজিদ। তার দিকে চেয়ে ভয় হয় যে, ডাকার আওয়াজে সহসা সে জেগে উঠবে, চাপা ক্রোধে হঠাৎ ফেটে পড়বে, নিঃশ্বাসরুদ্ধ-করা আশঙ্কার মধ্যে তবু যে-নীরবতা এখনো অক্ষুণ্ন আছে তা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। তাই উঠানটা পেরুতে গিয়ে সতর্কভাবে হাঁটে রহিমা, নিঃশব্দে আর আলগোছে। কিন্তু এদিকে তার মাথা ঝিমঝিম করে। জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম করে

ওঠে। মনে-মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মতো মেয়েটি যেন এ-সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বালা ডেকে আনবে আর মাজারপাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে উঠেছে সে-সংসার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

ওদিক থেকে ফিরে রহিমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকে-বিবি শোন। তোমার লগে কথা আছে।

সে নিরুত্তরে পাশে এসে দাঁড়ালে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে। সংকীর্ণ দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো। তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রহিমার মুখকে অস্পষ্ট করে তোলে। সে দিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোঁট যেন কেমন থর থর করে কেঁপে ওঠে।

–বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কি বদদোয়া দিছিলানি?

শেষোক্ত কথাটা তড়িৎবেগে আহত করে রহিমাকে। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে উত্তর দেয়,

–তওবা-তওবা, কী যে কন। কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহিমা। মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখ দুটো ভেজা মাটির মতো নরম। মুহূর্তের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রং শূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহিমার মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো নিঃশ্বাস ফেলে জীবনে প্রথম হয়ত কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহিমাকে বলে,

–কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।

কখনো এমন সহজ-সরল পরমাত্মীয়ের মতো কথা মজিদ বলে না। তাই ঝট্ করে রহিমা তার অর্থ বোঝে না। অকারণে মাথায় ঘোমটা টানে, তারপর ঈষৎ চমকে ওঠে তাকায় স্বামীর পানে। তাকিয়ে নতুন এক মজিদকে দেখে। তার শীর্ণ মুখের একটি পেশিও এখন সচেতনভাবে টান হয়ে নেই। এত দিনের ঘনিষ্ঠতার ফলেও যে-চোখের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি সে-চোখ এই মুহূর্তে কেমন অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। দেখে একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে রহিমার মনে, তারপর পুলক শিহরণে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সে পুলক শিহরণের অজস্র ঢেউয়ের মধ্যে জমিলার মুখ তলিয়ে যায়, তারপর ডুবে যায় চোখের আড়ালে।

হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে রহিমা বলে,

–কী কমু? মাইয়াডা জানি কেমুন। পাগলি। তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়া–পানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবনি সব।

পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার। ঘুম থেকে ওঠে বাসি খিছুড়ি গোগ্রাসে গিলে খেয়ে সে উঠানে নেবেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে। এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে। ফজরের নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

মজিদের মুখ গম্ভীর। ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমার বে-ইজ্জত করছ! খালি তা না, তুমি তাঁনারে নারাজ করছ। আমার দিলে বড় ডর উপস্থিত হইছে। আমার উপর তাঁনার এৎবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব। একটু থেমে মজিদ আবার বলে, –আমার দয়ার শরীল। অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাথি দিয়ে বাপের বাড়িত পাঠাইয়া দিত। আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার। তুমি আমার বিবি হইলে কী হইব, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগাগোড়া মাথা নিচু করে শোনে। তার চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,
–হুনছ নি কী কইলাম?
কোনো উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে। তাঁর নির্বাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে। কণ্ঠস্বর আরও রুক্ষ করে সে বলে,
–দেখ বিবি, আমারে রাগাইও না। কাইল যে কামটা করছ তার পরেও আমি চুপচাপ আছি এই কারণে যে, আমার শরীলটা বড়ই দয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।
কোনো উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চুপ করে থাকে মজিদ। তারপর ক্রোধ সংযত করে বলে,
–তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। তানার নাম মোদাচ্ছের। কাপড়ে ঢাকা মানুষেরে কোরানের ভাষায় কয় মোদাচ্ছের। সালুকাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তারপর মজিদ একটা গল্প বলে। বলে যে, একবার রাতে এশার নামাজের পর সে গেছে মাজার ঘরে। কখন তার অজু ভেঙে গিয়েছিল খেয়াল করেনি। মাজার-ঘরে পা দিতেই হঠাৎ কেমন একটি আওয়াজ কানে এল তার, যেন দূর জঙ্গলে শত-সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে। বাইরে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেবে সে ঘর ছেড়ে বেরুতেই মুহূর্তে সে আওয়াজ থেমে গেল। বড় বিস্মিত হলো সে, ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝে কতক্ষণ হতভম্বের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো। একটু পরে সে যখন ফের প্রবেশ করল মাজার-ঘরে তখন শোনে আবার সেই শতসহস্র সিংহের ভয়াবহ গর্জন। কী গর্জন, শুনে রক্ত তার পানি হয়ে গেল ভয়ে। আবার বাইরে গেল, আবার এল ভেতরে। প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার। শেষে কী করে খেয়াল হলো যে, অজু নেই তার, নাপাক শরীরে পাক মাজার-ঘরে সে ঢুকেছে। ছুটে গিয়ে মজিদ তালাবে অজু বানিয়ে এল। এবার যখন সে মাজার-ঘরে এল তখন আর কোনো আওয়াজ নেই। সে-রাতে দরগার কোলে বসে অনেক অশ্রু বিসর্জন করল মজিদ।

গল্পটা মিথ্যা। এবং সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মনে-মনে তওবা কাটে মজিদ। যাহোক, জমিলার মুখের দিকে চেয়ে মজিদের মনের আফসোস ঘোচে। যে অত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায়নি সে মাজার পাকের গল্পটা শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কেমন ভীতির ছায়া। বাইরে অটুট গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও মনে-মনে মজিদ কিছুটা খুশি না হয়ে পারে না। সে বোঝে, তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।

–তয় তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তারাবির, আর পরে তানার কাছে মাফ চাইবা।

জমিলা ততক্ষণে চোখ নাবিয়ে ফেলেছে। কথার কোনো উত্তর দেয় না।

তারাবিই হোক আর যাই হোক, সে-রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ওঠাবসা করে। ঘরসংসারের কাজ শেষ করে রহিমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার নামাজ শেষ হয়নি দেখে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে। ও ঘরে মজিদ হুঁকায় দম দেয়। আওয়াজ শুনে মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃপ্তিতে ভরে ওঠেছে। রহিমা অজু বানিয়ে এসেছে, সেও এবার নামাজটা সেরে নেয়। তারপর পা টিপতে হবে কিনা এ-কথা জানার অজুহাতে মজিদের কাছে গিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ করে। উত্তরে মজিদ ঘন-ঘন হুঁকায় টান মারে, আর চোখটা পিটপিট করে আত্মসচেতনতায়।

রহিমা কিছুক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে। হাড়সম্বল কালো কঠিন পা, মৃতের মতো শীতল শুষ্ক তার চামড়া। কিন্তু গভীর ভক্তিভরে সে পা টেপে রহিমা, ঘুণধরা হাড়ের মধ্যে যে-ব্যথার রস টনটন করে তার আরাম করে।

সুখভোগ নীরবেই করে মজিদ। হুঁকায় তেজ কমে এসেছে, তবু টেনে চলে। কানটা ওধারে। নীরবতার মধ্যে ওঘর হতে থেকে থেকে কাঁচের চুড়ির মৃদু ঝংকার ভেসে আসে। সে কান পেতে শোনে সে ঝংকার।

সময় কাটে। রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে-ঘাটে। একসময়ে রহিমা আস্তে ওঠে চলে যায়। মজিদের চোখেও একটু তন্দ্রার মতো ভাব নাবে। একটু পরে সহসা চমকে জেগে ওঠে সে কান খাড়া করে। ও ধারে পরিপূর্ণ নীরবতা : সে নীরবতার গায়ে আর চুড়ির চিকন আওয়াজ নেই।

ধীরে ধীরে মজিদ ওঠে। ও ঘরে গিয়ে দেখে জায়নামাজের ওপর জমিলা সেজদা দিয়ে আছে। এখুনি উঠবে–এই অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ। জমিলা কিন্তু ওঠে না।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না মজিদের। নামাজ পড়তে পড়তে সেজদায় গিয়ে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যুর মতো আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না কী করবে। তারপর সহসা আবার সে-চিনচেনে ক্রোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে। নামাজ পড়তে পড়তে যার ঘুম এসেছে তার মনে ভয় নাই এ-কথা স্পষ্ট। মনে নিদারুণ ভয় থাকলে মানুষের ঘুম আসতে পারে না কখনো। এবং এত করেও যার মনে ভয় হয় নাই, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে সেদিনকার মতো এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় জমিলাকে। জমিলা চমকে ওঠে তাকায় মজিদের পানে। প্রথমে চোখে জাগে ভীতি, তারপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।

মজিদ গোঁ গোঁ করে ক্রোধে। রাতের নীরবতা এত ভারী যে, গলা ছেড়ে চিৎকার করতে সাহস হয় না, কিন্তু একটা চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে। যেন দূর আকাশে মেঘ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।

–তোমার এত দুঃসাহস? তুমি জায়নামাজে ঘুমাইছ? তোমার দিলে একটু ভয়ডর হইব না?

জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। ভয়ে নয় ক্রোধে। গোলমাল শুনে রহিমা পাশের বিছানা থেকে ওঠে এসেছিল, সে জমিলার কাঁপুনি দেখে ভাবলে দুরন্ত ভয় বুঝি পেয়েছে মেয়েটার। কিন্তু গর্জন করছে মজিদ, গর্জন করছে খোদাতায়ালার ন্যায় বাণী, তাঁর নাখোশ দিল। মজিদের ক্রোধ তো তাঁরই বিদ্যুৎচ্ছটা, তাঁরই ক্রোধের ইঙ্গিত। কী আর বলবে রহিমা। নিদারুণ ভয়ে সেও অসাড় হয়ে যায়। তবে জমিলার মতো কাঁপে না।

বাক্যবাণ নিষ্ফল দেখে আরেকটা হ্যাঁচকা টান দেয় মজিদ। শোয়া থেকে আচমকা একটা টানে যে ওঠে বসেছিল, তাকে তেমনি একটা টান দিয়ে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হয় না। বরঞ্চ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই জমিলা সুস্থির হয়ে দাঁড়াল, এবং কাঁপতে থাকা ঠোঁটকে উপেক্ষা করে শান্ত দৃষ্টিতে একবার নিজের ডান হাতের কব্জির পানে তাকাল। হয়ত ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু ব্যথার স্থান শুধু দেখল। তাতে হাত বুলাল না। বুলাবার ইচ্ছে থাকলেও অবসর পেল না। কারণ আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চলল বাইরের দিকে।

উঠানটা তখনো পেরোয়নি, বিভ্রান্ত জমিলা হঠাৎ বুঝলে কোথায় সে যাচ্ছে। মজিদ তাকে মাজারে নিয়ে যাচ্ছে। তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মজিদ আগেই বলেছিল, এবং সেই থেকে একটা ভয়ও উঠেছিল জমিলার মনে। মাজারের ত্রিসীমানায় আজ পর্যন্ত ঘেঁষেনি সে। সকালে আজ মজিদ যে-গল্পটা বলেছিল, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসলো জমিলা। মজিদের টানে স্রোতে-ভাসা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিল, এখন সে সমস্ত শক্তি সংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টা

করেও হাত যখন ছাড়াতে পারল না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল।

পেছনে-পেছনে রহিমা আসছিল কম্পিত বুক নিয়ে। আবছা অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না; এও বুঝল না মজিদ অমন বজ্রাহত মানুষের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মজিদ সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটি কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেয় দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মজিদ রহিমার পানে তাকালো, তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল,

–হে আমার মুখে থুথু দিল!

একটু পরে অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল রহিমা,

–কী করলা বইন তুমি, কী করলা!

তার আর্তনাদে কী ছিল কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল মনে-প্রাণে। কী একটা গভীর অন্যায়ের তীব্রতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে।

মজিদ রহিমার চিৎকার শুনলো কী শুনলো না, কিন্তু ওধারে তাকালো না, কোনো কথাও বললো না। আরও কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাত-কাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেললো। ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে গেছে; সে-হাত ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নাই, বন্দি হয়ে আছে বলে প্রতিবাদ নাই। তার হাতের লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোনো কারণ দেখলো না; সে নিজের বজ্রমুষ্টিকে আরও কঠিনতর করে তুলল। তারপর হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাঁজাকোল করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল বাইরের দিকে। ভেবেছিল, হাত-পা ছোড়াছুড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকলো মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে। এত নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তারার ঝলকানির মতো এক মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটা আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মতো নিষ্পেষিত করে ফেলবার। কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মতো মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠল। এবারেও সে অসতর্ক হলো না। এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

জমিলাকে সোজা মাজার–ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পদপ্রান্তে বসিয়ে দিল মজিদ। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয় চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ও দুরন্ত বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

মজিদের কণ্ঠের ঝড় থামে না। জমিলা স্তব্ধ হয়ে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, মাছের পিঠের মতো একটা ঘনবর্ণ স্তূপ রেখায়িত হয়ে ওঠে সামনে। মাজারের অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে জমিলার ভীত চঞ্চল মনটা কিছু স্থির হয়ে এসেছে–এমনি সময়ে বুক-ফাটা কণ্ঠে মজিদ হো হো করে উঠল। তার দুঃখের তীক্ষ্ণতার সে কী ধার। অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দু-ফাঁক করে দিল। সভয়ে চমকে ওঠে জমিলা তাকাল স্বামীর পানে। মজিদের কণ্ঠে তখন আবার দোয়া-দরুদের ঝড় জেগেছে, আর ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্রপল্লবের মতো ঘূর্ণায়মান তার অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখ।

একটু পরে হঠাৎ জমিলা আর্তনাদ করে উঠল। আওয়াজটা জোরালো নয়, কারণ একটা প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সে চুপ করে গেল। কিন্তু ঝড়ের শেষ নেই। ওঠা-নাবা আছে, দিক পরিবর্তন আছে, শেষ নেই। এবং শেষ নেই বলে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।

ধাঁ করে জমিলা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মজিদও ক্ষীপ্রভাবে উঠে দাঁড়াল। জমিলা দেখল পথ বন্ধ। যে-ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার যো নাই, সে ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এইটুকুন পথ পেরোবার উপায় নাই।

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া-দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ। এই সময় সে বলে,

–দেখ আমি যেইভাবে বলি সেইভাবে কর। আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূতপ্রেতও রক্ষা পায় নাই। এই দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরিরা। আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারও আছর আছে। না হইলে মাজারপাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি আইল না কেন, কেন তোমার দিলে একটু পাশোনির ভাব জাগল না? কেনই-বা মাজারপাক তোমার কাছে আগুনের মতো অসহ্য লাগতাছে?

এই বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমর বাঁধল। মাঝখানের দড়িটা ঢিলা রাখল, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে। তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,

–তোমার জন্য আমার মায়া হয়। তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে। কিন্তু মানুষের ফোঁড়া হইলে সে-ফোঁড়া ধারালো ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। কিন্তু তোমারে আমি এইসব করুম না। কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক পহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব। কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।

মনে-মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিল, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কাঁদতে শুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলও না, কিছু বললও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে রইল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উঁচিয়ে বলল,

–ঝাপটা দিয়া গেলাম। কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইক না। দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তানার কাছে মাফ চাও।

তারপর সে ঝাপ দিয়ে চলে গেল।

ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহিমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

–হে কই?

–মাজারে। ওর ওপর আছর আছে। মাজারে কিছুক্ষণ থাকলে বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব হে-জিন।

–ও ভয় পাইব না?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মজিদ। বিস্মিত হয়ে বললে,

–কী যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ওই দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুথু দিছে।

কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠল মজিদের। দম খিচে ক্রোধ-সংবরণ করে সে আবার বললে,

–তুমি ঘরে গিয়া শোও বিবি।

রহিমা ঘরে চলে গেল। গিয়ে ঘুমাল কী জেগে রইল তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করল না মজিদ। মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ করে রইল। যে-কোন মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে–এই আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রায় করে তুলল। কিন্তু ওধারে কোনো আওয়াজ নেই। থেকে থেকে দূরে প্যাঁচা ডেকে উঠছে, আরও দূরে কোথাও একটা দীর্ঘ গাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চা নবজাত মানবশিশুর মতো অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে একটা বাদুর থেকে থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়চড় নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিন্দু বিন্দু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোনো আওয়াজ নেই। মুমূর্ষু রোগীর পাশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাত্মীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে মজিদ, গাছের পাতার মতো তারও নড়চড় নাই।

আরও সময় কাটে। এক সময় মজিদ বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে ঝিমিয়ে নেয়, তারপর দূর আকাশে মেঘগর্জন শুনে চমকে ওঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের দিকে। যে-রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা সেখানে ঘনীভূত মেঘস্তূপ। থেকে থেকে বিজলি চমকায়, আর শীঘ্র ঝির ঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুখে পালকস্পর্শের মতো সে শিরশিরে শীতল হাওয়া বেশ লাগে এবং সেই আরামে কয়েক মুহূর্ত চোখও বোজে সে। কিন্তু কান খাড়া হয়ে ওঠার সাথে সাথে চোখটাও তার খুলে যায়। সে দেখে না কিছু শোনেও না কিছু। মেঘ দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।

আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে রহিমা একবার ছায়ার মতো এসে ঘুরে যায়। ওর দিকে মজিদ তাকায়ও না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে-ফিরছে এ-কথা জিজ্ঞাসা করবারও কোনো তাগিদ বোধ করে না। তার মনে যেন কোনো প্রশ্ন নেই, নেই অস্থিরতা, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে অপেক্ষা যুগ ব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোনো উদ্বেগ আসবে না। কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে বসে মেঘ দেখে।

মেঘগর্জন নিকটতর হয়। এবার যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে ওঠে সাদা হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে নিজেকে উলঙ্গ বোধ হলেও মজিদ চিরে দু-ফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তারপর প্যাচার মতো মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের পানে। সে অন্ধকারে তবু চোখ পিটপিট করে, আশায় আর আকাঙ্ক্ষায়। সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা অবসর উপভোগীর অলস বিলাস মাত্র। চোখ তার পিটপিট করে আর পুনর্বার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদরত প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না করে। হয়ত-বা সে এবাদত করে। এবাদতের রকমের শেষ নেই। প্রকৃতির লীলা চেয়ে-চেয়ে দেখাও একরকম এবাদত।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে। রাতও কাটি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার মতো সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির যবনিকা ওঠে না। প্রকৃতি অবলোকনের এবাদতই যদি করে থাকে মজিদ তবে ঈষৎ বিরক্তি ধরে যেন, কারণ ভ্রুর কাছটা একটু কুঁচকে যায়।

তারপর হঠাৎ ঝড় আসে। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘনকালো মেঘে, তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় গাছপালা গোঙায়, থরথর করে কাঁপে মানুষের বাড়িঘর। মজিদ ওঠে আসে ভেতরে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেরি নয়, ওধারে মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে। সুবেহ্ সাদেক। নির্মল, অতি পবিত্র তার বিকাশ। যে-রাতে অসংখ্য দুষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সে রাতের শেষ; নতুন দিনের শুরু। মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল-ফালাখ। সন্ধ্যার আকাশে অস্তগামী সূর্য দ্বারা ছড়ানো লাল আভাকে যে কুৎসিত ভয়াবহ অন্ধকার মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সে-অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, চাই তোমারই কাছে হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক। আমি বাঁচতে চাই যত অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, হে দিনাদির অধিকারী।

এদিকে প্রভাতের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ঝড়ের পরে আসে জোরালো বৃষ্টি। অসংখ্য তীরের ফলার মতো সে বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি। মজিদের ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে যখন পথভ্রষ্ট উল্কার মতো প্রথম শিলাটি এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে উঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে ওঠে বিপদ সংকেত শুনে। শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

তড়িৎবেগে মজিদ উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে। দু-পা এগিয়ে ওধারে তাকিয়ে সে বলে, বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

পরিষ্কার প্রভাতের অপেক্ষায় রহিমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসেছিল। সে কোনো উত্তর দেয় না। মজিদ আরেকটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার উৎকণ্ঠিত গলায় বলে,

–বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

রহিমা এবারও উত্তর দেয় না। তার আবছা চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, সে চোখ যেন জমিলার সেদিনকার চোখের মতো হয়ে উঠেছে–যেদিন সাতকুলখাওয়া খ্যাংটা বুড়ি এসে আর্তনাদ করেছিল।

এদিকে আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মতো খণ্ডখণ্ড বরফের অজস্র টুকরো, হয় জমা বৃষ্টিপাত। দিনের বেলা হলে বাছুরগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটত, এক-আধটা হয়ত আঘাত খেয়ে শুয়েও পড়ত, কাদের মিঞার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকতে ডাকতে হয়রান হতো। বউরা আসত বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে লুফে খেত খোদার ঢিল। কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা।

ছেলে-ছোকরারা আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে–তা দিন-রাতের যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে-মাঠে নধর-কচি ধান ধ্বংস হয়ে যায়, শিলার আঘাতে তার শিষ ঝরে-ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকার যাত্রীদের মতো আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে, যারা জানে না তারা পাথর হয়ে বসে থাকে।

রহিমার কাছে উত্তর না পেয়ে এলেমদার মানুষ মজিদ খোদাকে ডাকতে শুরু করে। একবার ছুটে দরজার কাছে যায়, সর্ষের মতো উঠানে ছেয়ে যাওয়া শিলা দেখে, তারপর আবার দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে। একসময়ে রহিমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বলে,

–কী হইল তোমার? দেখ না, শিলাবৃষ্টি পড়ে!

একবার নড়বার ভঙ্গি করে রহিমা, কিন্তু তবু কিছু বলে না। পোষা জীবজন্তু একদিন আহার মুখে না দিলে যে রহিমা অস্থির হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়, দুটো ভাত অযথা নষ্ট হলে যে আফসোস করে বাঁচে না, মাঠে মাঠে কচি নধর

ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে। এবং যে রহিমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে,

–কী হইলো তোমার বিবি?

রহিমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,

–ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না। তারপর শিলাবৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে য়ায়। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত মেঘাবৃত। তবু তা ভেদ করে একটা ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

ঝাপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে-বুকটা বালকের বুকের মতো সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না; এমনকি তার মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না। সে নত হয়ে ধীরে ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পাঁজাকোল করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায় শুইয়ে দিতেই রহিমা স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

–মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এই রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কিন্তু কেন কে জানে সে কোনো উত্তর দিতে পারে না! শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে,

–না। একটু থেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছর ছাড়লে এই রকমটা হয়।

সে–কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহিমা তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর কী একটা প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘন-ঘন হাত বুলাতে শুরু করে। মায়া যেন ছলছল করে জেগে উঠে হঠাৎ বন্যার মতো দুর্বার হয়ে ওঠে, তার কম্প্রমান আঙুলে সে-বন্যার উচ্ছ্বাস জাগে; তারই আবেগে বার-বার বুজে আসে চোখ।

মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে।

মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে-মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।

গলা কেশে মজিদ বলে,

–দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ক্ষেতের প্রান্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারও মুখে কথা নেই। মজিদকে দেখে কে একজন হাহাকার করে উঠে বলে–সব তো গেল! এইবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?

মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিঝরা প্রভাতের ম্লান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে,

–নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখ।

এরপর আর কারও মুখে কথা জোগায় না। সামনে ক্ষেতে-ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে-চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চল	–	ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের এমন একটি বিশেষ অঞ্চলের বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে ফসল এবং খাদ্যশস্যের প্রচণ্ড অভাব অথচ, জনসংখ্যার আধিক্য বর্তমান।
বেরিয়ে পড়বার ... করে রাখে	–	অভাবের তাড়নায় দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছে অজানার উদ্দেশে। এই অজানা, অচেনা স্থান সম্পর্কে তার মধ্যে অনিশ্চয়তার শঙ্কা কাজ করে সেটিই এখানে বোঝানো হয়েছে।
নলি	–	জাহাজে চড়ার অনুমতিপত্র।
জ্বালাময় আশা	–	তীব্র ক্ষুধা ও যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তির প্রত্যাশা।
হা শূন্য	–	অভাবগ্রস্ত। দারিদ্র্য।
দিনমানক্ষণের সবুর	–	মুহূর্তের অপেক্ষা। সামান্য সময়ের প্রতীক্ষা।
ফাঁসির শামিল	–	মৃত্যুর অনুরূপ।
ঝিমধরা	–	অবসন্ন। স্থির।
সর্পিল গতিতে	–	সাপের আঁকাবাঁকা চলনের মতো।
সজারু কাঁটা হয়ে ওঠে	–	হঠাৎ জেগে ওঠে। সচল হয়।
বহির্মুখী উন্মত্ততা	–	কাজের সন্ধানে বাইরে যাওয়ার ব্যাকুলতা।
জানপছানের লোক	–	আত্মীয়স্বজন। প্রিয়জন।
দেহচ্যুত হয়ে	–	ইঞ্জিন যখন ট্রেনের বগি থেকে পৃথক হয়।
সরভাঙা পাড়	–	প্রবল স্রোতে ভেঙে যাওয়া নদীর পাড়।
শস্যের চেয়ে টুপি বেশি	–	ঔপন্যাসিক যে এলাকার বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে প্রচণ্ড অভাবের পাশাপাশি মানুষগুলো ধর্মভীরু। খাদ্য না থাকলেও মানুষের মধ্যে ধর্মচর্চার কার্পণ্য নেই –এটাই বোঝানো হয়েছে।
হেফজ	–	মুখস্থ। কণ্ঠস্থ।
সরগলা কেরাত	–	চিকন সুরে কোরান পাঠ।
ফিকে দাড়ি	–	পাতলা বা হালকা দাড়ি।
কিতাবে যে বিদ্যে ... লোক আবার নেই	–	পূর্বের লিখিত বিষয় পুস্তকে যেন স্থির ও স্থবির হয়ে আছে। তাকে গতিশীল এবং আধুনিক ও যুগোপযোগী করার মতো কেউ নেই।
খোদার এলেমে বুক... পেট শূন্য বলে	–	ধর্মীয় বিদ্যা এবং ধর্মচর্চা দ্বারা ক্ষুধার্ত মানুষের চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়।
বাহে মুলুকে	–	উত্তরবঙ্গ এলাকায়।
নিরাক পড়া	–	বাতাসহীন নিস্তব্ধ গুমোট আবহাওয়া। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেল – টানিয়ে রাখা চটে কাঁচি চালানোর সাথে সাথে যেমন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একেবারে চিরে যায় তেমন অবস্থা বোঝাতে উপমাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

গলুই – নৌকার সামনের বা পেছনের শক্ত ও সরু অংশ।

চোখে ধারালো দৃষ্টি – চোখের সূক্ষ্ম, কৌতূহলী ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। পানি নিচের মাছের অবস্থান অনুমান করার মতো দৃষ্টি।

ধানের ফাঁকে ফাঁকে ... এঁকেবেঁকে চলে – পানিতে নিমজ্জিত ধানক্ষেতে নৌকার এক প্রান্তে চালক খুব সাবধানী। নৌকা চালানোর সময় যেন কোনোভাবে ঢেউ বা শব্দ তৈরি না হয়। তেমনি অপর প্রান্তে জুতি-কোঁচ হাতে দাঁড়িয়ে শিকারি। তার দৃষ্টিকে সাপের এঁকেবেঁকে ছুটে চলার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক উদ্ধৃত উপমাটি প্রয়োগ করেছেন।

চোখে তার তেমনি শিকারির সূচাগ্র একাগ্রতা – তাহের-কাদের মাছ ধরছে। কাদের সন্তর্পণে নৌকা চালাচ্ছে। তাহের নৌকার সম্মুখভাগেÑতার দৃষ্টি যেন সূচের অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন। যেখানেই মাছ থাকুক না কেন–দৃষ্টির সূক্ষ্মতায় তা চোখে ধরা পড়বেই।

দাঁড় বাইছে, ...পানি নয়, তুলো – কাদের পেছনে বসে নৌকা চালাচ্ছে। সামনে তাহের। তার ইশারা মতো এতটা সাবধান, সতর্ক ও নিঃশব্দে নৌকা চালাচ্ছে সে। লেখক এখানে পানিকে তুলোর সাথে তুলনা করেছেন। পানিতে বা নৌকায় শব্দ হলে মাছ পালিয়ে যাবে। এ কারণে শিকারিদের অবস্থান এবং বিচরণ নিঃশব্দে এবং সন্তর্পণে হওয়াই উচিত। তাহের কাদেরের নৌকা যেন পানিতে নয়–তুলার উপর দিয়ে চলছে।

ক-টা শিষ নড়ছে – খাদ্য গ্রহণের জন্য মাছ ধানগাছের পানির মধ্যকার অংশের গায়ে জমে থাকা শেওলায় ঠোকর দেয়। আবার কখনো বা পানির উপরকার শেওলা বা পানায় ঠোকর দিতে থাকে। ধানগাছের ডগা, শেওলা বা পানা নড়তে থাকলে শিকারি মাছের অবস্থান বুঝতে পারে।

আলগোছে – খুব সাবধানে, আলতোভাবে।

কোঁচ – মাছ ধরার জন্য নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র। মাথায় তীক্ষ্ণ শলাকাগুচ্ছ যুক্তবর্শা বিশেষ।

নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা মুহূর্ত – দম বন্ধ হওয়া সময় চরম উত্তেজনাকর মুহূর্ত।

লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে ... সা-ঝাক্ – ধানক্ষেতে পানির মধ্যে মাছের অবস্থান দেখে তাহেরের পরবর্তী বিভিন্ন অ্যাকশানের বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। বিলের ভিতর অন্য নৌকার শিকারিরা দেখছে– তাহের কীভাবে নিঃশব্দে ডান হাতে কোঁচ তুলে বাম হাতের আঙুল দিয়ে ইশারা করে নৌকার

অবস্থান, সামনে-পেছনে-ডাইনে-বায়ে নির্দেশ করছে। অবশেষে শরীরটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে অতি দ্রুত এবং জোরালোভাবে, সা-ঝাক্ শব্দে কোঁচ নিক্ষেপ করেছে।

চোখ নিমীলিত – চোখ বোজা। মোনাজাত বা প্রার্থনার সময় একাগ্রতার জন্য চোখ বন্ধ রাখা হয়।

কোটরাগত নিমীলিত সে চোখে একটুও কম্পন নেই – দেবে যাওয়া বন্ধ চোখ দুটির মধ্যে কোনো দ্বিধা, ভয় বা কম্পন নেই। নেই মিথ্যে বলার অপরাধবোধ। মানসিকভাবে সে খুব সাহসী।

এভাবেই মজিদের প্রবেশ ... নাটকেরই পক্ষপাতী – চেনা নেই, জানা নেই; একটা গ্রামে হঠাৎ করে ঢুকে একটি অসাধারণ অভিনয়ে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষকে আকৃষ্ট করে ফেলে আগন্তুক মজিদ। অপরিচিত মানুষ দেখে ছেলে বৃদ্ধ সবাই কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আর এই কৌতূহলকে কাজে লাগায় মজিদ। তার আদব-কায়দা অভিনয়, গ্রামের সাধারণ মানুষের আগ্রহ সবকিছুকে কিছুটা ব্যাঙ্গাত্মকভাবেই উপস্থাপন করেছেন লেখক।

নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন – শীর্ণকায় মজিদের দেবে যাওয়া চোখে আগুন। অসাধারণ অভিনয়। সে যখন বুঝে ফেলে গ্রামের মানুষগুলো মুর্খ কিন্তু কৌতূহলী – তখনই সে যে বিশাল মিথ্যাটিকে প্রতিষ্ঠিত করবে তার পূর্ব মুহূর্তের অভিনয়টি সে করে নেয়। তার চোখেমুখে ক্রোধের আগুন সবার অন্তরে ছড়িয়ে দিয়ে এক ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে।

জাহেল – অজ্ঞ। মূর্খ। নির্বোধ।

বেএলেম – বিদ্যাহীন। লেখাপড়া জানে না এমন লোক।

আনপাড়হ্ – যাদের পড়াশোনা জ্ঞান নেই এমন লোক।

বেচাইন – অস্থির। উতলা।

চড়াই-উতরাই ভাব – অস্থিরতাজনিত শুষ্কতা, ক্লান্তির ভাব।

চিকনাই – উজ্জ্বল। লাবণ্যময় চেহারা।

এখানে ধানক্ষেতে ... আকাশে ভাসে না – যে স্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানকার মানুষ জমি-জমায় আবাদ করে– ফসল ফলিয়ে ভালোই আছে কিন্তু তাদের অন্তরে খোদার প্রতি আগ্রহ বা অনুরাগের অভাব আছে।

দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে ... সে খেলা সাংঘাতিক – বস্তুত মজিদ অভাবগ্রস্ত এলাকার অধিবাসী। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এলাকা ছেড়েছে সে। মহব্বতনগরে এসে সেখানকার মানুষকে

		বোকা বানিয়ে যে মিথ্যে মাজার ব্যবসার পথে অগ্রসর হয়েছে লেখক তাকে সাংঘাতিক বা ভয়ংকর 'খেলার' সাথে তুলনা করেছেন। যদি কখনো এই মিথ্যার রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায় তখন সামাল দেওয়া মজিদের পক্ষে কতটা সম্ভব সে কথা ভেবেই লেখক এ মন্তব্য করেছেন।
জমায়েতের অধোবদন চেহারা	–	মজিদ যখন মিথ্যা মোদাচ্ছের পিরের মাজারের কথা বলে উপস্থিত গ্রামবাসীকে গালাগালি করছিল তখন তাদের ভেতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। সত্যিই তারা পিরের মাজারকে এরকম অযত্ন অবহেলায় ফেলে রেখেছে? এ কারণে তাদের অপরাধী মুখ নিচু হয়ে আছে– চেহারায় প্রকাশ পেয়েছে লজ্জা মিশ্রিত অপরাধবোধ।
সালু	–	এক রকম লাল সুতি কাপড়।
মাছের পিঠের মতো	–	এটি একটি উপমা। মাছের পিঠের মাঝখানটা যেমন উঁচু, মাজারের মাঝখানটাও তেমনি উঁচু।
বতোর দিনে	–	জমিতে বীজ বপন বা ফসল বোনার এবং ফসল কাটার উপযুক্ত সময়।
মগরা মগরা ধান	–	প্রচুর ধান। গোলা বা মোড়া ভর্তি ধান।
হাড় বের করা দিনের কথা	–	প্রচণ্ড অভাবের দিনের কথা। না খেতে পেয়ে অপুষ্টি অনাহারে ক্লিষ্ট মানুষের বুকের পাঁজরের হাড় জেগে ওঠে। এ রকম অবস্থার কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে।
বেওয়া	–	বিধবা।
রা নেই	–	কথা বা আওয়াজ নেই।
মাটি-এ গোস্বা করে	–	মাটি রাগ করে।
কবরে আজাব হইব	–	কবরে শাস্তি হবে।
বেগানা	–	অনাত্মীয়।
গলা সীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে রহিমার সারা দেহে	–	সীসা একটি কঠিন ধাতব পদার্থ। আগুনে পোড়ালে তা গলে যায় এবং যে পাত্রে রাখা যায় তাতে ছড়িয়ে পড়ে সমান্তরালভাবে। মজিদের উপদেশ বাণী শোনার পর লজ্জা রহিমার সমস্ত শরীরে ওই রূপ ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি উপমা।
গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ	–	রহিমা মজিদের স্ত্রী। তার অনুগত ও বাধ্য। মজিদের ভয়ে সে ভীতও। মজিদের চোখের ভাষা বোঝে সে। তাছাড়া সে ধর্মভীরু। গ্রামের মানুষগুলোও তারই মতো একই রকম ধর্মভীরু ও মজিদের প্রতি অনুগত।

আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝাণ্ডা
উঁচিয়ে রাখবার – জমির মালিকানা সংক্রান্ত ধারণা। গ্রামে যে যত বেশি জমির মালিক, সে তত বেশি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। এই মালিকানার মর্যাদাকে লেখক ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে যে বৈষয়িক অহমিকা তাকে লেখক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভুয়ো বা আমার বলে অভিহিত করেছেন।

মাটির এলো খাবড়া দলাগুলো – মাটির ঢেলা, কোদাল দিয়ে কোপানো বা লাঙল দিয়ে চাষ করার পর মাটির যে ছোট ছোট খন্ড তৈরি হয়।

সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের
একতাল অর্থহীন মাংসের
মতো জমি – জমি নিয়ে মানুষে মানুষে বিবাদ হয়, হানাহানি, ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি এমন কি রক্তারক্তিও হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো সৈনিকের অর্থহীন খন্ডিত দেহের মাংসপিণ্ডের সঙ্গে জমি নিয়ে এই বিবাদ বিসংবাদের অথহীনতাকে তুলনা করা হয়েছে। এটি একটি উপমা।

রুঠাজমি – অনুর্বর ভূমি নিষ্ফলা জমি।

শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায়
নীল হয়ে জ্বলেপুড়ে মরে – মেঘ বৃষ্টিবিহীন নীল আকাশকে কেমন উন্মুক্ত – ন্যাংটো মনে হয়। রোদের তাপদাহে মাঠ-প্রান্তরের মাটি ফেটে চৌচির। বৃষ্টি আর মেঘ শূন্যতায় আকাশকেই মনে হয় শূন্য। তার নীলের ভেতর মৃত্যু যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নেই যেন।

নধর নধর – কমনীয়, সরস ও নবীন।

কোঁদে কোঁদে পানি তোলে – বিশেষ এক ধরনের পাত্রে এবং গ্রাম্য পদ্ধতিতে জমিতে সেচ দেওয়া।

মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও
অন্তর খাঁ খাঁ করে – কৃষক শ্রম দিয়ে মেধা-মনন দিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে মাঠে ফসল ফলায়। ফসল ফলানোর এক পর্যায়ে মাঠে পানি দিতে হয়। পানির অভাবে চারাগাছ শুকিয়ে যায়– হলুদ হয়ে মারা যায়, মাটি শুষ্ক হয়ে মাঠ ফেটে যায়। এ অবস্থা দেখে কৃষকের বুক ফেটে যায় অজানা শঙ্কায়।

দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে – অমাবস্যার দুইদিন পরের চাঁদ– দ্বিতীয়ার চাঁদ। নতুন ওঠা এই চাঁদের আকৃতি বাঁকা কাস্তের মতো। যে কাস্তে হাতে কৃষক মাঠের ধান কাটে আর মনের আনন্দে গান ধরে।

তাগড়া – বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া।

গাঁট্টাগোট্টা – খর্ব ও স্থূল অথচ বলিষ্ঠ দৃঢ় অস্থি গ্রন্থিযুক্ত; আঁটসাঁট দেহবিশিষ্ট।

শ্যেন দৃষ্টি – বাজপাখি বা শিকারি পাখির মতো দৃষ্টি।

ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে

... অবজ্ঞা করে যেন – মহব্বতনগরের মানুষের অকৃত্রিম হাসি, অনাবিল আনন্দ মজিদকে করে তোলে ভীতসন্ত্রস্ত। গ্রামের মানুষ যদি ফসলের মাধ্যমে সচ্ছলতা অর্জন করে ফেলে তাহলে তাদের মনে খোদার প্রতি আনুগত্য কমে যাবে – কমে যাবে মজিদের প্রতি নির্ভরশীলতা। মজিদ তো চায় গ্রামের মানুষ অভাব অনটনে থাকুক, ঝগড়া-বিবাদ, হানাহানি-রাহাজানিসহ বিভিন্ন ফ্যাসাদে জড়িয়ে থেকে মজিদের শরণাপন্ন হয়। মজিদ তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে তাদের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবে। কিন্তু তারা নির্ভেজাল জীবন যাপন করলে মজিদ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে এই মনোভাবই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

রিজিক দেনেওয়ালা – জীবনোপকরণ বা অন্ন-বস্ত্র দাতা, খাদ্য যোগানদার।

বুত পূজারী – যারা মূর্তি পূজা করে।

নছিহত – উপদেশ। পরামর্শ।

খতম পড়াবার – অনাবৃষ্টি বা অন্য কোনো বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা পবিত্র কোরান-শরিফ পড়ানোর ব্যবস্থা করে। কোরান শরিফের ৩০ পারা পড়ে শেষ করাকে কোরান খতম বলে। এর মাধ্যমে মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন হবে বলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মনে করেন।

কলমা – কলেমা। ইসলাম ধর্মে পাঁচটি কলেমা আছে। এর প্রথমটি কলেমা তাইয়েব-“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ্” অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই; মুহম্মদ (সা) আল্লাহর রসুল– অর্থাৎ মুহম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

মুরুক্ষু – মুর্খ। বোকা।

আমসিপারা – আরবি বর্ণমালার উচ্চারণসহ সুরা সংকলন। পবিত্র কোরান শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ।

মক্তব – মুসলমান বালক-বালিকাদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিক্ষালয়।

জুম্মাবার – শুক্রবার দিন জোহরের সময়ে মুসলমানদের জামাতে অংশগ্রহণ করে আদায়কৃত নামাজ।

রা নেই – রব। সাড়া। শব্দ। ধ্বনি। মুখের কথা নেই।

তারস্বর – অতি উচ্চ শব্দের চিৎকার।

ধামড়া – বয়স্ক। পাকা।

মারুফ – মহান পুরুষ। মহাপুরুষ।

রুহ – আত্মা। অন্তরাত্মা।

মহা তমিস্রা – গভীর অন্ধকার। ঘোর অমানিশা।

রহমত – করুণা। দয়া। কৃপা। অনুগ্রহ।

মওত – মৃত্যু। মরণ।

ঢেঙা	–	লম্বা। পাতলা শরীর।
শয়তানের খাম্বা	–	খাম্বা অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভ। এখানে হাসুনির মার বাপ তথা তাহের কাদেরের বাপকে মজিদের দৃষ্টিতে শয়তানের খুঁটি বলা হয়েছে। তাহেরের বাপ বুড়ো, তার সঙ্গে স্ত্রীর সর্বদা ঝগড়া লেগে থাকে। এ দিকে বুড়োর মেয়ে হাসুনির মা মজিদের কাছে এসে বাপের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। তাহেরের বাপ কিছুটা বোকা ও একরোখা। এটি মজিদের মোটেই পছন্দ নয়। মজিদ ভাবে এই বুড়োই শয়তানের খাম্বা।
বাজখাঁই গলায়	–	গম্ভীর ও কর্কশ স্বরে।
ব্যাক্কই	–	বেবাক। সবাই। সকলেই।
ঝুটমুট	–	মিথ্যা। বানানো কথা।
ঢোল-সোহরত	–	কোনো বিষয় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করা, প্রচারের ব্যাপকতা অর্থে।
ছুরা ফাতেহা	–	পবিত্র কোরানের প্রথম সুরা।
নেকবন্দ	–	পুণ্যবান। মহাপুরুষ।
ঋজুভঙ্গিতে	–	সোজাসুজিভাবে।
রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে	–	জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে।
ছুরায়ে আল-নূর	–	পবিত্র কোরান-শরিফের একটি সুরা– যেখানে মানব জাতিকে আলোর পথ দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি মূলত নারীদের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে।
কেরাত	–	পবিত্র কোরান-শরিফের বিশুদ্ধ পাঠ।
চোখ নাবায়	–	চোখ নত করে। মাথা নত করে নিচের দিকে তাকায়।
হলফ	–	সত্য কথা বলার জন্য যে শপথ করা হয়। শপথ। প্রতিজ্ঞা।
রদ্দি	–	পচা। বাসি।
রুদ্ধ নিঃশ্বাসের স্তব্ধতা	–	দম বন্ধ করা বা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো নীরবতা।
লেলিহান শিখা	–	দাউদাউ করা আগুনের শিখা।
ঢেঙা বদমেজাজি বৃদ্ধ লোকটি	–	লম্বা বা দীর্ঘদেহী উগ্র মেজাজি বা রগচটা বুড়ো মানুষটি। এখানে তাহের–কাদেরের বাপের কথা বলা হয়েছে।
আমসিপানা মুখ	–	শুকিয়ে যাওয়া মুখ।
তির্যক ভঙ্গিতে	–	বাঁকা। অসরল। কুটিলভাবে।
বাজপাখি	–	এক ধরনের শিকারি পাখি।
আথালি-পাথালি	–	এলোমেলো।
লোটা	–	ঘটি। পাত্র বিশেষ।
বালা	–	আপদ-বিপদ।
মগড়ার পর মগড়া	–	ধান সংরক্ষণের গোলার প্রাচুর্য বোঝাতে।
শোকর গুজার	–	কৃতজ্ঞতা। প্রশংসা। তৃপ্তি বা তুষ্টি প্রকাশ

তোয়াক্কল – ভরসা। নির্ভর।

নিতিবিতি করে – সংকোচে ইতস্তত করা।

পির – মুসলিম দীক্ষাগুরু। পুণ্যাত্মা।

মুরিদ – মুসলমান ভক্ত বা শিষ্য। সাধক।

খড়্গনাসা-গৌরবর্ণ চেহারা – ধারালো নাকবিশিষ্ট সুন্দর উজ্জ্বল চেহারা।

এস্তেমাল – ব্যবহার করা। আয়ত্ত করা।

রুহানি তাকত ও কাশফ – আত্মিক শক্তি উন্মোচন করা।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ – অমাবস্যার পূর্বে চাঁদ ছোট হতে হতে হঠাৎ যেমন মিলিয়ে যায়। এটি একটি উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাতরস স্ফীত পদযুগল – পির সাহেবের বাতরোগগ্রস্ত পায়ের কথা এখানে বলা হয়েছে।

কালো মাথার সমুদ্র – অনেক মানুষের মাথার চুল এক সঙ্গে একটি কালো সমুদ্রের মতো মনে হয়। এটি একটি উপমা।

বয়েত – কবিতাংশ; আরবি, ফারসি বা উর্দু কবিতার শ্লোক।

বেদাতি – ইসলাম ধর্মের প্রচলিত রীতির বাইরের কিছু।

তকলিফ – কষ্ট।

জঈফ – অতি বৃদ্ধ।

রেস্তায় – সম্পর্কে। আত্মীয়তায়।

সটকাইছে – পালিয়ে গেছে।

কেরায়া নায়ের মাঝি – ভাড়াখাটা নৌকার মাঝি।

রেহেল – কোরান শরিফ রাখার জন্য কাঠের কাঠামো।

তাছির – প্রভাব।

উচক্কা – অবাধ্য। ডানপিঠে। দুরন্ত।

বৃষ্টি পানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মতো – বৃষ্টির পানি পেয়ে জঙ্গল যেমন আরও ঘন হয়ে উঠে – তেমন।

শিরালি – শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যারা মন্ত্র বা দোয়া পড়ে।

বরগা – ছাদের ভর ধরে রাখার কাঠ বা লোহা।

হুড়কা – দরজার খিল।

বাজা মেয়ে – বন্ধ্যা নারী। যে নারীর সন্তান হয় না।

মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো – এটিও একটি উপমা। মাজারের পিঠের ওপর থেকে কাপড়টি সরে যাওয়ায় তাকে তাকিয়ে থাকা মরদেহের মতো মনে হয়।

বাইরে আকাশে শঙ্খচিল... ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্ত	–	এটি একটি রূপকার্থক বাক্য। শঙ্খচিল স্বাধীনভাবে আকাশে উড়ে, কাকও স্বাধীনভাবে ডাকাডাকি করে। এখানে বস্তুত জমিলার স্বাধীন সত্তার রূপকার্থক পরিচয় জ্ঞাপন করে।
দুলার বাপ	–	বরের বাবা। শ্বশুর।
ঠাটাপড়া	–	অকস্মাৎ বজ্রপাত হওয়া।
বালা	–	বিপদ।
রগড়ে	–	ডলে। ঘষে।
বর্তন	–	বড় থালা
এলেমদার	–	জ্ঞানী। বিদ্বান।
দিনাদির অধিকারী	–	আল্লাহ। স্রষ্টা।
খোদার ঢিল	–	শয়তানকে তাড়ানোর জন্য বৃষ্টিরূপী শিলা।
নফরমানি	–	অবাধ্য।
তোয়াক্কল	–	বিশ্বাস। আস্থা।
বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ	–	চোখের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা বোঝাতে উৎপ্রেক্ষা হিসেবে ব্যবহৃত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশটা কেমন ছিল?

ক. অবধারিত খ. নাটকীয়

গ. কাব্যিক ঘ. স্বাভাবিক

২. 'মাজারটি তার শক্তির মূল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. বিশ্বাস খ. আনুগত্য

গ. ভীতি ঘ. অনুরাগ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

কাজিপাড়া গ্রামের কামরুল কর্মসূত্রে ঢাকায় থাকেন। তিনি চিন্তা করলেন আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত মুসলমানের পরিত্রাণ নেই। এ তাড়না থেকেই তিনি গ্রামে একটি সাধারণ শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ নিলেন। তিনি গ্রামের মানুষদের বোঝালেন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারলে মুসলমানরা বর্তমান যুগে পিছিয়ে পড়বে। গ্রামের লোকেরা তাকে আর্থিক সহযোগিতা করতে সম্মত হলো। এ ক্ষেত্রে বাদ সাধল গ্রামের প্রভাবশালী ও রক্ষণশীল কতিপয় লোক। ফলে কামরুলের উদ্যোগ সফল হতে পারল না।

৩. উদ্দীপকের কামরুলের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়?

ক. তাহের খ. খালেক

গ. আক্কাস ঘ. ধলা মিয়া

৪. উক্ত চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে–

i. সংগ্রামী মনোভাব ও আস্থাশীলতা

ii. গ্রামের উন্নতি সাধনে আগ্রহ

iii. আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ইচ্ছা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ওয়াসিকা গ্রামের এক দুরন্ত মেয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে ছুটোছুটি করা, অবাধে সাঁতার কাটা তার আনন্দের কাজ। তার বাবা অভাবের তাড়নায় ওয়াসিকাকে পাশের গ্রামের এক বুড়ো লোকের সাথে বিয়ে দিলেন। লোকটি গ্রামের মাতব্বর। তাকে সবাই একাব্বর মুন্সি বলে ডাকে। মুন্সির কথা গ্রামের সবাই মানলেও চঞ্চল ও স্বাধীনচেতা ওয়াসিকা তার কথা মানে না।

ক. ধলা মিয়া কেমন ধরনের মানুষ ছিল?

খ. 'সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে সে মূর্তিবৎ বসে থাকে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. ওয়াসিকা 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের একাব্বর মুন্সি 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের সামগ্রিক দিক ধারণ করেনি– মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

নাটক

সিরাজউদ্দৌলা

সিকান্‌দার আবু জাফর

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণির উপযোগী সংস্করণ

নাট্যকার-পরিচিতি

সিকান্দার আবু জাফর ১৯১৮ সালে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মূলত একজন কবি হলেও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি বরাবরই অগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সমকাল' হয়ে উঠেছিল তরুণ সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র; পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের এক বলিষ্ঠ প্লাটফর্ম। পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ ব্যক্ত করায় এই পত্রিকাটি একাধিকবার নিষিদ্ধ ও এর প্রকাশিত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

সিকান্দার আবু জাফরের শিক্ষাজীবন শুরু হয় তৎকালীন খুলনার (বর্তমানে সাতক্ষীরা) তালা বিডি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করে তিনি কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে (পূর্বনাম রিপন কলেজ) অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হবার পর ১৯৪১ সাল থেকে বিভিন্ন ধরনের মননশীল পেশায় তিনি যুক্ত হন। দেশভাগের পর তিনি পূর্ব বাংলায় চলে আসেন এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানের স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন মুখ্যত একজন সাংবাদিক। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে 'সাপ্তাহিক অভিযান' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালন করেন তিনি।

'আমাদের সংগ্রাম চলবেই', 'বাংলা ছাড়ো' প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার স্রষ্টা সিকান্দার আবু জাফর নাট্যকার হিসেবেও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। 'সিরাজউদ্দৌলা' ছাড়াও তাঁর আরও যেসব বিখ্যাত নাটক রয়েছে তাদের মধ্যে 'মাকড়সা' (১৯৬০), 'শকুন্ত উপাখ্যান' (১৯৬২) এবং 'মহাকবি আলাওল' (১৯৬৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাট্যচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৬ সালে তাঁকে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। কবিতা ও নাটকের পাশাপাশি উপন্যাস, অনুবাদসহ বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে তিনি সবিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

১৯৭৫ সালের ৫ই আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

নাটকের সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য

সাহিত্য রচনার একটি বিশেষ রূপশ্রেণি (genre) হলো নাটক। প্রাচ্য নাট্যশাস্ত্রে একে দৃশ্যকাব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। গ্রিক ভাষা থেকে আগত 'ড্রামা' শব্দটির অর্থ হলো 'অ্যাকশন' তথা কিছু করে দেখানো। বাংলা 'নাটক', 'নাট্য', 'নট', 'নটী' প্রভৃতি শব্দও উদ্ভূত হয়েছে 'নট্' ধাতু থেকে– যার অর্থ 'নড়া-চড়া করা'। অর্থাৎ, নাটকের মধ্যে এক ধরনের গতিশীলতা রয়েছে যা একটি ত্রিমাত্রিক শিল্পকাঠামো গড়ে তোলে। বলে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান সময়ে নাটক পরিবেশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম টেলিভিশন হলেও মঞ্চই নাটকের প্রকৃত ও যথার্থ পরিবেশনা-স্থল। তাই নাটক বিষয়ক এই আলোচনায় মঞ্চনির্ভর নাট্য-বৈশিষ্ট্যই কেবল বিবেচনা করা হবে। প্রকৃতপক্ষে নাটকের মধ্যে একটি সামষ্টিক শিল্প-প্রয়াস সম্পৃক্ত থাকে। এতে কুশীলবগণ দর্শকদের উপস্থিতিতে মঞ্চে উপনীত হয়ে গতিময় মানব-জীবনের কোনো এক বা একাধিক বিশেষ ঘটনার প্রতিচ্ছবি অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। সাধারণভাবে, নাটকে যে চারটি বিষয়কে বিবেচনায় নেওয়া হয় তা হলো : কাহিনি বা প্লট (plot), চরিত্র, সংলাপ ও পরিপ্রেক্ষিত। একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটকে ঘিরে শিল্প-ঘন কাহিনি কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং সহায়ক বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপকে আশ্রয় করে উপস্থাপিত হবার প্রয়াস পায় নাটকে। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নৃত্য-গীত, আবহ সংগীত, শব্দ সংযোজন, আলোক সম্পাত, মঞ্চ-কৌশল প্রভৃতি। তবে, এটি নাটক সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা মাত্র। দু-হাজার বছরেরও বেশি বয়সী এই শিল্প মাধ্যমে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। অ্যারিস্টটল কিংবা শেকসপিয়রের কালে সময়ের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য নিশ্চিত করা ছিল নাটক রচনার পূর্বশর্ত; কীভাবে কাহিনিমুখ (exposition), কাহিনির ক্রমব্যাপ্তি (rising action), চূড়াস্পর্শী নাট্যদ্বন্দ্ব (climax), গ্রন্থিমোচন (falling action) এবং যবনিকাপাত (conclusion)-এর মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে নাটক শুরু থেকে সমাপ্তির পথে এগিয়ে যাবে– তা-ও ছিল বিশেষভাবে কাঠামোবদ্ধ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানুষের জীবন পাল্টেছে। নাটক যেহেতু জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি সেহেতু এই রূপশ্রেণির মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেও এতে নানাবিধ পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক কালে অনেক নাটকেই কোনো বৃত্ত থাকে না, কেবল একটি চরিত্র নিয়েও রচিত হয়েছে অসংখ্য সফল নাটক; এমনকি সংলাপ ছাড়াও নাট্য-নির্মাণ অসম্ভব নয়। তবে উল্লিখিত কাঠামোবদ্ধ বৈশিষ্ট্যগুলো একজন নাট্যকারের পক্ষে যথার্থভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হলেই কেবল নাটকের সংগঠনে বিচিত্র মাত্রা যোজনা করা সম্ভব।

নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যমাধ্যমের পার্থক্য কী– তা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলোচনা হয়ে আসছে। মহাকাব্য ও নাটকের পার্থক্য নিয়ে গ্রিক সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ আলোচনা করে গেছেন। নাটকের সঙ্গে যে সাহিত্য-মাধ্যমের সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড় সেই উপন্যাস থেকে নাটক কীভাবে স্বতন্ত্র– সেই বিষয়েও নানা মনীষী আলোকপাত করেছেন। তবে, উপন্যাস ও নাটকের পার্থক্য এক সময় যত প্রকটই থাকুক, উপন্যাস-রীতির পরিবর্তন সাধনে যে অসামান্যতা এসেছে তাতে বর্তমান কালে নাটক ও উপন্যাস একে অপরকে নানাভাবে পরিপূরণ করছে। প্রসঙ্গত নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয় :

১. কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ এবং গতি নাটক ও উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য;

২. মানব মনস্তত্ত্ব, প্রেম, মহত্ত্ব, দ্বেষ, ঈর্ষা, লোভ ও অন্যান্য মৌলিক প্রবৃত্তিসমূহের দ্বন্দ্বজটিল উপস্থাপন উভয় শিল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়;

৩. এই দুই শিল্পমাধ্যমেই মিলনান্ত কিংবা বিয়োগান্ত কিংবা উভয়ের সমন্বিত পরিণাম দেখতে পাওয়া যায়;

৪. উভয় সাহিত্য রূপশ্রেণিই কেবল পাঠের (অধ্যয়ন করে) মধ্য দিয়েও সিদ্ধ উদ্দেশ্যের চরিতার্থতা দান করতে পারে;

এ সকল বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে, নাটক একটি বিশেষ শিল্পরীতি যা উপস্থাপনা, ক্রিয়া ও সংলাপের ভিত্তিতে উপন্যাস থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পৃথক। বলা যেতে পারে নাটক সাহিত্য হয়েও এর চেয়ে আরও বেশিকিছু। এর সঙ্গে দর্শকের রুচি-চাহিদা, রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থাপনা ও অভিনয়-কৌশল অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। প্রথাগতভাবে, নাটকে ঘটনা সন্নিবেশকল্পে একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করা হয়। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ঘটনার বিকাশ থেকে পরিণতি ধাপে ধাপে সংঘটিত হতে থাকে। বলা প্রয়োজন যে, নাটকের শুরুতেই একটি দ্বন্দ্বের আভাস দেওয়া থাকে, যা মূলত নাটকটিকে পরিণতিমুখী করে তুলবার বীজশক্তিকে ধারণ করে। নাটক যত এগিয়ে যায় সেই দ্বন্দ্বও ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত রূপ লাভ করে একটি উত্তুঙ্গ অবস্থানে পৌঁছায়। আসলে নাটকের এই দ্বন্দ্ব নিজ গতিপথের দিক থেকে বিপরীতমুখী প্রবণতায় প্রতিভাত সত্যগুলিকেই রূপ দিতে সাহায্য করে। তাই বলা যায় যে, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি এবং তার শিল্পসফল পরিসমাপ্তি নাটকের বিশেষ লক্ষণ।

নাটকের শ্রেণিবিভাগের বিষয়টি বিবেচনা করলে একে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভাজন সম্ভব। তবে, মুখ্যত নাটককে ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা, ট্রাজিকমেডি এবং প্রহসন– এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে ট্র্যাজেডিকেই সর্বোচ্চ আসন প্রদান করা হয়েছে; এমনকি কখনও কখনও নাটক বলতে ট্র্যাজেডিকেই বোঝানো হয়েছে। প্রথমেই ট্র্যাজেডি বিষয়ে সাধারণ ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন।

ট্র্যাজেডি : দেবদেবীর উদ্দেশে ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি বলি দেওয়া উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অভিনয় থেকে 'ট্র্যাজেডি'র জন্ম হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে ট্র্যাজেডি নাটকের মূলে রয়েছে ব্যক্তি-আত্মার দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ তীব্র যন্ত্রণা আর হাহাকার। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ প্রদান করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল যা বলেছেন, তা আজও সাহিত্য সমালোচনায় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এস. এইচ. বুচার অনূদিত অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' (৩৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) গ্রন্থে বলছেন :

> Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.

নায়ক কিংবা নায়িকামুখ্য করুণ রস পরিবেশন ট্র্যাজেডির ধর্ম। এখানে রসই প্রধান। ট্র্যাজেডির ধর্ম হলো কোনো জটিল ও গুরুতর ঘটনার আশ্রয়ে বিশেষ ধরনের রসসঞ্চার যা আমাদের অনুভূতিকে অভূতপূর্ব আবহে আলোড়িত করবে। এটি জৈব-ঐক্যবিশিষ্ট হবে অর্থাৎ, এর একটি একক অটুট আকার থাকবে। সেইসঙ্গে, এর ভাষা হবে সাংগীতিক গুণসম্পন্ন। দ্বন্দ্বপূর্ণ কাহিনির এতে বিশেষ ভূমিকা থাকলেও গঠনগত দিক থেকে এতে নাট্যিক বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। সর্বোপরি তা একদিকে দর্শকের মনে করুণা ও ভয়ের সঞ্চার করবে; আবার অপরদিকে এক ধরনের প্রশান্তিও জাগাবে। কেননা, নাটকে শত-বিপর্যয় সত্ত্বেও নায়কের যে সুদৃঢ় মহিমান্বিত অবস্থান রূপায়িত হবে তা দর্শককে বিস্ময়ঘন আনন্দ প্রদান করবে; একইসঙ্গে যে বিপর্যয় দর্শক দেখবেন তা তাঁকে এই বলে স্বস্তি দেবে যে, অন্তত দর্শকের নিজের জীবনে তা ঘটেনি। এতে দর্শকের ভাবাবেগের মোক্ষম বা বিশেষ প্রবৃত্তির পরিশোধন ঘটাবে।

প্রাচীন গ্রিক ট্র্যাজেডিতে 'নিয়তির' বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। মানুষ দৈবের কাছে কতটা অসহায়, দৈবের দুর্বিপাকে মানুষ কীভাবে চরম হতভাগ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয় এবং বেঁচে থেকে মৃত্যুময় যন্ত্রণা ভোগ করে – তা-ই নানা বৈচিত্র্যে গ্রিক ট্র্যাজেডিতে শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই নিয়তি অতীতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোনো মানুষের দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাকে গ্রাস করে। যাকে গ্রিক ট্র্যাজেডিতে বলা হয়েছে নেমেসিস। অর্থাৎ, মানুষ কোনোভাবেই নেমেসিসকে এড়াতে পারে না – এই বিশ্বাস গ্রিক ট্র্যাজেডির মর্মবাণী। সাধারণভাবে, হত্যা, মৃত্যু, ভাগ্য বিপর্যয়, ভ্রান্তি এইসব উপাদানেই প্রাচীন ট্র্যাজেডি সার্থকতা লাভ করেছে। তবে, এতে মানুষের সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অস্বীকৃত। এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে ইংরেজ নাট্যকার শেকসপিয়ার ট্র্যাজেডির এক ভিন্ন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজ পর্যন্ত এই আদর্শই বহুবিচিত্র নাট্যিক কাঠামোকে আশ্রয় করে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শেকসপিয়রের নায়ক-নায়িকা প্রায়শই নিজেদের কৃতকর্মে বিবেচনাগত ভুল বা error of judgement-এর জন্ম দেয়। আর পরিণতিতে তা-ই তাদেরকে চরম মৃত্যুযন্ত্রণায় নিপতিত করে। অর্থাৎ, দৈব নয়, মানুষের দুর্ভাগ্যময় পরিণতির কারণ মানুষ নিজেই – এই চিরায়ত সত্য দর্শক শেকসপিয়রীয় ট্র্যাজেডির মাধ্যমে বারবার উপলব্ধি করে। তবে যে ধরনের ট্র্যাজেডিই হোক না কেন, নায়ক কিংবা নায়িকার দুর্ভোগ বা sufferings সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর এর মধ্য দিয়েই ট্র্যাজেডি ভয়াবহতা-মিশ্রিত করুণরস সৃষ্টি করে। সফোক্লিস রচিত 'আন্তেগোনে', 'অদিপাউস', 'ইসকাইলাসের আগামেমনন', শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ট্র্যাজেডি নাটক।

কমেডি : অন্যান্য নাট্যশ্রেণির মধ্যে কমেডির পরিসমাপ্তি আনন্দে বা মিলনে। জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গকে আশ্রয় করে রসসৃষ্টি এবং আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী সংলাপকুশলতার মধ্য দিয়েই এর সার্থকতা। সাধারণভাবে, জীবনের সহজ ও হাস্যরসপূর্ণ দিকটির রূপায়ণই কমেডির মূল প্রতিপাদ্য বলে বিবেচিত হয়। ট্র্যাজেডিতে যেমন নায়ক বা কোনো চরিত্রের হৃদয়-গভীরে গিয়ে তার মনোজগত, উপলব্ধির জগতকে উন্মোচনের চেষ্টা করা হয় কিংবা নায়কের আত্মজিজ্ঞাসাকে দ্বান্দ্বিক মাত্রায় উপস্থাপন করা হয় সেরূপ কোনো কৌশল কমেডিতে গৃহীত হয় না। এর একেবারে যে ব্যতিক্রম ঘটে না তা নয় তবে তা কখনোই ট্র্যাজেডির মতো একক কোনো চরিত্রকে আশ্রয় করে পরিণতিপ্রাপ্ত হয় না। নাটকের দ্বন্দ্ব, জটিলতা এসবই সকল চরিত্রের সমবায়ে সংঘটিত হয়। আর এরই মধ্য দিয়ে নাটকে বুদ্ধি ও মননশীলতার তির্যক প্রকাশ ঘটে। শেকসপিয়রের 'টেমিং অব দ্য শ্রু', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'কমেডি অব এররস্' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কমেডি নাটক।

মেলোড্রামা : একে অতিনাটকও বলা চলে। মেলোড্রামায় আবেগের উৎকট প্রাধান্য থাকে। এটিও বিয়োগান্ত নাট্যশ্রেণি। তবে, এতে ট্র্যাজেডির মতো কোনো উত্তুঙ্গ নান্দনিকতা সঞ্চারিত হয় না। কখনও কখনও নাট্যিক দ্বন্দ্ব অস্পষ্ট রয়ে যায় কিন্তু আবেগের তীব্রতা দিয়ে এই শ্রেণির নাটক দর্শকের হৃদয়কে আন্দোলিত করতে চায়। প্রায়শই দুর্বল ট্র্যাজেডি নাটক মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয়।

ট্রাজিকমেডি : এতে ট্র্যাজেডির গুরুগম্ভীর পরিবেশকে খানিকটা লঘু করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হাস্যরস সম্পৃক্ত করা হয়। এর প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে খুব সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞার্থ কিংবা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে, ট্রাজিকমেডির ধারণাকে নাট্যলক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে অনেক নাট্যকার dramatic relief হিসেবে ট্র্যাজেডি নাটকে স্বল্প পরিসরে ব্যবহার করে থাকেন।

প্রহসন : মেলোড্রামা কিংবা ট্রাজিকমেডি থেকে প্রহসন বিভিন্ন মাপকাঠিতেই পৃথক। সমাজ বা ব্যক্তির দোষ-অসংগতি বিশেষভাবে দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রকার ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপমূলক নাটক রচিত হয়। এর বিষয় হিসেবে কোনো গভীর বা মৌলিক সমস্যাকে বেছে নেওয়া হয় না; কিংবা নিলেও তাকে সেই মাত্রার গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশন করা হয় না। ব্যষ্টি বা সমষ্টির ভ্রান্তি, অসংগতি ও দুর্বলতার চিত্রসমূহ প্রহসনের বিষয় ও মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়। নাটকের চরিত্রসমূহের হাস্যকর ক্রিয়া, নির্বুদ্ধিতা এবং কৌতুককর সংলাপ এই শ্রেণির রচনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বনাট্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটকের নাম স্মরণ করা যেতে পারে : ইসকাইলাসের 'প্রমিথিউস বাউন্ড', সফোক্লিসের 'দি কিং অদিপাউস', ভবভূতির 'স্বপ্ন বাসবদত্তা', কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম', শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট', গ্যেটের 'ফাউস্ট', ইবসেনের 'দি ডলস্ হাউজ', স্ট্রিন্ডবার্গের 'দি ড্রিম প্লে', জর্জ বার্নার্ড শ-র 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান', চেখভের 'দি চেরি অরচার্ড', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী', ম্যাক্সিম গোর্কির 'দি লোয়ার ডেপথ', ব্রেশ্‌ট-এর 'মাদার কারেজ' প্রভৃতি।

বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ

আধুনিক বাংলা নাটকের বিকাশে পাশ্চাত্য বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের ভূমিকা সবিশেষ। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে নবীন জীবনানুভব শিক্ষিত বাঙালিকে স্পর্শ করেছিল এবং যে নবজাগরণের সূচনা ঘটেছিল, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার অন্যতম প্রকাশ ওই সময়ের প্রহসন; যার যথার্থ পরিণতি – বাংলা নাটক। উনিশ শতকের এক দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ পরিবেশে বাংলা নাট্যমঞ্চের বিকাশের ধারাবাহিকতায় জন্ম নিল আধুনিক বাংলা নাটক। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয় ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে। হেরাসিম লেবেদেফ, তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সাহায্যে, 'ছদ্মবেশ' (The disguise) নামক ইংরেজি থেকে অনূদিত নাটকের পাশ্চাত্য ধাঁচের মঞ্চায়ন করেন। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু থিয়েটারে ও ১৮৩৫ সালে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর নিজ বাড়িতেও বিলিতি ধরনের রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। তবে ১৮৫৭ সালে জানুয়ারি মাসে অনুবাদ নাটকের পরিবর্তে নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রথম বাংলা নাটক হিসাবে অভিনীত হয়। এ পর্যায়ের নাটকের মধ্যে আরও উল্লেখ্য ১৮৫৭ সালে রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। বাংলা নাটকের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া বাগান বাড়িতে স্থাপিত নাট্যশালায়। ১৮৫৮ সালে 'রত্নাবলী' নাটক দেখতে এসে সদ্য মাদ্রাজফেরত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর মান দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তার ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্য তাঁর হাত থেকে পেয়ে যায় প্রথম সার্থক বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। মধুসূদনের মেধাস্পর্শে বাংলা নাটকের বিষয়, সংলাপ, আঙ্গিক, মঞ্চায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। নবজাগ্রত বাঙালির প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠা এই নাট্যধারা 'নব নাটক' হিসেবে সবিশেষ পরিচিত। মধুসূদন, দীনবন্ধু এই নব নাটককে করে তুললেন অনেক বেশি রুচিসম্মত ও নান্দনিক। এরই ধারাবাহিকতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে বাংলা নাটকের অঙ্গনে; বিকশিত হতে থাকে বাংলা নাট্যধারা। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব ও আঙ্গিকে নিরীক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলা নাটকে যোগ করেন বিশ্বমানের স্বাতন্ত্র্য। বিশ শতকের সাহিত্যে অমোঘ প্রভাব বিস্তারকারী দুই বিশ্বযুদ্ধ এসময়ের নাটককে নতুন চিন্তা ও আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। এরই সঙ্গে রুশ বিপ্লব, ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদের বিস্তার, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, দেশভাগ, শ্রেণিসংগ্রামচেতনা, শ্রেণিবিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বাংলা নাটকে সূচনা করে গণনাট্যের ধারা। বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত প্রমুখ নাট্যকার এই নতুন ধারার নাটক নিয়ে জনমানুষের কাছে পৌঁছাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এর কাছাকাছি সময়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের ওপর নেমে আসা শোষণ ও বৈষম্য, এই অঞ্চলের নাট্যকারদেরও গণনাট্যের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে তোলে। সেইসঙ্গে, পূর্ববাংলায় একের পর এক আন্দোলনের পটভূমি স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্যধারা সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে দেয়।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাংলা নাটকের নাম নিম্নরূপ : রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', মধুসুদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার-দর্পণ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার', উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' প্রভৃতি। বাংলা নাটকের এই সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বহন করে বাংলাদেশেরও একটি নিজস্ব নাট্যধারা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের কথা স্মরণ করা যেতে পারে; যেমন : নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'বহিপীর', মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি', আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র', সাইদ আহ্মদের 'মাইলস্টোন', 'কালবেলা', মমতাজ উদ্দীন আহমদের 'রাজা অনুস্বারের পালা', 'কি চাহ শঙ্খচিল', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরলদীনের সারাজীবন', জিয়া হায়দারের 'শুভ্র সুন্দর কল্যাণী আনন্দ', 'এলেবেলে', আবদুল্লাহ আল মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়', 'মেরাজ ফকিরের মা', মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী', 'গিনিপিগ', সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', এম এম সোলায়মানের 'তালপাতার সেপাই', 'ইংগিত' প্রভৃতি।

ইতিহাসভিত্তিক নাটক : প্রসঙ্গ 'সিরাজউদ্দৌলা'

ইতিহাসের সত্য এবং সাহিত্যের সত্য সবসময় অভিন্ন পথে না-ও চলতে পারে। তা সত্ত্বেও ইতিহাসকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির রীতি সুপ্রাচীন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা" প্রবন্ধে ইতিহাসের 'বহুতর ঘটনাপুঞ্জ' এবং বিবিধ অনুষঙ্গকে সাহিত্যে পরিহার করার পক্ষে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন যে, এতে সাহিত্য

নিজের 'কর্তৃত্ব' হারিয়ে ফেলে এবং ফলত সাহিত্যের যে শিল্পরস আহরণ তা ব্যাহত হয়। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের মত ছিল, ইতিহাসকে কেবল ঘটনাসূত্রের মধ্যে সীমিত রেখে তাকে রচয়িতার সৃষ্টিশীল কল্পনায় ডুবিয়ে শিল্পস্নাত করে তোলা। কেননা, ইতিহাসের পুনর্লিখন সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য নয়। তবে, রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকে এরূপ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই যে, ইতিহাসের প্রতি সাহিত্যিকের আনুগত্য প্রদর্শন অপ্রয়োজনীয়। মূল কথা এই যে, ইতিহাসের মূল সত্যের প্রতি আস্থা রেখেই সাহিত্যিক ইতিহাস-অবলম্বী সাহিত্য রচনা করবেন; তবে ইতিহাসকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণের কোনো দায় লেখকের থাকবে না।

বাংলা ইতিহাসভিত্তিক নাটক রচনায় উল্লিখিত এই আদর্শ সর্বদা অনুসৃত হয়েছে – এমন দাবি যৌক্তিক হবে না। তবে, ইতিহাসকে অবলম্বন করে নাটক রচনার প্রচেষ্টা যে শতাব্দী-প্রাচীন তা অনস্বীকার্য। এসব নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ইতিহাসের প্রসঙ্গ এসেছে তা রাজ-রাজড়ার ইতিহাস। কোনো সম্রাট কিংবা নবাব অথবা সেনাপতি তথা কোনো না কোনো সামন্ত বীর, এমনকি কখনও কখনও কোনো সামন্ত নারী এসব নাটকের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। অর্থাৎ, এই ধরনের নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সর্বদাই সামন্ত শ্রেণির প্রতিনিধি; যেখানে সামন্তপ্রভু তথা রাজার ইচ্ছাতেই প্রজার ইচ্ছা – কোনো প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনা এক্ষেত্রে মূল প্রেরণা নয়। আর সাধারণভাবে, কেন্দ্রীয় চরিত্রকে মহিমান্বিত করার অর্থ হলো প্রকারান্তরে সামন্ত ব্যবস্থাকেই অভিনন্দিত করা। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ যে সময় সামন্ত কাঠামো থেকে ক্রমশ বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, উপনিবেশ-শক্তির সঙ্গে লড়াই করে ক্রমশ একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে চলেছে তখন এই পেছনমুখী সামন্তপ্রীতি সমাজ-পরিবর্তনের গতিধারার সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে ওঠার আশঙ্কা জাগায়। আবার এ কথাও সত্য যে, দীর্ঘ ইংরেজ শাসনের ঘেরাটোপে থেকে নাট্যকাররা যখন কোনো উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির উপযোগী চরিত্রের সন্ধান করেছেন তখন তাঁদের সামনে এই সামন্ত বীরগণই আবির্ভূত হয়েছে। সমাজগতির বিপরীত স্রোতে না হেঁটেও উল্লিখিত এসব অনুষঙ্গ নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের মুখ্য নাট্যকাররা কখনও ইতিহাসকে প্রেক্ষাপট হিসেবে রেখে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন মানব-মনস্তত্ত্ব, প্রেম, জীবনোপলব্ধি প্রভৃতির দিকে, আবার কখনও অভীষ্ট সামন্ত নায়কের ইতিহাসসূত্রকে অক্ষুণ্ন রেখে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে একটি দেশাত্মবোধক কাঠামোতে ওই চরিত্রটিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন; এমনকি এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটানোও অসম্ভব নয়। প্রথম বর্ণিত কৌশলের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণ করা যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের কথা; দ্বিতীয় কৌশলের সবচেয়ে সমাদৃত দৃষ্টান্ত 'সিরাজউদ্দৌলা'। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব যতই সামন্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হন না কেন, বাংলা নাট্যকারদের সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞায় হয়ে উঠেছেন স্বাধীনতাকামী মানুষের চিরায়ত আইকন। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে, ঐতিহাসিক চরিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি নাটক লেখা হয়েছে। এসব নাটকের রচয়িতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শচীন সেনগুপ্ত এবং সিকান্দার আবু জাফর। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর রচিত নাটকের ভূমিকায় বলেন : 'বিদেশি ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষিত সুধী অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশি ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ওই সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী।' অপরদিকে, শচীন সেনগুপ্ত তাঁর 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন : 'ইতিহাস ঘটনাপঞ্জি। নাটক তা নয়। ঐতিহাসিক লোকের ঘটনাবহুল জীবনের মাত্র একটি ঘটনা অবলম্বন করেও একাধিক নাটক রচনা করা যায়। এই জন্য যে সংঘটিত ঘটনাটিই নাট্যকারের বিষয়বস্তু। রাজনৈতিক যে পরিস্থিতিতে সিরাজ বিব্রত ও বিপন্ন হয়েছিলেন, বহু দেশের বহু নরপতিকে সেইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেউ তা অতিক্রম করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, কেউ তা পারেননি। এইখানেই তাঁর স্বভাবের, তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা এসে পড়েছে। সেইখানেই রয়েছে নাটকের কাজ। আমি এই (সিরাজ) চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছি, সিরাজের মতো উদার স্বভাবের লোকের পক্ষে, তাঁর মতো তেজস্বী, নির্ভীক, সত্যাশ্রয়ী তরুণের পক্ষে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়। বয়স যদি তাঁর পরিণত হতো, কূটনীতিতে তিনি যদি পারদর্শী হতেন, তাহলে মানুষ হিসেবে ছোট হয়েও শাসক হিসেবে তিনি হয়ত বড় হতে পারতেন। সিরাজের অসহায়তা, সিরাজের পারদর্শিতা, সিরাজের অন্তরের দয়া-দাক্ষিণ্যই তাঁকে তাঁর জীবনের শোচনীয় পরিণতির পথে ঠেলে দিয়েছিল। তাঁর অক্ষমতাও নয়, অযোগ্যতাও নয়। অধিকাংশ বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এরকমই। সিরাজ ছিলেন খাঁটি বাঙালি। তাই তাঁর পরাজয়ে বাংলার পরাজয় হলো। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিও হলো পতিত।'

উল্লিখিত দুই নাট্যকার থেকে সিকান্দার আবু জাফরের নাট্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের নিজের অভিমতটি স্মরণীয় : 'নূতন মূল্যবোধের তাগিদে, ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে ঐতিহ্য ও প্রেরণার উৎস হিসেবে

সিরাজউদ্দৌলাকে আমি নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। একান্তভাবে প্রকৃত ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজউদ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম ও নৈতিক আদর্শে সিরাজউদ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদগুণগুলোকে চাপা দেওয়ার জন্য ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারীরা ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, এই নাটকে প্রধানত সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণগুলিকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।' প্রকৃতপক্ষে, সিকান্দার যে সময়ে নাটক লিখছেন সেসময়ে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে ক্রমশ সোচ্চার ও স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠছে। ফলে, তাঁর নাটকের সিরাজ জনমানুষের মুক্তির কণ্ঠস্বরকে ধারণ করে আছে। মোটাদাগে ইতিহাসের নির্দেশনা মেনে নিয়ে সিকান্দার আবু জাফর এই নাটকে সিরাজউদ্দৌলাকে দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী বাঙালির জাতীয় বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

নাট্যরূপ দান ছাড়াও সিরাজউদ্দৌলার এই মর্মান্তিক ঐতিহাসিক কাহিনি নিয়ে ষাটের দশকে ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এই চলচ্চিত্রে সিরাজউদ্দৌলা-চরিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত অভিনেতা আনোয়ার হোসেন বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এছাড়া এই ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে বাংলাদেশে অনেক যাত্রাপালা লিখিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে।

সিরাজউদ্দৌলা : নাটক বিশ্লেষণ

সিকান্দার আবু জাফর রচিত এই নাটকটি করুণরসাত্মক; এক অপরিসীম যন্ত্রাণাদগ্ধ পরিণতির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে রচনাটি। ট্র্যাজেডিসদৃশ বেদনাবহতা এই নাটকে বিদ্যমান। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সিরাজের ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা একইভাবে ট্র্যাজেডির শিল্পমানকে স্পর্শ করেছে। এক অনিবার্য ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপন লক্ষ্যে অবিচল থাকার মধ্য দিয়ে সিরাজকে নাট্যকার ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই এক অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আবার এ কথাও সত্য যে, সিরাজের মৃত্যু তাঁর যন্ত্রণাভোগেরও অবসান ঘটিয়েছে – যা ট্র্যাজেডির মেজাজ কিছুটা ক্ষুণ্ন করেছে। তবে বলে রাখা প্রয়োজন, নাটকটি রচনার সমসময়ে বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতিতে যে আন্দোলনের অভিঘাত লক্ষ করা যাচ্ছিল তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করেই সম্ভবত, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গ্রিক কিংবা শেকসপিয়রীয় ট্র্যাজেডির ব্যাকরণ মেনে কোনো নাটক রচনায় নাট্যকার উদ্বুদ্ধ হননি। কেননা, নাটকটির রচনাকাল মূলত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় নতুন করে বাঙালির জেগে ওঠার সময়। এক অনিঃশেষ আশাবাদে উজ্জীবিত হবার সময়। এই প্রেক্ষাপটে ব্যর্থতা কারুণ্য আসতেই পারে কিন্তু তা কোনোভাবেই অন্তহীন যন্ত্রণায় অবসিত হতে পারে না। অথচ ট্রাজেডি মানেই শেষ পর্যন্ত নায়কের সীমাহীন দুর্ভোগে নিপতিত হওয়া। নাটক যেহেতু সময় ও সমাজের প্রতিচ্ছবি সেহেতু সিকান্দার আবু জাফর সমকালকে সমীহ না করে পারেননি। যদি এর অন্যথা করতে চাইতেন তবে তা আরও অনেক বেশি শিল্পঝুঁকির মধ্যে পড়ত। নাট্যকার উপলব্ধি করেছিলেন যে, গ্রিক ট্র্যাজেডির নিয়তিবাদ একালে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। আবার নিরপরাধ বাঙালিকে নেমেসিসের কাঠামোতে বাঁধবেন– এরও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পাননি। সেই তুলনায় তাঁর অনেক বেশি আগ্রহের জায়গা ছিল শেকসপিয়র রচিত ট্র্যাজেডি। কেননা, এই শ্রেণির ট্র্যাজেডিতে নায়কের কোনো স্খলন বা ক্ষুদ্র ত্রুটিই শেষ পর্যন্ত তাঁর চরম পরিণতির জন্য দায়ী বলে গণ্য হয়। শেকসপিয়রীয় ট্র্যাজেডি নায়কের সেই বিবেচনাগত ভুল বা error of judgement-কে তিনি সিরাজের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু যেভাবে শেকসপিয়রের 'ওথেলো' কিংবা 'হ্যামলেট'-এর নায়কেরা অসহ্য যন্ত্রণা ও পরিতাপের আগুনে দগ্ধ হয়, এর থেকে মুক্তির কোনো পথ তাদের সম্মুখে অবশিষ্ট থাকে না, সেভাবে সিরাজকে নির্মাণ করার কোনো আগ্রহ সিকান্দারের ছিল না। তাহলে তিনি বাঙালিকে কী বার্তা পৌঁছাতেন– আর কোনো আশা নেই, ভরসা নেই! এরূপ তাঁর অন্বিষ্ট ছিল না। বরং তিনি বলতে চান, সিরাজ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন, ষড়যন্ত্র টের পেয়েও ঔদার্য ও মানবিকতায় আমৃত্যু আস্থাশীল সিরাজ ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কখনো চরমভাবে নির্মম ও কঠোর হতে পারেননি। নাট্যকার আরও বলতে চান, সিরাজ যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আপাতভাবে পালিয়ে গিয়েও আবার যুদ্ধ করতে চেয়েছেন, শেষে বন্দি হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু তারপরও সিকান্দারের নাটকের আন্তর-প্রেরণারূপে এই সুর ধ্বনিত হতে থাকে – 'জনতার সংগ্রাম চলবে'। সিরাজ পারেনি, এবার বাঙালিরা পারবে। এই আশাবাদ যে নাটকের মূলশক্তি সেই নাটকের পরিণতি নির্মাণে অনুপুঙ্খভাবে ট্র্যাজেডির বিধিবদ্ধ কাঠামো অনুসরণ প্রত্যাশিত নয়। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ ট্র্যাজেডি হওয়ার পরিবর্তে ট্র্যাজেডির লক্ষণাক্রান্ত হওয়াই এই নাটকের শিল্পসাফল্যের অন্তর্নিহিত প্রেরণা। তবে, করুণরস পরিবেশনের ক্ষেত্রে নাট্যকারকে সচেতন থাকতে হয়েছে যাতে নাটকটি মেলোড্রামা বা অতিনাটকে পরিণত না হয়। কেননা, করুণরস যদি যথাযথভাবে ঘনীভূত না হয়, তবে তা অতি-আবেগ প্রকাশের মধ্য দিয়ে নাটককে ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে; যা কোনোভাবেই সিকান্দারের কাম্য ছিল না। তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে শিল্পসীমা লঙ্ঘন না করে এই নাটককে এক বেদনার্দ্র করুণরসাত্মক পরিণতি প্রদান করেছেন। বিষয়টি অনুধাবনের জন্য আলোচ্য নাটকের প্রেক্ষাপট এবং তার শিল্পরূপ বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

পলাশি যুদ্ধের পটভূমি

বাণিজ্যের আকর্ষণেই ইউরোপীয়রা দীর্ঘকাল পূর্বে ভারতে আসে এবং ক্রমশ এদেশের রাজনীতিতে তারা তাদের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। বাণিজ্যের কথা বিবেচনা করে বলা যায় যে, এই অঞ্চলের পণ্য দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল সমগ্র ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কলম্বাস এদেশ আবিষ্কারের উদ্দেশেই এককালে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করে ফেলেন আমেরিকা। ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, পর্তুগিজ নাবিক ও বেনিয়া ভাস্কো দা গামা ভারতে পৌঁছেছিলেন ১৪৯৮ সালে। এই পর্তুগিজদের সূত্র ধরেই একের পর এক বাণিজ্য কুঠি পূর্ব-ভারতসহ ভারতের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত হতে থাকে। এরা দস্যুবৃত্তিতেও লিপ্ত ছিল। এদের নিয়ন্ত্রণ ও দমন করতে তৎপর হন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁর অনুমতি পেয়েই ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। বলা যেতে পারে, এই আপাত ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক ঘটনাটিই মূলত ভারতের পরবর্তীকালের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, ১৬৩২ সালে বাংলার সুবাদার যুবরাজ শাহ সুজার সম্মতি পেয়ে ইংরেজরা হুগলিতে কারখানা স্থাপনের অনুমতি পায়। এর ধারাবাহিকতায় ১৬৯৮ সালে ইংরেজরা সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রাম ক্রয় করে এবং উল্লিখিত এই তিনটি গ্রাম নিয়েই পরে কলকাতা নগরী গড়ে ওঠে। এর কাছাকাছি সময়ে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। মরণাপন্ন মোগল সম্রাট ফররুখ শিয়রকে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিলটন। আর এরই পুরস্কার হিসেবে ডাক্তারের অনুরোধে ইংরেজদের এদেশে অবাধ বাণিজ্যের ফরমান প্রদান করেন সম্রাট; যা ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য, জমিদারি লাভ, নিজস্ব টাকশাল স্থাপন এমনকি দেশীয় কর্মচারীদের বিচার করবার ক্ষমতাও প্রদান করে। তবে, দিল্লি থেকে এমন ফরমান জারি হলেও বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন খাঁ, সরফরাজ খাঁ এবং আলিবর্দি খাঁ তাঁদের নিজনিজ এলাকায় এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁরা কেউই বাদশার এই অন্যায় ফরমান মানেননি। আর এ থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবদের ঘনঘন সংঘর্ষ, লড়াই চলতে থাকে। এই সকল লড়াইয়ে ইংরেজরা বারংবার পরাভূত হয়েছে। অন্তত, নবাব আলিবর্দি খাঁ-র শাসনামল পর্যন্ত এসকল লড়াই খুব একটা ব্যাপকতা লাভ করেনি; তবে ভেতরে ভেতরে নানা রকম ষড়যন্ত্র চলছিল। কিন্তু পরিস্থিতির প্রয়োজনে অতি অল্প বয়সে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই ইংরেজরা সিরাজের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে একের পর এক লড়াই ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইংরেজদের এই ষড়যন্ত্রে সামিল হয় ফরাসিরাও। কেননা, বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের সূত্র ধরে ফরাসিদেরও নানারকম স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেয়। বাণিজ্যের সূত্রে প্রথমে ফরাসি ও ইংরেজদের মধ্যে রেষারেষি তৈরি হলেও পরবর্তী পর্যায়ে তারা একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এদিকে দিল্লির শাসনব্যবস্থা সেসময়ে দুর্বল থাকায় মারাঠা বর্গি, পারস্যরাজ নাদির শাহ, আফগান শাসনকর্তা আহমদ শাহ আবদালি প্রমুখের আক্রমণে গোটা দেশ জুড়েই অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। এই পরিস্থিতির সুযোগে ইংরেজ ও ফরাসিরা তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তারা দেশীয় স্বার্থপর লোভী বেনিয়া মুৎসুদ্দিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। দেশীয় এসব ব্যক্তির কাছে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণই শেষ কথা ছিল; তাতে দেশের ক্ষতি হলো কি না হলো সে বিষয়ে কোনো চিন্তা ছিল না। এমনকি দেশের স্বাধীনতা বিসর্জনেও তারা পিছ-পা হয়নি। বলা প্রয়োজন যে, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কিংবা নবাব আলিবর্দি খাঁ কেউই তাঁদের শাসনামলে এসব পুঁজিপতি কিংবা বিদেশি বেনিয়াদের কোনোরকম কোনো প্রশ্রয় দেননি। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হওয়ার পর তিনিও একইভাবে পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বয়সে তরুণ। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তবে ফরাসিদের প্রতি তার প্রশ্রয় ছিল বলে কোনো কোনো ইতিহাসবেত্তা মনে করেন। কিন্তু সিরাজের সামনে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। নবাবের অধিকাংশ অমাত্য ও সেনাপতি অর্থ ও ক্ষমতার লোভে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মিরজাফর আলি খাঁ নিজেই নবাব হওয়ার লোভে হাত মেলান রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে। এমনকি নবাবের খালা ঘসেটি বেগমও নিজ পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য অর্থ ব্যয় করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ জুন পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাব যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ইংরেজদের তুলনায় নবারের অস্ত্র, গোলা-বারুদ, সৈন্য সবই বেশি ছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ পক্ষে ছিল তিনহাজার সৈন্য এবং আটটি কামান; এর বিপরীতে নবাব পক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার এবং কামানের সংখ্যা ছিল তেপ্পান্নটি। এত বিপুল সমর-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নবাবের পরাজয় হলো, কেননা তাঁর অধিকাংশ সেনাপতি

যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। এভাবে এক অন্যায় যুদ্ধে বাংলা ইংরেজদের অধীন হলো। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বিশ্বাসঘাতক পুঁজিপতি আর সেনাপতিরা বাংলার স্বাধীনতা বিসর্জন দিল। সিরাজের এই পরাজয়ে তাঁর সমরশক্তির কোনো অভাব ছিল না; কেবল অভাব ছিল নিকটজনের সততা ও আন্তরিকতার। এই পরাজয় একান্তভাবেই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে ঘটেছিল। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের সূত্রে ইংরেজরা দিল্লির সম্রাট ফররুখ শিয়র প্রদত্ত সেই ফরমান কার্যকর করতে সক্ষম হলো। এভাবেই বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ইংরেজরা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলো।

নাটকের প্লটকাঠামো

নাটকটি চারটি অঙ্কে বারোটি দৃশ্যে রচিত। এর মধ্যে আটটি দৃশ্যেই সিরাজ স্বয়ং উপস্থিত। নাটকটি আবর্তিত হয়েছে সিরাজকে কেন্দ্র করে। নাটকের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে সিরাজ এবং অন্যান্য চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে। নাটকটির কাহিনিমুখ উন্মোচিত হয়েছে যুদ্ধ দিয়ে। সিরাজের বাহিনী কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের তাড়িয়েছে। কিন্তু সিরাজের স্বস্তি নেই; তাঁকে সিংহাসন থেকে হটাতে চলছে নানাবিধ প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। এরই সঙ্গে ক্রমব্যাপ্ত হয়েছে নাটকের কাহিনি। ষড়যন্ত্রের যে জাল ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে তাতে ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিকটতম আত্মীয়, তাঁর প্রধান সেনাপতিসহ বিভিন্ন অমাত্য। নাট্যকার এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে গড়ে তুলেছেন নাট্যিক দ্বন্দ্ব যাকে বহন করে চলেছে সিরাজের বহুমাত্রিক সংকট। একদিকে বাংলার স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে অপরদিকে অসূয়া-বিষে জর্জরিত ষড়যন্ত্রকারী নিকটজনদেরও পরিত্যাগ করতে পারছেন না সিরাজ। নাট্যকার এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট নাট্যিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তিনি নাটকটিকে ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে গেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, সিরাজ সবকিছু বুঝতে পারছেন কিন্তু কঠোরতম পদক্ষেপ নিতে তাঁর মানবিক গুণাবলি তাঁকে বাধা দিচ্ছে। এরকম একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি করে নাট্যকার আবারও যুদ্ধের আবহ ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। এবার ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে; সিরাজের আস্থাভাজন সামরিক কর্মকর্তারা একের পর এক মৃত্যুবরণ করেছে; সিরাজকেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে হয়েছে – প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নয় রাজধানীতে ফিরে এসে আবার শক্তি সঞ্চয় করে 'স্বাধীনতা বজায় রাখার শেষ চেষ্টা' করার সংকল্পে। এভাবে, নাটক এগিয়ে গেছে গ্রন্থিমোচনের অভিমুখে। শেষ পর্যন্ত সিরাজের সংকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। সিরাজ ধরা পড়েছে, কারাগারে বন্দি হয়েছে এবং চূড়ান্ত দৃশ্যে কৃতঘ্ন মোহাম্মদি বেগের হাতে নিহত হয়েছে। এক অপরিসীম বেদনায় পাঠক হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

নাটকটিতে সিকান্দার ইতিহাসকে পূর্বাপর অনুসরণে সচেষ্ট ছিলেন। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তিনি বাদ দেননি বা পাল্টাননি। তবে, কোনো কোনো অঙ্কের শুরুতে তারিখ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যগত অসংগতি দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাসকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কখনও কখনও সিরাজের চরিত্র-বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে নাট্যিক দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে সময় দেওয়ার দরকার ছিল, সিরাজের চরিত্র-মনস্তত্ত্ব প্রস্ফুটিত করে তুলতে যে ধরনের শিল্প-পরিচর্যার প্রয়োজন ছিল তার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের চাপে ব্যক্তি-সিরাজের যন্ত্রণা, হাহাকার খুবই নিচু স্বরে নাটকে শোনা যায়। তারপরও এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইতিহাসের নিরস তথ্যপুঞ্জ থেকে এক পরম মানবিক গুণসম্পন্ন উদার-হৃদয় স্বাধীনচেতা নবাবকে তিনি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

চরিত্রায়ণ কৌশল ও কেন্দ্রীয় চরিত্র-চিত্রণ

একটি নাটকে যে এক বা একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তাদের রূপায়ণের পেছনে সক্রিয় থাকে নাট্যকারের চরিত্রায়ণ কৌশল। এদিক থেকে লক্ষ করলে প্রতীয়মান হয় যে, ষড়যন্ত্রে বিপর্যস্ত এক জাতীয় বীর নায়ককে সৃজন করাই ছিল নাট্যকারের কেন্দ্রীয় চরিত্রায়ণ কৌশল। লক্ষণীয় যে, বীরের বিপর্যয় দেখাতে গেলে নায়কের বিপ্রতীপ চরিত্রগুলোকেও সমান শৈল্পিক দক্ষতায় সৃজন করা প্রয়োজন। তা না হলে, নায়কের বিপর্যয়কে মহিমান্বিত করে তোলা সম্ভব হয় না। এই বিষয়টি আলোচ্য নাটকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত হয়নি। নাটকে প্রায় চল্লিশটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু সিরাজ ব্যতীত অন্য কোনো চরিত্রই নাট্যিক গুণ নিয়ে বিকশিত হয়নি। এই চরিত্রগুলোর প্রতিটিই একমাত্রিক। ঘসেটি বেগম, ক্লাইভ কিংবা মিরজাফর কেবলই শঠ-মানসিকতার অধিকারী। মিরমর্দান, মোহনলাল, রাইসুল জুহালা তথা নারায়ণ সিংহ কেবলই নীতিবান, শুদ্ধ মানুষ। লুৎফুন্নেসার কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই পাঠকের চোখে পড়ে না। কিন্তু দোষে গুণে মিলিয়েই তো মানুষ; যা এই নাটকে অনুপস্থিত। এই একমাত্রিকতার সমস্যা সিরাজের মধ্যেও বিদ্যমান।

সিরাজও ধীরোদাত্ত, স্থির-প্রতিজ্ঞ, সহানুভূতিশীল; বলতে গেলে প্রায় ত্রুটিহীন। নিকটজনদের পরিত্যাগ করতে না পারা কিংবা কঠোর শাস্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়ার error of judgement যদি তাঁর চরিত্রে অন্বিত না হতো তবে পুরো নাটকটিরই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিত।

সিরাজ চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো একজন সামন্ত নবাব থেকে জনতার শক্তিতে জাগ্রত হবার বিশ্বাস নিয়ে দেশপ্রেমিক নেতায় পরিণত হওয়া। নাটকের উপান্তে লক্ষ করা যায় যে, সিরাজ আর জনতা একই কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। সিরাজকে তারা সমর্থন করে। কিন্তু জনতা যুদ্ধ জানে না। তাই সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হবার পরে জনতা অত্যন্ত বাস্তব কারণেই ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবার ছেড়েছে। বুঝতে কষ্ট হয় না এই প্রস্থান অনেক কষ্টের, নিতান্তই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। এই জনসম্পৃক্ততাই সিরাজ চরিত্রটিকে অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। কিন্তু সিরাজ চরিত্রের দুর্বলতা হলো তাঁর যন্ত্রণাভোগের সীমাবদ্ধতা। নবাব দরবার থেকে জনতা সরে যাবার পর লুৎফার সঙ্গে সিরাজের যে কথোপকথন লক্ষ করা যায়, তাতে একদিকে নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের আশাবাদ অপরদিকে পলায়নের গ্লানি – এই দুয়ে মিলে যে ঘনীভূত ক্ল্যাইম্যাক্সের জন্ম দিতে পারত তা পরিস্ফুট হওয়ার প্রয়োজনীয় সুযোগ পায়নি। নাটকের শেষ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সিরাজ অনুপস্থিত; আর দ্বিতীয় দৃশ্যে খুব অল্প পরিসরেই সিরাজ নিহত হয়। ফলে, বন্দি সিরাজের যন্ত্রণাভোগ, তাঁর দ্বন্দ্ব, পরিতাপ কোনোকিছুই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। কিন্তু নাট্যকার এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তুলতে চেয়েছেন পাঠক ও দর্শকের মাঝে সিরাজের জনসম্পৃক্তির আমেজকে বজায় রাখার মধ্য দিয়ে। সিরাজের মৃত্যুতে নাটক শেষ হয় কিন্তু নাট্যকারের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে পাঠক তথা দর্শকের মধ্যে। সিরাজের মৃত্যু দৃশ্যবর্ণনা করতে গিয়ে নাট্যকার যখন বলেন : 'শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল।'– তখন এই 'আক্ষেপ' তো লালন করে পাঠক-দর্শক। এই 'আক্ষেপ' থেকে মানুষের মধ্যে এমন প্রত্যয় জেগে ওঠে : সিরাজ যা পারেনি তা তাদের পারতে হবে। সিরাজের অসমাপ্ত লড়াইটি তাদেরকেই শেষ করতে হবে। সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দেশকে স্বাধীন করতে হবে, স্বাধীনতার সুরক্ষা করতে হবে। করুণরসাত্মক পরিণতি সঞ্চারের মধ্য দিয়ে বিশাল জনমানুষের মধ্যে এই লড়াকু মনোভাবকে জাগিয়ে তোলাই সিরাজ চরিত্রের সার্থকতা।

নাটকের গঠন-কৌশল

সিকান্দার আবু জাফর নাটকটির গঠনবৈশিষ্ট্য নিয়ে খুব বেশি নিরীক্ষা করেননি। এমনকি দৃশ্যগুলো কীভাবে মঞ্চায়িত হবে তা-ও খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, মুনীর চৌধুরী রচিত *কবর* নাটকের কথা; যেখানে আলোর ব্যবহার, মঞ্চের গঠন পরিবেশ প্রভৃতির বিস্তৃত উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। তবে, ইতিহাস-আশ্রিত নাটকের উপযোগী সংলাপ ব্যবহার 'সিরাজউদ্দৌলা'-র অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সিরাজ যখন বলেন : 'বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার স্পর্ধা ইংরেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ত চাই'– তখন তার সাহস, বীরত্বই প্রতিভাত হয়; যা ইতিহাস-আশ্রিত নাটকের জন্য একান্ত জরুরি। আবার এই সিরাজকেই তিনি তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে লুৎফার সঙ্গে সংলাপ বিনিময়ের সূত্র ধরে একজন হৃদয়বান, মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে, নবাব হিসেবে, স্বামী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে, যথোপযোগী সংলাপ ব্যবহার এই নাটকের গঠন-কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নাট্যকার ঈপ্সিত পরিবেশ সৃজনের প্রয়োজনে কখনও আলংকারিক সংলাপ ব্যবহার করেন, dramatic relief-এর জন্য রাইসুল জুহালার মতো চরিত্র সৃষ্টি করেন; তার সংলাপে, সিরাজের সংলাপে নানা বিদ্রূপ, শ্লেষ কিংবা প্রতীকী বক্তব্য সমন্বিত করেন। অপরদিকে বোরখা পরিয়ে ক্লাইভকে দৃশ্যে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তার ভীরুতাকে প্রকট করার সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসেরও সঞ্চার ঘটান। উমিচাঁদ, জগৎশেঠ কিংবা মির জাফরের সংলাপে বালখিল্যপনা এনে তাদের কাপুরুষতাকে তুলে ধরেন।

নাটক মূলত ক্রিয়াশীলতার সৃজনভূমি। এই চিন্তা সিকান্দার পূর্বাপর বজায় রেখেছেন। দীর্ঘ বর্ণনার ভার কখনোই নাটকটিকে আক্রান্ত করেনি। একটি দৃশ্য থেকে অপর দৃশ্যে নাট্যকার চলে গেছেন অনায়াসে দ্রুততার সঙ্গে। এমনকি পলাশির প্রান্তর থেকে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে ফিরে এসে সিরাজের মধ্যে যে বর্ণনাধর্মী সংলাপ প্রদানের প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তা-ও মূলত সিরাজকে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সুযোগ করে দেয়। এছাড়াও প্রয়োজন অনুসারে অলংকার ব্যবহার এবং দৃঢ় ও সাবলীল ভাষায় নাট্যিক বক্তব্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সিকান্দার আবু জাফর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথম অঙ্ক

যবনিকা উত্তোলনের অব্যবহিত পূর্বে আবহ সংগীতের পটভূমিতে নেপথ্যে ঘোষণা :

ঘোষণা : এক স্বাধীন বাংলা থেকে আর এক স্বাধীন বাংলায় আসতে বহু দুর্যোগের পথ আমরা পাড়ি দিয়েছি; বহু লাঞ্ছনা বহু পীড়নের গ্লানি আমরা সহ্য করেছি। দুই স্বাধীন বাংলার ভেতরে আমাদের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত গভীর। আজ এই নতুন দিনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিস্মৃত অতীতের পানে দৃষ্টি ফেরালে বাংলার শেষ সূর্যালোকিত দিনের সীমান্ত রেখায় আমরা দেখতে পাই নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে।

নবাব সিরাজের দুর্বহ জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনি আমরা স্মরণ করি গভীর বেদনায়, গভীর সহানুভূতিতে। সে কাহিনি আমাদের ঐতিহ্য। আজ তাই অতীতের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য আমরা বিস্মৃতির যবনিকা উত্তোলন করছি।

১৭৫৬ সাল : ১৯এ জুন।

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, ১৯এ জুন। স্থান : ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-ক্যাপ্টেন ক্লেটন, ওয়ালি খান, জর্জ, হলওয়েল, উমিচাঁদ, মিরমর্দান, মানিকচাঁদ, সিরাজ, রায়দুর্লভ, ওয়াটস]

(নবাব সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করছে। দুর্গের ভেতরে ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয়। তবু যুদ্ধ না করে উপায় নেই। তাই ক্যাপ্টেন ক্লেটন দুর্গ প্রাচীরের এক অংশ থেকে মুষ্টিমেয় গোলন্দাজ নিয়ে কামান চালাচ্ছেন। ইংরেজ সৈন্যের মনে কোনো উৎসাহ নেই, তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।)

ক্লেটন : প্রাণপণে যুদ্ধ করো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। ভিক্টরি অর ডেথ, ভিক্টরি অর ডেথ।

(গোলাগুলির শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্লেটন একজন বাঙালি গোলন্দাজের দিকে এগিয়ে গেলেন)

ক্লেটন : তোমরা, তোমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করো বাঙালি বীর। বিপদ আসন্ন দেখে কাপুরুষের মতো হাল ছেড়ে দিও না। যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো। ভিক্টরি অর ডেথ।

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

ওয়ালি খান : যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন, ক্যাপ্টেন ক্লেটন। নবাব সৈন্য দুর্গের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ক্লেটন : না, না।

ওয়ালি খান : এখুনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নবাব সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে দুর্গের একটি প্রাণীকেও তারা রেহাই দেবে না।

ক্লেটন : চুপ বেইমান। কাপুরুষ বাঙালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

ওয়ালি খান : ও সব কথা বলবেন না সাহেব। ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্যে। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ বন্ধ না করলে নবাব সৈন্য এখুনি তার প্রাণ নেবে।

ক্লেটন : হোয়াট? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

(ওয়ালি খানকে চড় মারার জন্যে এগিয়ে গেল। অপর একজন রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ)

জর্জ : ক্যাপ্টেন ক্লেটন, অধিনায়ক এনসাইন পিকার্ডের পতন হয়েছে। পেরিঙ্গ পয়েন্টের সমস্ত ছাউনি ছারখার করে দিয়ে ভারী ভারী কামান নিয়ে নবাব সৈন্য দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।

ক্লেটন : কী করে তারা এখানে আসবার রাস্তা খুঁজে পেলো?

জর্জ : উমিচাঁদের গুপ্তচর নবাব ছাউনিতে খবর পাঠিয়েছে। নবাবের পদাতিক বাহিনী দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে, আর গোলন্দাজ বাহিনী শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যাস্রোতের মতো ছুটে আসছে।

ক্লেটন : বাধা দেবার কেউ নেই। (ক্ষিপ্তস্বরে) ক্যাপ্টেন মিনচিন দমদমের রাস্তাটা উড়িয়ে দিতে পারেননি?

জর্জ : ক্যাপ্টেন মিনচিন, কাউন্সিলার ফকল্যান্ড আর ম্যানিংহাম নৌকোয় করে দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।

ক্লেটন : কাপুরুষ, বেইমান। জ্বলন্ত আগুনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যায়। চালাও, গুলি চালাও। নবাব সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, বিপদের মুখে ইংল্যান্ডের বীর সন্তান কতখানি দুর্জয় হয়ে ওঠে।

(জন হলওয়েলের প্রবেশ এবং জর্জের প্রস্থান)

হলওয়েল : এখন গুলি চালিয়ে বিশেষ ফল হবে কি, ক্যাপ্টেন ক্লেটন?

ক্লেটন : যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি, সার্জন হলওয়েল?

হলওয়েল : আমার মনে হয় গভর্নর রজার ড্রেকের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নবারের কাছে আত্মসমর্পণ করাই এখন যুক্তিসঙ্গত।

ক্লেটন : তাতে কি নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো ভেবেছেন।

হলওয়েল : তবু কিছুটা আশা থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ করে টিকে থাকবার কোনো আশা নেই। গোলাগুলি যা আছে তা দিয়ে আজ সন্ধে পর্যন্তও যুদ্ধ করা যাবে না। ডাচদের কাছে, ফরাসিদের কাছে, সবার কাছে আমরা সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্ত সৈন্য তো দূরের কথা এক ছটাক বারুদ পাঠিয়েও কেউ আমাদের সাহায্য করল না।

(বাইরে গোলার আওয়াজ প্রবলতর হয়ে উঠল)

ক্লেটন : তা হলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি গভর্নর ড্রেকের সঙ্গে একবার আলাপ করে আসি।

(ক্লেটনের প্রস্থান। বাইরে থেকে যথারীতি গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। হলওয়েল চিন্তিতভাবে এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন।)

হলওয়েল : (পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে) এই কে আছ?

(রক্ষীর প্রবেশ)

জর্জ : ইয়েস, স্যার।

হলওয়েল : উমিচাঁদকে বন্দি করে কোথায় রাখা হয়েছে?

জর্জ : পাশেই একটা ঘরে।

হলওয়েল : তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।

জর্জ : রাইট, স্যার।

(জর্জ দ্রুত বেরিয়ে চলে যায় এবং প্রায় পর মুহূর্তেই উমিচাঁদকে নিয়ে প্রবেশ করে)

উমিচাঁদ : (প্রবেশ করতে করতে) সুপ্রভাত, সার্জন হলওয়েল।

হলওয়েল : সুপ্রভাত। তাই না উমিচাঁদ? (গোলাগুলির আওয়াজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। হলওয়েল বিস্মিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন) নবাব সৈন্যের গোলাগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন বলুন তো?

উমিচাঁদ : (কান পেতে শুনল) বোধহয় দুপুরের আহারের জন্যে সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছে।

হলওয়েল : এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে উমিচাঁদ। আপনি নবাবের সেনাধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠান। তাঁকে অনুরোধ করুন নবাব সৈন্য যেন আর যুদ্ধ না করে।

উমিচাঁদ : বন্দির কাছে এ প্রার্থনা কেন সার্জন হলওয়েল? (কঠিন স্বরে) আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।

(জর্জের প্রবেশ)

জর্জ : সার্জন হলওয়েল, গভর্নর রজার ড্রেক আর ক্যাপ্টেন ক্লেটন নৌকা করে পালিয়ে গেছেন।

হলওয়েল : দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন?

জর্জ : গভর্নরকে পালাতে দেখে একজন রক্ষী তাঁর দিকে গুলি ছুড়েছিল, কিন্তু তিনি আহত হননি।

উমিচাঁদ : দুর্ভাগ্য, পরম দুর্ভাগ্য।

হলওয়েল : যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন বলে আধ ঘণ্টা আগেও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ক্যাপ্টেন ক্লেটন। শেষে তিনিও পালিয়ে গেলেন।

উমিচাঁদ : ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।

হলওয়েল : উমিচাঁদ, এখন উপায়?

উমিচাঁদ : আবার কি? ক্যাপ্টেন কর্নেলেরা সব পালিয়ে গেছেন, এখন ফাঁকা ময়দানে গাইস হাসপাতালের হাতুড়ে সার্জন জন জেফানিয়া হলওয়েল সর্বাধিনায়ক। আপনিই এখন কমান্ডার-ইন-চিফ।

(আবার প্রচণ্ড গোলার আওয়াজ ভেসে এল)

হলওয়েল : (হতাশার স্বরে) উমিচাঁদ।

উমিচাঁদ : আচ্ছা, আমি রাজা মানিকচাঁদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি দুর্গ প্রাকারে সাদা নিশান উড়িয়ে দিন।

(উমিচাঁদের প্রস্থান। হঠাৎ বাইরে গোলমালের শব্দ শোনা গেল। বেগে জর্জের প্রবেশ)

জর্জ : সর্বনাশ হয়েছে। একদল ডাচ সৈন্য গঙ্গার দিককার ফটক ভেঙে পালিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে নবাবের সশস্ত্র পদাতিক বাহিনী হুড় হুড় করে কেল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

হলওয়েল : সাদা নিশান ওড়াও। দুর্গ তোরণে সাদা নিশান উড়িয়ে দাও।

(জর্জ ছুটে গিয়ে একটি নিশান উড়িয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নবাব সৈন্যের অধিনায়ক রাজা মানিকচাঁদ ও মিরমর্দানের প্রবেশ)

মিরমর্দান : এই যে দুশমনরা এখানে থেকেই গুলি চালাচ্ছে।

হলওয়েল : আমরা সন্ধির সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছি। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে–

মিরমর্দান : সন্ধি না আত্মসমর্পণ?

মানিকচাঁদ : সবাই অস্ত্র ত্যাগ কর।

মিরমর্দান : মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।

মানিকচাঁদ : তুমিও হলওয়েল, তুমিও মাথার ওপর দুহাত তুলে দাঁড়াও। কেউ একচুল নড়লে প্রাণ যাবে।

(দ্রুতগতিতে নবাব সিরাজের প্রবেশ। সঙ্গে সসৈন্যে সেনাপতি রায়দুর্লভ। বন্দিরা কুর্নিশ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। সিরাজ চারদিকে একবারে ভালো করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে হলওয়েলের দিকে এগিয়ে গেলেন।)

সিরাজ : কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছ। তোমার কৃতকার্যের উপযুক্ত প্রতিফল নেবার জন্যে তৈরি হও হলওয়েল।

হলওয়েল : আশা করি নবাব আমাদের ওপরে অন্যায় জুলুম করবেন না।

সিরাজ : জুলুম? এ পর্যন্ত তোমরা যে আচরণ করে এসেছ তাতে তোমাদের ওপরে সত্যিকার জুলুম করতে পারলে আমি খুশি হতুম। গভর্নর ড্রেক কোথায়?

হলওয়েল : তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।

সিরাজ : কলকাতার বাইরে গেছেন, না প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন? আমি সব খবর রাখি, হলওয়েল। নবাব সৈন্য কলকাতা আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রজার ড্রেক প্রাণভয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কৈফিয়ত তবু কাউকে দিতেই হবে? বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার স্পর্ধা ইংরেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ত চাই।

হলওয়েল : আমরা নবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইনি। শুধু আত্মরক্ষার জন্যে–

সিরাজ : শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই কাশিমবাজার কুঠিতে তোমরা গোপনে অস্ত্র আমদানি করছিলে, তাই না? খবর পেয়ে আমার হুকুমে কাশিমবাজার কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্দি করা হয়েছে ওয়াটস আর কলেটকে। রায়দুর্লভ।

রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা।

সিরাজ : বন্দি ওয়াটসকে এখানে হাজির করুন।

(কুর্নিশ করে রায়দুর্লভের প্রস্থান)

সিরাজ : তোমরা ভেবেছ তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমি রাখি না।

(ওয়াটসসহ রায়দুর্লভের প্রবেশ)

ওয়াটস।

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি!

সিরাজ : আমি জানতে চাই তোমাদের অশিষ্ট আচরণের জবাবদিহি কে করবে? কাশিমবাজারে তোমরা গোলাগুলি আমদানি করছ, কলকাতার আশেপাশে গ্রামের পর গ্রাম তোমরা নিজেদের দখলে আনছ, দুর্গ সংস্কার করে তোমরা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছ, আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণবল্লভকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ, বাংলার মসনদে বসবার পর আমাকে তোমরা নজরানা পর্যন্ত পাঠাওনি। তোমরা কি ভেবেছ এইসব অনাচার আমি সহ্য করব?

ওয়াটস : আমরা আপনার অভিযোগের কথা কাউন্সিলের কাছে পেশ করব।

সিরাজ : তোমাদের ধৃষ্টতার জবাবদিহি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে তোমাদের বাণিজ্য করবার অধিকার আমি প্রত্যাহার করছি।

ওয়াটস : কিন্তু বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিল্লির বাদশাহ আমাদের দিয়েছেন।

সিরাজ : বাদশাকে তোমরা ঘুষের টাকায় বশীভূত করেছ। তিনি তোমাদের অনাচার দেখতে আসেন না।

হলওয়েল : ইওর এক্সিলেন্সি নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছেন।

সিরাজ : আর আমাকে তিনি যে অনুমতি দান করে গেছেন তা তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। সে খবর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন কিলপ্যাট্রিক, ক্লাইভ সকলেরই জানা আছে। মাদ্রাজে বসে ক্লাইভ লন্ডনের সিক্রেট কমিটির সঙ্গে যে পত্রালাপ করে তা আমার জানা নেই ভেবেছ? আমি সব জানি। তবু তোমাদের অবাধ বাণিজ্যে এ পর্যন্ত কোনো বিঘ্ন ঘটাইনি। কিন্তু সদ্ব্যবহার তো দূরের কথা তোমাদের জন্যে করুণা প্রকাশ করাও অন্যায়।

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি আমাদের সম্বন্ধে ভুল খবর শুনেছেন। আমরা এ দেশে বাণিজ্য করতে এসেছি। উই হ্যাভ কাম টু আর্ন মানি অ্যান্ড নট টু গেট ইনটু পলিটিক্স। রাজনীতি আমরা কেন করব।

সিরাজ : তোমরা বাণিজ্য কর? তোমরা কর লুট। আর তাতে বাধা দিতে গেলেই তোমরা শাসন ব্যবস্থায় ওলটপালট আনতে চাও। কর্ণাটকে, দাক্ষিণাত্যে তোমারা কী করেছ? শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে অবাধ লুটতরাজের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছ। বাংলাতেও তোমরা সেই ব্যবস্থাই করতে চাও। তা না হলে আমার নিষেধ সত্ত্বেও কলকাতার দুর্গ-সংস্কার তোমরা বন্ধ করনি। কেন?

হলওয়েল : ফরাসি ডাকাতদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে চাই।

সিরাজ : ফরাসিরা ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?

ওয়াটস : আমরা অশান্তি চাই না, ইওর এক্সিলেন্সি

সিরাজ : চাও কি না চাও সে বিচার পরে হবে। রায়দুর্লভ।

রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা!

সিরাজ : গভর্নর ড্রেকের বাড়িটা কামানের গোলায় উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। গোটা ফিরিঙ্গি পাড়ায় আগুন ধরিয়ে ঘোষণা করে দিন সমস্ত ইংরেজ যেন অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আশপাশের গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিন তারা যেন কোনো ইংরেজের কাছে কোনো প্রকারের সওদা না বেচে। এই নিষেধ কেউ অগ্রাহ্য করলে তাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

রায়দুর্লভ : হুকুম, জাঁহাপনা।

সিরাজ : আজ থেকে কলকাতার নাম হলো আলিনগর। রাজা মানিকচাঁদ, আপনাকে আমি আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করলাম।

মানিকচাঁদ : জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

সিরাজ : আপনি অবিলম্বে কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তি আর প্রত্যেকটি ইংরেজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নবাব তহবিলে বাজেয়াপ্ত করুন। কলকাতা অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করবে কোম্পানির প্রতিনিধিরা আর কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজ।

মানিকচাঁদ : হুকুম, জাঁহাপনা।

সিরাজ : (উমিচাঁদের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে) আপনাকে মুক্তি দেওয়া হলো, উমিচাঁদ।

(উমিচাঁদ কৃতজ্ঞতায় নতশির)

আর (মিরমর্দানকে) হ্যাঁ, রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে আমার একটা মিটমাট হয়ে গেছে। কাজেই কৃষ্ণবল্লভকেও মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করুন।

মিরমর্দান : হুকুম, জাঁহাপনা।

সিরাজ : হলওয়েল।

হলওয়েল : ইওর এক্সিলেন্সি

সিরাজ : তোমার সৈন্যদের মুক্তি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার বন্দি। (রায়দুর্লভকে) কয়েদি হলওয়েল, ওয়াটস আর কলেটকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের বিচার করব।

রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা!

(সিরাজ বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই মাথা নুইঁয়ে তাঁকে কুর্নিশ করল।)

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : **১৭৫৬** সাল, তেসরা জুলাই। স্থান : কলকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে–ড্রেক, হ্যারি, মার্টিন, কিলপ্যাট্রিক, ইংরেজ মহিলা, সৈনিক, হলওয়েল, ওয়াটস, আর্দালি।]

(কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং তাদের দলবল এই জাহাজে আশ্রয় নিয়েছে। সকলের চরম দুরবস্থা। আহার্য দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গোপনে যৎ-সামান্য চোরাচালান আসে। পরিধেয় বস্ত্র প্রায় নেই বললেই চলে। সকলেরই এক কাপড় সম্বল। এর ভেতরেও নিয়মিত পরামর্শ চলছে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়। জাহাজ থেকে নদীর একদিক দেখা যাবে ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। জাহাজের ডেকে পরামর্শরত ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং আরও দুজন তরুণ ইংরেজ।)

ড্রেক : এই তো কিলপ্যাট্রিক ফিরে এসছেন মাদ্রাজ থেকে। ওঁর কাছেই শোন, প্রয়োজনীয় সাহায্য–

হ্যারি : এসে পড়ল বলে, এই তো বলতে চাইছেন? কিন্তু সে সাহায্য এসে পৌঁছোবার আগেই আমাদের দফা শেষ হবে মি. ড্রেক।

মার্টিন : কিলপ্যাট্রিক সাহেবের সুখবর নিয়ে আসাটা আপাতত আমাদের কাছে মোটেই সুখবর নয়। তিনি মাত্র শ-আড়াই সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন। এই ভরসায় একটা দাঙ্গাও করা যাবে না। যুদ্ধ করে কলকাতা জয় তো দূরের কথা।

ড্রেক : তবুও তো লোকবল কিছুটা বাড়ল।

হ্যারি : লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আমাদের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।

ড্রেক : আহার্য কোনো রকমে জোগাড় হবেই।

মার্টিন : কী করে হবে তাই বলুন না মি. ড্রেক। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটাই তো জানতে চাইছি। এ পর্যন্ত দুবেলা আহার্যের বন্দোবস্ত হয়েছে? ধারেকাছে হাটবাজার নেই। নবাবের হুকুমে প্রকাশ্যে কেউ কোনো জিনিস আমাদের কাছে বেচেও না। চারগুণ দাম দিয়ে কতদিন গোপনে সওদাপাতি কিনতে হয়। এই অবস্থা কতদিন চলবে সেটা আমাদের জানা দরকার।

কিলপ্যাট্রিক : এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন?

হ্যারি : ধৈর্য ধরব আমরা কীসের আশায় সেটাও তো জানতে হবে।

ড্রেক : যা হয়েছে তা নিয়ে বিবাদ করে কোনো লাভ নেই। দোষ কারো একার নয়।

মার্টিন : যাঁরা এ পর্যন্ত হুকুম দেবার মালিক তাঁদের দোষেই আজ আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত। বিশেষ করে আপনার হঠকারিতার জন্যেই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ।

ড্রেক : আমার হঠকারিতা?

মার্টিন : তা নয়ত কি? অমন উদ্ধত ভাষায় নবাবকে চিঠি দেবার কী প্রয়োজন ছিল? তা ছাড়া নবাবের আদেশ অমান্য করে কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেবারই বা কী কারণ?

ড্রেক : সব ব্যাপারে সকলের মাথা গলানো সাজে না।

হ্যারি : তা তো বটেই। কৃষ্ণবল্লভের কাছ থেকে কী পরিমাণ টাকা উৎকোচ নেবেন মি. ড্রেক, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো কেন? কিন্তু এটা বলতে আমাদের কোনো বাধা নেই যে, ঘুষের অঙ্ক বড় বেশি মোটা হবার ফলেই নবাবের ধমকানি সত্ত্বেও কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করতে পারেননি মি. ড্রেক।

ড্রেক : আমার রিপোর্ট আমি কাউন্সিলের কাছে দাখিল করেছি।

মার্টিন : রিপোর্টের কথা রেখে দিন। তাতে আর যাই থাক সত্যি কথা বলা হয়নি। (টেবিলের ওপর এক বান্ডিল কাগজ দেখিয়ে) ওইতো রিপোর্ট তৈরি করেছেন কলকাতা যে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছেন তার। ওর ভেতরে একটি বর্ণ সত্যি কথা খুঁজে পাওয়া যাবে?

ড্রেক : (টেবিলে ঘুষি মেরে) দ্যাটস নান অব ইওর বিজনেস।

মার্টিন : অব কোর্স ইট ইজ।

কিলপ্যাট্রিক : তোমরাই বা হঠাৎ এমন সাধুত্বের দাবিদার হলে কীসে?

ড্রেক : তোমাদের দুজনের ব্যাংক ব্যালানস বিশ হাজারের কম নয় কারোরই। অথচ তোমরা কোম্পানির সত্তর টাকা বেতনের কর্মচারী।

হ্যারি : ব্যক্তিগত উপার্জনের ছাড়পত্র কোম্পানি সকলকেই দিয়েছে। সবাই উপার্জন করছে, আমরাও করছি। কিন্তু আমরা ঘুষ খাইনি।

ড্রেক : আমিও ঘুষ খাইনে।

মার্টিন : অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।

ড্রেক : তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করছ। ভুলে যেও না এখনো ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃত্ব আমার হাতে।

হ্যারি : ফোর্ট উইলিয়াম?

ড্রেক : ইংরেজের আধিপত্য অত সহজেই মুছে যাবে নাকি? এই জাহাজটাই এখন আমাদের কলকাতার দুর্গ। আর দুর্গ শাসনের ক্ষমতা এখনো আমার অধিকারে। বিপদের সময়ে সকলে একযোগে কাজ করার জন্যেই মন্ত্রণা সভায় তোমাদের ডেকেছিলাম। কিন্তু দেখছি তোমরা এই মর্যাদার উপযুক্ত নও।

মার্টিন : বড়াই করে কোনো লাভ হবে না, মি. ড্রেক। আমরা আপনার কর্তৃত্ব মানব না।

ড্রেক : এত বড় স্পর্ধা? উইথড্র। হোয়াট ইউ হ্যাভ সেইড, মাফ চাও দ্বিতীয় কথা না বলে। নাথিং শর্ট অফ অ্যান আনকন্ডিশনাল অ্যাপোলজি উইল সেইভ ইউ। মাফ চাও তা না হলে এই মুহূর্তে তোমাদের কয়েদ করবার হুকুম দিয়ে দেব।

(জনৈক ইংরেজ মহিলা দড়ির ওপর একটা ছেঁড়া গাউন মেলতে আসছিলেন। তিনি হঠাৎ ড্রেকের কথায় রুখে উঠলেন। ছুটে গেলেন বচসারত পুরুষদের কাছে।)

ইংরেজ মহিলা : তবু যদি মেয়েদের নৌকোয় করে কলকাতা থেকে না পালাতেন তা হলেও না হয় এই দম্ভ সহ্য করা যেত।

ড্রেক : উই আর ইন দ্যা কাউন্সিল সেশন, ম্যাডাম, এখানে মহিলাদের কোনো কাজ নেই।

ইংরেজ মহিলা : ড্যাম ইওর কাউন্সিল, প্রাণ বাঁচাবে কী করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।

ড্রেক : সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে।

ইংরেজ মহিলা : ছাই হচ্ছে। রোজই শুনছি কিছু একটা হচ্ছে। যা হচ্ছে সে তো নিজেদের ভেতরে ঝগড়া। এদিকে দিনের পর দিন এক বেলা খেয়ে, প্রায়ই না খেয়ে, অহোরাত্র এক কাপড় পড়ে মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচে যাবার জোগাড়।

ড্রেক : বাট ইউ সি–

ইংরেজ মহিলা : আই ডু নট সি অ্যালোন, ইউ ক্যান অলসো সি এভরি নাইট। এক প্রস্থ জামা-কাপড় সম্বল। ছেলে-বুড়ো সকলকেই তা খুলে রেখে রাত্রে ঘুমুতে হয়। কোনো আড়াল নেই আব্রু নেই। এনিবডি ক্যান সি দ্যাট পিটিএবল অ্যানাটমিক এক্সিবিশন। এর চেয়ে বেশি আর কী দেখতে চান?

(হাতের ভিজে গাউনটা ড্রেকের মুখে ছুড়ে দিতে যাচ্ছেলেন মহিলাটি, এমন সময় জনৈক গোরা সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ।)

সৈনিক : মি. হলওয়েল আর মি. ওয়াটস।

(প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে হলওয়েল আর ওয়াট্‌স ঢুকল)

কিলপ্যাট্রিক : গড গ্র্যাসিয়াস

হলওয়েল : (সকলের উদ্দেশে) গুড মনিং টু ইউ।

(সকলের সঙ্গে করমর্দন। ওয়াট্‌স কোনো কথা না বলে সকলের সঙ্গে করমর্দন করল। মহিলাটি একটু ইতস্তত করে অন্য দিকে চলে গেলেন।)

ড্রেক : বল, খবর বল হলওয়েল। উৎকণ্ঠায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল যে।

হলওয়েল : মুর্শিদাবাদে ফিরেই নবাব আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য নানা রকম ওয়াদা করতে হয়েছে, নাকে-কানে খৎ দিতে হয়েছে এই যা।

ড্রেক : কলকাতায় ফেরা যাবে?

হলওয়েল : না।

ওয়াটস : আপাতত নয়, কিন্তু ধীরে ধীর হয়ত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কিলপ্যাট্রিক : কী রকম ব্যবস্থা?

ওয়াটস : অর্থাৎ মেজাজ বুঝে যথাসময়ে কিছু উপঢৌকনসহ হাজির হয়ে আবার একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ড্রেক : তার জন্যে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

হলওয়েল : একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নবাব ইংরেজের ব্যবসা সমূলে উচ্ছেদ করতে চান না। তা চাইলে এভাবে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারতেন না।

ড্রেক : তাহলে নবাবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হয়।

হলওয়েল : কিছুটা করেই এসেছি। তা ছাড়া উমিচাঁদ নিজের থেকেই আমাদের সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

ড্রেক : হুররে।

ওয়াটস : মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ এঁরাও আস্তে আস্তে নবাবের কানে কথাটা তুলবেন।

ড্রেক : (হ্যারি ও মার্টিনকে) আশা করি তোমাদের মেজাজ এখন কিছুটা ঠান্ডা হয়েছে। আমাদের মিলেমিশে থাকতে হবে, একযোগে কাজ করতে হবে।

হ্যারি : আমরা তো ঝগড়া করতে চাইনে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাই।

মার্টিন : যেমন হোক একটা নিশ্চিত ফল দেখতে চাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

ড্রেক : (উচ্চকণ্ঠে) পেশেন্স ইজ দ্যা কি ওয়ার্ল্ড, ইয়াংম্যান।

হলওয়েল : (পায়ে চাপড় মেরে) উঃ, কী মশা। সিরাজউদ্দৌলা মসকিউটো ব্রিগেড মবিলাইজ করে দিয়েছে নাকি?

ড্রেক : যা বলছ ম্যালেরিয়া আর ডিসেন্ট্রিতে ভুগে কয়েকজন এর ভেতরে মারাও গেছে।

ওয়াটস : বড় ভয়ানক জায়গায় আস্তানা গেড়েছেন আপনারা।

ড্রেক : বাট ইট ইজ ইমপরট্যান্ট ফ্রম মিলিটারি পয়েন্ট অব ভিউ। সমুদ্র কাছেই। কলকাতাও চল্লিশ মাইলের ভেতরে। প্রয়োজন হলে যে কোনো দিকে ধাওয়া করা যাবে।

কিলপ্যাট্রিক : দ্যাটস ট্রু। কলকাতায় ফেরার আশায় বসে থাকতে হলে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। নদীর দুপাশে ঘন জঙ্গল। সেদিক দিয়ে বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই। বিপদ যদি আসেই তাহলে তা আসবে কলকাতার দিক দিয়ে গঙ্গার স্রোতে ভেসে। কাজেই সতর্ক হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

হলওয়েল : কলকাতার দিক থেকে আপাতত কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। উমিচাঁদ কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে হাত করেছে। তার অনুমতি পেলেই জঙ্গল কেটে আমরা এখানে হাট-বাজার বসিয়ে দেব।

ড্রেক : অফকোর্স নেটিভরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়। কিন্তু ফৌজদারের ভয়েই তা পারছে না।

(প্রহরী সৈনিকের প্রবেশ। সে ড্রেকের হাতে এক টুকরো কাগজ দিল। ড্রেক কাগজ পড়ে চেঁচিয়ে উঠল)

উমিচাঁদের লোক এই চিঠি এনেছে।

সকলে : হোয়াট? এত তাড়াতাড়ি। (চরসহ প্রহরীর প্রবেশ। অভিবাদনান্তে ড্রেকের হাতে পত্র দিল আগন্তুক। ড্রেক ইঙ্গিত করতেই তারা আবার বেরিয়ে গেল)

ড্রেক : (মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে পত্র পড়তে লাগল)'– আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব। – মানিকচাঁদকে অনেক কষ্টে রাজি করানো হইয়াছে, সে কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছে। এর জন্যে তাহাকে বারো হাজার টাকা নজরানা দিতে হইয়াছে। টাকাটা নিজের তহবিল হইতে দিয়া দেওয়ানের স্বাক্ষরিত হুকুমনামা হাতে হাতে সংগ্রহ করিয়া পত্রবাহক মারফত পাঠাইলাম। এই টাকা এবং আমার পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা ন্যায্য বিবেচিত হয় তাহা পত্রবাহকের হাতে পাঠাইলেই আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বলা বাহুল্য, পারিশ্রমিক বাবদ আমি পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশা করি। অবশ্য ড্রেক সাহেবের বিবেচনায় তাহা গ্রাহ্য না হইলে দুই চারি শত টাকা কম লইতেও আমার আপত্তি নাই। কোম্পানি আমার ওপর ষোলো আনা বিশ্বাস রাখিতে পারেন। সুদূর লাহোর হইতে আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি অর্থ উপার্জনের জন্য, যেমন আসিয়াছেন কোম্পানির লোকেরা। কাজেই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে আমি আপনাদেরই সমগোত্রীয়।' (চিঠি ভাঁজ করতে করতে)

এ পারফেক্ট স্কাউন্ড্রেল ইজ দিস ওঁমিচাদ।

হলওয়েল : কিন্তু উমিচাঁদের সাহায্য তো হাতছাড়া করা যাচ্ছে না।

ওয়াটস : ইভেন হোয়েন ইট ইজ টু কস্টলি।

ড্রেক : সেই তো মুস্কিল। ওর লোভের অন্ত নেই। মানিকচাঁদের হুকুমনামার জন্যে সতেরো হাজার টাকা দাবি করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি দুইহাজারের বেশি মানিকচাঁদের পকেটে যাবে না। বাকিটা যাবে উমিচাঁদের তহবিলে।

হলওয়েল : কিন্তু কিছুই করবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোগ পেয়ে সে ছাড়বে কেন?

ড্রেক : দেখি, টাকাটা দিয়ে ওর লোকটাকে বিদায় করি।

(বেরিয়ে গেল)

ওয়াটস : শুধু উমিচাঁদের দোষ দিয়ে কী লাভ? মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মানিকচাঁদ কে হাত পেতে নেই?

কিলপ্যাট্রিক : দশদিকের দশটি খালি হাত ভর্তি করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আর ফরাসিরা।

হলওয়েল : কিছু না, কিছু না। হাজার হাতে হাজার হাজার হাত থেকে নিয়ে দশ হাত বোঝাই করতে আর কতটুকু সময় লাগে? বিপদ সেখানে নয়। বিপদ হলো বখরা নিয়ে মতান্তর ঘটলে।

(ড্রেকের প্রবেশ)

ড্রেক : (উমিচাঁদের চিঠি বার করে) আর একটা জরুরি খবর আছে উমিচাঁদের চিঠিতে। শওকতজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার লেগে গেল বলে। এই সুযোগ নেবে মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের দল। তারা শওকত জঙ্গকে সমর্থন করবে।

ওয়াটস : খুব স্বাভাবিক। শওকতজঙ্গ নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে। ভাং খেয়ে নাচওয়ালিদের নিয়ে সারাক্ষণ সে পড়ে থাকবে আর উজির ফৌজদাররা যার যা খুশি তাই করতে পারবে।

ড্রেক : আগেভাগেই তার কাছে আমাদের ভেট পাঠানো উচিত বলে আমার মনে হয়।

কিলপ্যাট্রিক : আই সেন্ড ইউ।

ওয়াট্‌স : তা পাঠান। কিন্তু সন্ধে হয়ে গেল যে। এখানে একটা বাতি দেবে না?

ড্রেক : অর্ডারলি, বাত্তি লে আও।

হলওয়েল : নবাবের কয়েদখানায় থেকে এ দুদিনে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছি। আপনাদের অবস্থা কি ততটাই খারাপ?

ড্রেক : নট সো ব্যাড আই হোপ।

(আর্দালি একটা বাতি রাখল)

ড্রেক : পেগ লাগাও।

(দূরে থেকে কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে : জাহাজ-জাহাজ আসছে।

চারজনে সমস্বরে : কোথায়? ফ্রম হুইচ সাইড?

নেপথ্যে : সমুদ্রের দিক থেকে জাহাজ আসছে। দুইখানা, তিনখানা, চারখানা, পাঁচখানা। পাঁচখানা জাহাজ। কোম্পানির জাহাজ!

(আর্দালি বোতল আর গ্লাস রাখল টেবিলে)

ড্রেক : কোম্পানির জাহাজ? মাস্ট বি ফ্রম ম্যাড্রাস। লেট আস সেলিব্রেট। হিপ হিপ হুররে।

সমস্বরে : হুররে।

(সবাই গ্লাসে মদ ঢেলে নিল)

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, ১০ই অক্টোবর। স্থান : ঘসেটি বেগমের বাড়ি।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-ঘসেটি বেগম, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রাইসুল জুহালা, রায়দুর্লভ, প্রহরী, সিরাজ, মোহনলাল, নর্তকী, বাদকগণ।]

(পৌঢ়া বেগম জাঁকজমকপূর্ণ জলসার সাজে সজ্জিতা। আসরে উপস্থিত রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, বাদক এবং নর্তকী। সুসজ্জিত খানসামা তাম্বুল এবং তাম্রকূট পরিবেশন করছে। একজন বিচিত্রবেশী অতিথির সঙ্গে আসরে প্রবেশ করল উমিচাঁদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক পর্যায়ের নাচ শেষ হলো। সকলের হাততালি।)

ঘসেটি : বসুন, উমিচাঁদজি। সঙ্গের মেহমানটি আমাদের অচেনা বলেই মনে হচ্ছে।

উমিচাঁদ : (যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে) মাফ করবেন বেগম সাহেবা, ইনি একজন জবরদস্ত শিল্পী। আমার সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় কিন্তু তাতেই আমি এঁর কেরামতিতে একেবারে মুগ্ধ। আজকের জলসা সরগরম করে তুলতে পারবেন আশা করে এঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

রাজবল্লভ : তাহলেও এখানে একজন অপরিচিত মেহমান–

উমিচাঁদ : না, না, সে সব কিছু ভাবতে হবে না। দরিদ্র শিল্পী, পেটের ধান্দায় আসরে জলসায় কেরামতি দেখিয়ে বেড়ান।

জগৎশেঠ : তাহলে আরম্ভ করুন ওস্তাদজি। দেখি নাচওয়ালিদের ঘুঙুর এবং ঘাগরা বাদ দিয়ে আপনার কাজের তারিফ করা যায় কিনা।

(ঘসেটি রাজবল্লভের দৃষ্টি বিনিময়। আগন্তুক আসরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল)

রাজবল্লভ : ওস্তাদজির নামটা–

আগন্তুক : রাইসুল জুহালা।

(সকলের উচ্চহাসি)

রায়দুর্লভ : জাহেলদের রইস। এই নামের গৌরবেই আপনি উমিচাঁদজিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন নাকি?

(আবার সকলের হাসি)

উমিচাঁদ : (ঈষৎ রুষ্ট) আমি তো বেশক জাহেল। তা না হলে আপনারা সরশুদ্ধ দুধ খেয়েও গোঁফ শুকনো রাখেন, আর আমি দুধের হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই হাঁড়ির কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।

ঘসেটি : আপনারা বড় বেশি কথা কাটাকাটি করেন। শুরু করুন, ওস্তাদজি।

রাইসুল জুহালা : য্যায়সা হুকুম। আমি নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদবকায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। আপাতত আমি আপনাদের একটা নাচ দেখাব। পক্ষীকুলের একটি বিশেষ শ্রেণি, ধার্মিক হিসেবে যার জবরদস্ত নাম, সেই পাখির নৃত্যকলা আপনারা দেখবেন। দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এই বিশেষ নৃত্যটি আমি জনপ্রিয় করতে চাই। (তবলচিকে) একটু ঠেকা দিয়ে দিন। (তাল বলে দিল। নৃত্য চলাকালে ঘসেটি এবং রাজবল্লভ নিচুস্বরে পরামর্শ করলেন। পরে উমিচাঁদ এবং রাজবল্লভও কিছু আলোচনা করলেন। নাচ শেষ হলে সকলের হর্ষ প্রকাশ।)

রাজবল্লভ : ওস্তাদজি জবরদস্ত লোক মনে হচ্ছে। ওঁকে আরও কিছু কেরামতি দেখাবার দায়িত্ব দিলে কেমন হয়?

(উমিচাঁদ রাইসুল জুহালাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিছু বলল। তারপর নিজের আসনে ফিরে এল)

উমিচাঁদ : উনি রাজি আছেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে কলাকৌশল দেখাবার ফাঁকে ফাঁকে দু-চারখানা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতে ওঁর আপত্তি নেই।

রাজবল্লভ : তাহলে এখন ওঁকে বিদায় দিন। পরে দরকার মতো কাজে লাগানো হবে।

রাইসুল জুহালা: বহোত আচ্ছা, হুজুর।

(সবাইকে সালাম করে কালোয়াতি করতে করতে বেরিয়ে গেল)

ঘসেটি : তাহলে আবার নাচ শুরু হোক?

রাজবল্লভ : আমার মনে হয় নাচওয়ালিদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে কাজের কথা সেরে নেওয়াই ভালো।

ঘসেটি : তাই হোক।

(ইঙ্গিত করতেই দলবলসহ নাচওয়ালিদের প্রস্থান)

রায়দুর্লভ : বেগম সাহেবাই আরম্ভ করুন।

ঘসেটি : আপনারা তো সব জানেন। এখন খোলাখুলিভাবে যার যা বলার আছে বলুন।

জগৎশেঠ : সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে শওকতজঙ্গকে আমরা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েই দিয়েছি। কিন্তু শওকতজঙ্গ নবাব হলে আমি কি পাব তা আমাকে পরিষ্কার করে বলুন।

ঘসেটি : শওকতজঙ্গ আপনাদেরই ছেলে। সে নবাবি পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।

রায়দুর্লভ : এটা কোনো কথা হলো না। যিনি নবাব হবেন–

জগৎশেঠ : আমার কথা আগে শেষ হোক দুর্লভরাম।

রায়দুর্লভ : বেশ, আপনার কথাই শেষ করুন। কিন্তু মনে রাখবেন কথা শেষ হবার পর আর কোনো কথা উঠবে না।

জগৎশেঠ : সে আবার কী কথা?

রাজবল্লভ : আপনারা তর্কের ভেতর যাচ্ছেন আলোচনা শুরু করার আগেই। খুব সংক্ষেপে কথা শেষ করা দরকার। বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের আলোচনা দীর্ঘ করা বিপজ্জনক।

জগৎশেঠ : কথা ঠিক। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে যাওয়াটাও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মাফ করবেন বেগম সাহেবা, আমি খোলাখুলি বলছি। অঙ্গীকার করে লাভ নেই যে, শওকতজঙ্গ নিতান্তই অকর্মণ্য। ভাংয়ের গেলাস এবং নাচওয়ালি ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। কাজেই শওকতজঙ্গ নবাব হবে নামমাত্র। আসল কর্তৃত্ব থাকবে বেগম সাহেবার এবং পরোক্ষে তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন রাজবল্লভ।

রায়দুর্লভ : ঠিক এই ধরনের একটা সম্ভাবনার উল্লেখ করার ফলেই হোসেন কুলি খাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

জগৎশেঠ : আমি তা বলছিনে। তা ছাড়া এখানে সে কথা অবান্তর। আমি বলতে চাইছি যে, শওকতজঙ্গ নবাবি পেলে বেগম সাহেবা এবং রাজা রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিঘ্ন হবে আমাদের তেমন আশা নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে নগদ কারবারই ভালো।

ঘসেটি : ধনকুবের জগৎশেঠকে নগদ অর্থ দিতে হলে শওকতজঙ্গের যুদ্ধের খরচ চলবে কী করে?

জগৎশেঠ : না, না, আমি নগদ টাকা চাইছিনে। যুদ্ধের খরচ বাবদ টাকা আমি দেব, অবশ্য আমার যা সাধ্য। কিন্তু আসল এবং লাভ মিলিয়ে আমাকে একটা কর্জনামা সই করে দিলেই আমি নিশ্চিত হতে পারি।

রায়দুর্লভ : আমাকেও পদাধিকারের একটা একরারনামা সই করে দিতে হবে।

(প্রহরীর প্রবেশে। ঘসেটি বেগমের হাতে পত্র দান)

ঘসেটি : (চিঠি খুলতে খুলতে) সিপাহসালার মিরজাফরের পত্র। (পড়তে পড়তে) তিনি শওকতজঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিয়েছেন।

রাজবল্লভ : বহোত খুব।

উমিচাঁদ : আমার তো কোনো বিষয়ে কোনো দাবি দাওয়া নেই, আমি সকলের খাদেম। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাই নিই। কাজেই এতক্ষণ আমি চুপ করেই আছি।

ঘসেটি : আপনারও যদি কিছু বলার থাকে এখুনি বলে ফেলুন।

উমিচাঁদ : নিজের সম্বন্ধে কিছু নয়। তবে সিপাহসালারের প্রস্তুতি আমার পছন্দ হয়েছে তাই বলছি। ইংরেজরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সিরাজউদ্দৌলার পতনই তাদের কাম্য। শওকতজঙ্গ এখুনি যদি আঘাত হানতে পারেন, তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবেন। ফলে জয় তাঁর অবধারিত।

ঘসেটি : সিরাজের পতন কে না চায়?

উমিচাঁদ : অন্তত আমরা চাই। কারণ সিরাজউদ্দৌলা নবাবিতে নির্বিঘ্ন হতে পারলে আমাদের সকলের স্বার্থই রাহুগ্রস্ত হবে।

ঘসেটি : সিরাজ সম্বন্ধে উমিচাঁদের বড় বেশি আশঙ্কা।

উমিচাঁদ : কিছুমাত্র নয় বেগম সাহেবা। দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দওলতের পূজারী। তা না হলে সিরাজউদ্দৌলাকে বাতিল করে শওকতজঙ্গকে চাইব কেন? আমি কাজ কতদূর এগিয়ে এসেছি এই দেখুন তার প্রমাণ।

(পকেট থেকে চিঠি বার করে ঘসেটি বেগমের হাতে দিল)

ঘসেটি : (চিঠির নিচে স্বাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে) এ যে ড্রেক সাহেবের চিঠি!

উমিচাঁদ : আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে তিনি জবাব দিয়েছেন।

ঘসেটি : (পত্র পড়তে পড়তে) লিখেছেন শওকতজঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সেনাপতিদের অধীনস্থ ফৌজ যেন রাজধানী আক্রমণ করে। তাহলে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

রাজবল্লভ : আমাদের বন্ধু সিপাহসালার মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খান ইচ্ছে করলেই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

(হঠাৎ বাইরে তুমুল কোলাহল। সকলেই সচকিত। ঘসেটি বেগম কোলাহলের কারণ জানবার জন্যে যেতেই রাজবল্লভ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নাচওয়ালিদের ডেকে পাঠালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা সদলবলে কামরায় এল।)

রাজবল্লভ : আরম্ভ কর জলদি। (ঘুঙুরের আওয়াজ উঠবার পর পরই সবেগে কামরায় ঢুকলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। পেছনে মোহনলাল। সবাই তড়িৎ-বেগে দাঁড়ালো। নাচওয়ালিদের নাচ থেমে গেল।)

ঘসেটি : (ভীতিরুদ্ধ কণ্ঠে) নবাব!

সিরাজ : কী ব্যাপার খালাআম্মা, বড় ভারী জলসা বসিয়েছেন?

ঘসেটি : (আত্মস্থ হয়ে) এ রকম জলসা এই নতুন নয়।

সিরাজ : তা নয়, তবে বাংলাদেশের সেরা লোকেরাই শুধু শামিল হয়েছেন বলে জলসার রোশনাই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ঘসেটি : নবাব কি নাচগানের মজলিস মানা করে দিয়েছেন?

সিরাজ : নাচগানের মহফিলের জন্যে দেউড়িতে কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছেন খালাআম্মা। তারা তো আমার ওপরে গুলিই চালিয়ে দিয়েছিল প্রায়। দেহরক্ষী ফৌজ সঙ্গে না থাকলে এই জলসায় এতক্ষণে মর্সিয়া শুরু করতে হতো।

(হঠাৎ কণ্ঠস্বরে অবিচল তীব্রতা ঢেলে)

রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, আপনারা এখন যেতে পারেন। মতিঝিলের জলসা আমি চিরকালের মতো ভেঙে দিলাম। (ঘসেটি বেগমকে) তৈরি হয়ে নিন, খালাআম্মার পক্ষে প্রাসাদের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।

ঘসেটি : (রোষে চিৎকার করে) তুমি আমাকে বন্দি করে নিয়ে যেতে এসেছ? তোমার এতখানি স্পর্ধা?

সিরাজ : এতে ক্রুদ্ধ হবার কি আছে? আম্মা আছেন, আপনিও তাঁর সঙ্গেই প্রাসাদে থাকবেন।

ঘসেটি : মতিঝিল ছেড়ে আমি এক পা নড়ব না। তোমার প্রাসাদে যাব? তোমার প্রাসাদ বাজ পড়ে খান খান হয়ে যাবে। (সহসা কাঁদতে আরম্ভ করলেন)

সিরাজ : (অবিচলিত) তৈরি হয়ে নিন, খালাআম্মা। আপনাকে আমি নিয়ে যাব।

ঘসেটি : (মাতম করতে করতে) রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, বিধবার ওপরে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনারা কিছুই করতে পারছেন না?

রাজবল্লভ : (একটু ইতস্তত করে) জাঁহাপনা কি সত্যিই–

সিরাজ : (উত্তপ্ত) আপনাদের চলে যেতে বলেছি রাজা রাজবল্লভ। নবাবের হুকুম অমান্য করা রাজদ্রোহিতার শামিল। আশা করি অপ্রিয় ঘটনার ভেতর দিয়ে তা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।

(রাজবল্লভ প্রভৃতি প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ, শুনুন রায়দুর্লভ, শওকতজঙ্গকে আমি বিদ্রোহী ঘোষণা করেছি। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। আপনি তৈরি থাকবেন। প্রয়োজন হলে আপনাকেও মোহনলালের অনুগামী হতে হবে।

রায়দুর্লভ : হুকুম, জাঁহাপনা। (তারা নিষ্ক্রান্ত হলো। ঘসেটি বেগম হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন।)

সিরাজ : মোহনলাল আপনাকে নিয়ে আসবে, খালাআম্মা। আপনার কোনো রকম অমর্যাদা হবে না।

(বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন)

ঘসেটি : তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে, সিরাজ। নবাবি? নবাবি করতে হবে না বেশিদিন। কেয়ামত নাজেল হবে। আমি তা দেখব-দেখব।

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১০ই মার্চ। স্থান : নবাবের দরবার ।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-নকিব, সিরাজ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উৎপীড়িত ব্যক্তি, প্রহরী, ওয়াটস, মোহনলাল ।]

(দরবারে উপস্থিত– মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়াটস। মোহনলাল, মিরমর্দান, সাঁফ্রে অস্ত্রসজ্জিত বেশে দণ্ডায়মান। নকিবের কণ্ঠে দরবারে নবাবের আগমন ঘোষিত হলো।)

নকিব : নবাব মনসুর-উল-মুলুক সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলি খাঁ মির্জা মুহম্মদ হায়বতজঙ্গ বাহাদুর। বা-আদাব আগাহ বাশেদ।

(সবাই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। দৃঢ় পদক্ষেপে নবাব ঢুকলেন। সবাই নতশিরে শ্রদ্ধা জানালো।)

সিরাজ : (সিংহাসনে আসীন হয়ে) আজকের এই দরবারে আপনাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে কয়েকটি জরুরি বিষয়ের মীমাংসার জন্যে।

রাজবল্লভ : বে-আদবি মাফ করবেন জাঁহাপনা। দরবারে এ পর্যন্ত তেমন কোনো জরুরি বিষয়ের মীমাংসা হয়নি। তাই আমরা তেমন–

সিরাজ : গুরুতর কোনো বিষয়ের মীমাংসা হয়নি এই জন্যে যে, গুরুতর কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সিপাহসালার মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। আমার পথ বিঘ্নসঙ্কুল হয়ে উঠবে না। অন্তত নবাব আলিবর্দির অনুরাগভাজনদের কাছ থেকে আমি তাই আশা করেছিলাম।

মিরজাফর : জাঁহাপনা কি আমাদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?

সিরাজ : আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোনো বাসনা আমার নেই। আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা। বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্থী।

জগৎশেঠ : আপনার অপরাধ!

সিরাজ : পরিহাস বলে মনে হচ্ছে শেঠজি? চেয়ে দেখুন এই লোকটার দিকে (ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী একজন হতশ্রী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল)

রায়দুর্লভ : একি! এর এই অবস্থা কে করলে? (তরবারি নিষ্কাশন)

সিরাজ : তরবারি কোষাবদ্ধ করুন রায়দুর্লভ! এর এই অবস্থার জন্যে দায়ী সিরাজের দুর্বল শাসন।

উৎপীড়িত ব্যক্তি : আমাকে শেষ করে দিয়েছে হুজুর।

মিরজাফর : আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না, জাঁহাপনা।

উৎপীড়িত ব্যক্তি : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।

(ক্রন্দন)

সিরাজ : (সিংহাসনের হাতলে ঘুষি মেরে) কেঁদোনা। শুকনো খট্‌খটে গলায় বলো আর কি হয়েছে। আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।

উৎপীড়িত ব্যক্তি : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষণ্ডা ষণ্ডা পাঁচজনে মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে– ওহ্ হো হো (কান্না)– আমি দেখতে চাইনি। কিন্তু চোখ বুজলেই– ওদের আর একজন আমার নখের ভেতরে খেজুরকাঁটা ফুটিয়েছে। আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হুজুর। (কান্নায় ভেঙে পড়ল)

সিরাজ : (হঠাৎ আসন ত্যাগ করে ওয়াটসের কাছে গিয়ে প্রবল কণ্ঠে) ওয়াটস!

ওয়াটস : (ভয়ে বিবর্ণ) ইওর এক্সিলেন্সি

সিরাজ : আমার নিরীহ প্রজাটির এই দুরাবস্থার জন্যে কে দায়ী?

ওয়াটস : হাউ ক্যান আই নো দ্যাট, ইওর এক্সিলেন্সি?

সিরাজ : তুমি কী করে জানবে? তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমার কাছে পৌছায় না ভেবেছ? কুঠিয়াল ইংরেজরা এমনি করে দৈনিক কতগুলো নিরীহ প্রজার ওপর অত্যাচার করে তার হিসেব দাও।

ওয়াটস : আপনি আমায় অপমান করছেন ইওর এক্সিলেন্সি। দেশের কোথায় কী হচ্ছে সে কৈফিয়ত আমি দেবো কী করে? আমি তো আপনার দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধি।

সিরাজ : তুমি প্রতিনিধি? ড্রেক এবং তোমার পরিচয় আমি জানিনে ভেবেছ? দুশ্চরিত্রতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত না করে ভারতে বাণিজ্যের জন্যে তোমাদের পাঠানো হয়েছে। তাই এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ করতে পারনি। কৈফিয়ত দাও আমার নিরীহ প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন?

ওয়াটস : আপনার প্রজাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক। আমরা ট্যাক্স দিয়ে শান্তিতে বাণিজ্য করি।

সিরাজ : ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য কর বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকার তোমরা পাওনি।

(সমবেত সকলকে উদ্দেশ করে)

এই লোকটি লবণ প্রস্তুতকারক। লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংরেজ। স্থানীয় লোকদের তৈরি যাবতীয় লবণ তারা তিন চার আনা মণ দরে পাইকারি হিসেবে কিনে নেয়। তারপর এখানে বসেই এখানকার লোকের কাছে সেই লবণ বিক্রি করে দুটাকা আড়াই টাকা মণ দরে।

মিরজাফর : এ তো ডাকাতি।

সিরাজ : আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানিকে লবণের ইজারাদারি দিয়েছি। আপনারা আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাজস্বের পরিমাণ বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড মজবুত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই কি তার প্রমাণ? এই লোকটি কুঠিয়াল ইংরেজদের কাছে পাইকারি দরে লবণ বিক্রি করতে চায়নি বলে তার এই অবস্থা। বলুন শেঠজি, বলুন রাজবল্লভ, ব্যক্তিগত অর্থলালসায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আমি এই কুঠিয়ালদের প্রশ্রয় দিয়েছি কি–না? বলুন সিপাহসালার, বলুন রায়দুর্লভ, আমি এই অনাচারীদের বিরুদ্ধে শাসন-শক্তি প্রয়োগ করবার সদিচ্ছা দেখিয়েছি কি-না? বিচার করুন। আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।

(প্রহরী উৎপীড়িত লোকটিকে বাইরে নিয়ে গেল)

রাজবল্লভ : জাঁহাপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে এমন সুচিন্তিত পরিকল্পনায় আমাদের অপমান না করলেও চলত।

জগৎশেঠ : নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোনো মূল্যই নেই। তাই–

সিরাজ : আপনারাও সবাই মিলে নবাবের মর্যাদা যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে দিতে চান, এই তো?

মিরজাফর : একথা বলে নবাব আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে চাইছেন। এই অযথা দুর্ব্যবহার আমরা হৃষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারব কি না সন্দেহ।

সিরাজ : বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার? দরবারে বসে নবাবের সঙ্গে কী রকম আচরণ করা বিধেয় তা-ও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি। আপনি, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ সবাইকে কয়েদখানায় আটক রাখতে পারি। হ্যাঁ, কোনো দুর্বলতা নয়। শত্রুর কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে। মোহনলাল!

(মোহনলাল তরবারি নিষ্কাশন করল)

সিরাজ : (হাতের ইঙ্গিতে মোহনলালকে নিরস্ত করে শান্তভাবে) না, আমি তা করব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌলিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ সন্দেহেরও কোনো অবকাশ রাখব না।

মিরজাফর : আমাদের প্রতি নবাবের সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠব।

সিরাজ : ওই একটি পথ সিপাহসালার–দেশের কল্যাণ, দেশবাসীর কল্যাণ। শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি। আমি জানতে চাই, সেই পথে আপনারা আমার সহযাত্রী হবেন কি না?

রাজবল্লভ : জাঁহাপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা দরকার।

সিরাজ : আমার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। কলকাতায় ওয়াটস এবং ক্লাইভ আলিনগরের সন্ধি খেলাপ করে, আমার আদেশের বিরুদ্ধে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখুনি এর প্রতিবিধান করতে না পারলে ওরা একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, হস্তক্ষেপ করবে।

মিরজাফর : জাঁহাপনা, আমাদের হুকুম করুন।

সিরাজ : আমি অন্তহীন সন্দেহ-বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। তবু বলছি– আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যতই দুর্বহ হোক একাই তা বইবার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

মিরজাফর : দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

সিরাজ : আমি জানতাম দেশের প্রয়োজনকে আপনারা কখনো তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না।

(সিরাজের ইঙ্গিতে প্রহরী তাঁর হাতে কোরান শরিফ দিল। সিরাজ দুহাতে সেটা নিয়ে চুমু খেয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিলেন। মিরজাফর নতজানু হয়ে দুহাতে কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন।)

মিরজাফর : আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

(সিরাজ প্রহরীর হাতে কোরান শরিফ সমর্পণ করলেন এবং অপর প্রহরীর হাত থেকে তামা, তুলসী, গঙ্গাজলের পাত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে একে একে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ নিজের নিজের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে গেলেন।)

রাজবল্লভ : আমি রাজবল্লভ, তামাতুলসী, গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

রায়দুর্লভ : ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আমি নবাবের অনুগামী।

উমিচাঁদ : রামজিকি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।

(প্রহরী গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে চলে গেল।)

সিরাজ : (ওয়াটসকে) ওয়াটস।

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি।

সিরাজ : আলিনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে দরবারে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেই সম্মানের অপব্যবহার করে এখানে বসে তুমি গুপ্তচরের কাজ করছ। তোমাকে সাজা না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে যাও দরবার থেকে। ক্লাইভ আর ওয়াটসকে গিয়ে সংবাদ দাও যে, তাদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেইমান নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে তারা চন্দননগর ধ্বংস করেছে। এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি তাদের যথাযোগ্য ভাবেই দেওয়া হবে।

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি।

(কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল)

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১৯এ মে। স্থান : মিরজাফরের আবাস।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-জগৎশেঠ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রাইসুল, প্রহরী।]

(মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত–মিরজাফর, রাজবল্লভ, রাজদুর্লভ, জগৎশেঠ)

জগৎশেঠ : সিপাহসালার বড় বেশি হতাশ হয়েছেন।

মিরজাফর : না শেঠজি, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিস্তব্ধ হয়েছি অগ্নিগিরির মতো প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষার আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে। এবার আমি আঘাত হানবই।

রাজবল্লভ : শুধু অপমান! প্রাণের আশঙ্কায় সে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলেনি? পদস্থ কেউ হলে মানীর মর্যাদা বুঝত। কিন্তু মোহনলালের মতো সামান্য একটা সিপাই যখন তলোয়ার খুলে সামনে দাঁড়াল তখন আমার চোখে কেয়ামতের ছবি ভেসে উঠেছিল।

রায়দুর্লভ : সিপাহসালারের অপমানটাই আমার বেশি বেজেছে।

মিরজাফর : এখন আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পারছেন যে, সিরাজ আমাদের শাস্তি দেবে না।

জগৎশেঠ : তা দেবে না। চতুর্দিকে বিপদ, তা সত্ত্বেও সে আমাদের বন্দি করতে চায়। এরপর সিংহাসনে স্থির হতে পারলে তো কথাই নেই।

রাজবল্লভ : আমাদের অস্তিত্বই সে লোপ করে দেবে। আমাদের সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহ নবাবের বাইরের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পায়নি তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। শওকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাব আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু মোহনলালের অধীনে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে বিনাশ করেছে। এতে আমাদের নিশ্চিত হবার কিছুই নেই।

জগৎশেঠ : তার প্রমাণ তো রয়েছে হাতের কাছে। আমাদের গ্রেফতার করতে গিয়েও করেনি। কিন্তু রাজা মানিকচাঁদকে তো ছাড়ল না। তাকে কয়েদখানায় যেতে হলো। শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি নন্দকুমারের অদৃষ্টেও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

মিরজাফর : আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।

রাজবল্লভ : আমি ভাবছি তেমন দুঃসময় যদি আসে, আর মূল্য দিয়ে মুক্তি কিনবার পথটাও যদি খোলা থাকে, তা হলেও সে মূল্যের পরিমাণ এত বিপুল হবে যে আমরা তা বইতে পারব কিনা সন্দেহ। মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।

জগৎশেঠ : ওরে বাবা! তার চেয়ে গলায় পা দিয়ে বুকের ভেতর থেকে কলজেটাই টেনে বার করে আনুক। পঞ্চাশ কোটি? আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করলেও এক কোটি টাকা হবে না। ধরতে গেলে মাসের খরচটাই তো ওঠে না। নবাবের হাত থেকে ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্যে মাসে মাসে অজস্র টাকা খরচ করে সেনাপতি ইয়ার লুৎফ খাঁয়ের অধীনে দুহাজার অশ্বারোহী পুষতে হচ্ছে।

মিরজাফর : কাজেই আর কালক্ষেপ নয়।

রাজবল্লভ : আমরা প্রস্তুত। কর্মপন্থা আপনিই নির্দেশ করুন। আমরা একবাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।

মিরজাফর : আমার ওপরে আপনাদের আন্তরিক ভরসা আছে তা আমি জানি। তবু আজ একটা বিষয় খোলাসা করে নেওয়া উচিত। আজ আমরা সবাই সন্দেহ-দোলায় দুলছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিনে। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত কাগজে-কলমে পাকাপাকি করে নেওয়াই আমার প্রস্তাব।

জগৎশেঠ : আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

রায়দুর্লভ : এতে আপত্তির কি থাকতে পারে?

(নেপথ্যে কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে : ওরে বাবা কতবার দেখতে হবে? দেউড়ি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মোট একুশবার দেখিয়েছি। এই দেখ বাবা, আর একটিবার দেখ। হলো তো?

(রাইসুল জুহালা কামরায় ঢুকল)

কী গেরোরে বাবা।

মিরজাফর : কী হয়েছে?

রাইস : সালাম হুজুর। ওই পাহারাওয়ালা হুজুর। সবাই হাত বাড়িয়ে আঙুল নাচিয়ে বলে, দেখলাও। দেরি করলে তলোয়ারে হাত দেয়। আমি বলি, আছে বাবা, আছে। খোদ নবাবের পাঞ্জা–

মিরজাফর : (সন্ত্রস্ত) নবাবের পাঞ্জা?

রাইস : আলবত হুজুর। কেন নয়? (আবার কুর্নিশ করে) হুজুরের নবাব হতে আর বাকি কি?

মিরজাফর : (প্রসন্ন হাসি হেসে) সে যাক! খবর কি তাই বলো!

রাইস : প্রায় শেষ খবর নিয়ে এসেছিলাম হুজুর। তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। একেবারে গর্দান সমেত–

রাজবল্লভ : (বিরক্ত) আবোল তাবোল বকে বড় বেশি সময় নষ্ট করছ রাইস মিয়া।

রাইস : (ক্ষুব্ধ) আবোল তাবোল কি হুজুর, বলছি তো তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। লাফিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তাই রক্ষে। তবু এই দেখুন (পকেট থেকে দ্বিখণ্ডিত মূলার নিম্নাংশ বার করল।) একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাব বলে মুলোটা হাতে নিয়েই ঘুরছিলাম। ক্লাইভ সাহেবের তলোয়ারের কোপে সেটাই দুখণ্ড।

জগৎশেঠ : এ যে দেখি ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো করে তুলছে। ক্লাইভ সাহেব তোমাকে তলোয়ারের কোপ মারতে গেল কেন?

রাইস : গেরো হুজুর। কপালের গেরো। উমিচাঁদজির চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি চিঠি না পড়ে কটমট করে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর ওঁর কামানের মতো গলা দিয়ে একতাল কথার গোলা ছুটে বার হলো : আর ইউ এ স্পাই? এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নই বাংলায়–তুমি গুপ্তচর? এমন এক অদ্ভুত উচ্চরণ করলেন, আমি শুনলাম তুমি ঘুফুৎচোর? চোর কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল। তা ছাড়া ঘুফুৎচোর? গামছা চোর, বদনা চোর,

জুতো চোর, গরু চোর, সিঁধেল চোর, কাফন চোর আমাদের আপনাদের ভেতরে হুজুর কত রকমারি চোরের নাম যে শুনেছি আর তাদের চেহারা চিনেছি তার আর হিসাব নেই। কিন্তু ঘুফুৎচোর আর আমি স্বয়ং। হিতাহিত বিচার না করেই হুজুর মুখের ওপরেই বলে ফেললাম, –(মৃদু হাসি) একটু ইংরেজিও তো জানি, ইংরেজিতেই বললাম, ইউ শাট আপ। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের এক কোপ। (হেসে উঠে) অহংকার করব না হুজুর, লাফটা যা দিয়েছিলাম একবারে মাপা। তাই আমার গর্দানের বদলে ক্লাইভ সাহেবের ভাগ্যে জুটছে মুলোর মাথাটা।

মিরজাফর : কথা থামাবে রাইস মিয়া।

রাইস : হুজুর।

মিরজাফর : এখন তুমি কার কাছ থেকে আসছ?

রাইস : উমিচাঁদজির কাছ থেকে। এই যে চিঠি। (পত্র দিল)

মিরজাফর : (পত্র পড়ে রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিলেন) ক্লাইভ সাহেবের ওখানে কাকে দেখলে?

রাইস : অনেকগুলো সাহেব মেমসাহেব হুজুর। ভূত ভূত চেহারা সব।

মিরজাফর : কারো নাম জানো না?

রাইস : সবতো বিদেশি নাম। এদেশি হলে পুরুষগুলোকে বলা যেত– বেম্মোদত্যি, জটাধারী, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো, গলায় দড়ে, এক ঠেংগে, কন্দকাটা ইত্যাদি। মেয়েগুলোকে বলতে পারতাম: শাঁকচুন্নি, উলকামুখী, আঁষটেপেতি, কানি পিশাচী এই সব আর কি।

জগৎশেঠ : রাইস মিয়ার মুখে কথার খই ফুটছে।

রাইস : রাত-বেরাতে চলাফেরা করি ভূত পেত্নীর সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হুজুর। (চিঠিখানা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ এবং রায়দুর্লভের হাত ঘুরে আবার মিরজাফরের হাতে এল)

মিরজাফর : একে তাহলে বিদায় দেওয়া যাক?

রাজবল্লভ : চিঠির জবাব দেবেন না?

মিরজাফর : চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভালো কে জানে কোথায় সিরাজের গুপ্তচর ওৎ পেতে বসে আছে।

জগৎশেঠ : তাছাড়া আমাদের গুপ্তচরদেরই বা বিশ্বাস কি? তারা মূল চিঠি হয়ত আসল জায়গায় পৌঁছচ্ছে; কিন্তু একখানা করে তার নকল যথাসময়ে নবাবের লোকের হাতে পাচার করে দিচ্ছে।

রাইস : সন্দেহ করাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখবেন হুজুর, গুপ্তচররাও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তাদের বিপদের ঝুঁকিও কম নয়।

জগৎশেঠ : কিছু মনে কোরো না। তোমার সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করিনি।

মিরজাফর : তুমি তাহলে এখন এস। উমিচাঁদজিকে আমার এই সাংকেতিক মোহরটা দিও। তাহলেই তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। তাঁকে বোলো, দুইনম্বর জায়গায় আগামী মাসের ৮ তারিখে সব কিছু লেখাপড়া হবে।

রাইস : হুজুর। (সাংকেতিক মোহরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল)

মিরজাফর : রাইসুল জুহালা খুবই চালাক। সে উমিচাঁদের বিশ্বাসী লোক। ওর সামনে শেঠজির ওকথা বলা ঠিক হয়নি।

জগৎশেঠ : আমি শুধু বলেছি কি হতে পারে।

মিরজাফর : কত কিছুই হতে পারে শেঠজি। আমরাই কি দিনকে রাত করে তুলছিনে? নবাবের মির মুন্সি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে। তাতেই তো ওদের এত সহজে ক্ষেপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধিটা অবশ্য রাজবল্লভের; কিন্তু ভাবুন তো কতখানি দায়িত্ব এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে নবাবের বিশ্বাসী মির মুন্সি।

জগৎশেঠ : তা তো বটেই। গুপ্তচরের সহায়তা ছাড়া আমরা এক পা-ও এগোতে পারতাম না।

মিরজাফর : প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমি ভাবছি ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কি-না?

রাজবল্লভ : তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা বেনিয়ার জাত। পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। ওরা জানে সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে কোনো রকম সুবিধার আশা নেই। কাজেই সিপাহসালারকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে ওরা সব রকমের সাহায্য দেবে।

জগৎশেঠ : অবশ্য টাকা ছাড়া। কারণ সিরাজকে গদিচ্যুত করা ওদের প্রয়োজন হলেও সিপাহসালারকে ওরা সাহায্য দেবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে।

রাজবল্লভ : সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কি না তা তো বুঝতে পারছিনে। আমি যতদূর শুনেছি ওদের দাবি দুইকোটি টাকার ওপরে যাবে। কিন্তু এত টাকা সিরাজউদ্দৌলার তহবিল থেকে কোনোক্রমেই পাওয়া যাবে না।

মিরজাফর : আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবল্লভ। ও কথা আর এখন ভাবলে চলবে না। সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবি মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। (বিভোর কণ্ঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ-নবাব আলিবর্দির আমলে, উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন, মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ৯ই জুন। স্থান : মিরনের আবাস।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-নর্তকীগণ, বাদকগণ, মিরন, পরিচারিকা, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ওয়াটস, ক্লাইভ, রক্ষী, মোহনলাল।]

(ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত মিরন। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকীর হাতে ডান হাত সমর্পিত। অপর নর্তকী নৃত্যরতা। নৃত্যের মাঝে মাঝে সুরামত্ত মিরনের উল্লাসধ্বনি।)

মিরন : সাবাস। বহোত খুব। তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।

(নর্তকী নাচের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল মিরনের দিকে। পরিচারিকা কামরায় এসে চিঠি দিল মিরনের হাতে। সেটা পড়ে বিরক্ত হলো মিরন। তবু পরিচারিকাকে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করতেই সে বেরিয়ে গেল। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকী মিরনের ইঙ্গিতে কামরার অন্যদিকে চলে গেল। অল্প পরেই ছদ্মবেশধারী এক ব্যক্তিকে কামরায় পৌঁছিয়ে দিয়ে পরিচারিকা চলে গেল।)

মিরন : সেনাপতি রায়দুর্লভ এ সময়ে এখানে আসবেন তা ভাবিনি।

(নর্তকীদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল)

রায়দুর্লভ : আমাকে আপনি নৃত্যগীতের সুধারসে একেবারে নিরাসক্ত বলেই ধরে নিয়েছেন।

মিরন : তা নয়, তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তখনি বুঝেছি প্রয়োজন জরুরি। তাই সময় নষ্ট করতে চাইলুম না।

রায়দুর্লভ : দুদণ্ড সময় নষ্ট করে একটু আমোদ-প্রমোদই না হয় হতো। অহরহ অশান্তি আর অব্যবস্থার মধ্য থেকে জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু (একজনকে দেখিয়ে) এ নর্তকীকে আপনি পেলেন কোথায়? একে যেন এর আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সে যাক। হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন? তা-ও খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে।

মিরন : আমার এখানে না করে উপায় কি? মোহনলালের গুপ্তচর জীবন অসম্ভব করে তুলেছে। আমার বাসগৃহ অনেকটা নিরাপদ। কারণ মোহনলাল জানে যে, আমি নাচ-গানে মশগুল থাকতেই ভালোবাসি।

রায়দুর্লভ : কে কে আসছেন এখানে?

মিরন : প্রয়োজনীয় সবাই। তাছাড়া বাইরে থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসবেন কোম্পানির প্রতিনিধি কেউ একজন।

রায়দুর্লভ : কোম্পানির প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এখানে আসছেন?

মিরন : তিনি আসবেন কাশিমবাজার থেকে।

রায়দুর্লভ : সে যা হোক। আলোচনায় আমি থাকতে পারব না। কারণ আমার পক্ষে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কখন কি কাজে নবাব তলব করে বসবেন তার ঠিক নেই। তলবের সঙ্গে সঙ্গে হাজির না পেলে তখুনি সন্দেহ জমে উঠবে। আপনার কাছে তাই আগেভাগে এলাম শুধু আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হলো জানবার জন্যে।

মিরন : আপনার ব্যবস্থা তো পাকা। সিরাজের পতন হলে আব্বা হবেন মসনদের মালিক। কাজেই সিপাহসালার-এর পদ আপনার জন্যে একেবারে নির্দিষ্ট।

রায়দুর্লভ : আমার দাবিও তাই। তবে আর একটা কথা। চারিদিককার অবস্থা দেখে যদি বুঝি যে, আপনাদের সাফল্যের কোনো আশা নেই, তাহলে কিন্তু আমার সহায়তা আপনারা আশা করবেন না?

মিরন : (ঈষৎ বিস্মিত) কি ব্যাপার? আপনাকে যেন কিছুটা আতঙ্কিত মনে হচ্ছে।

রায়দুর্লভ : আতঙ্কিত নই। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র। এর ভেতরে কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : মেহমান।

রায়দুর্লভ : আমি সরে পড়ি।

মিরন : বসেই যান না। মেহমানরা এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই বৈঠক শুরু হয়ে যাবে।

রায়দুর্লভ : না। আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। আমি পালাই। কিন্তু আমার সঙ্গে যে ওয়াদা তার যেন খেলাপ না হয়। (প্রস্থান)

(পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করে মিরন কিছুটা প্রস্তুত হয়ে বসল। মিরন সমাদর করে তাদের বসাল।)

মিরন : একটু আগে রায়দুর্লভ এসেছিলেন ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না বললেন। কিন্তু তাঁর দাবির কথাটা আমার কাছে তিনি খোলাখুলিই জানিয়ে গেছেন।

জগৎশেঠ : তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদ দিতে হবে এই তো?

রাজবল্লভ : সবাই উচ্চাভিলাষী। সবাই সুযোগ খুঁজছে। তা না হলে রায়দুর্লভ মাসে মাসে আমার কাছ থেকে যে বেতন পাচ্ছে তাতেই তার স্বর্গ হাতে পাবার কথা।

মিরজাফর : ও সব কথা থাক রাজা। সবাই একজোটে কাজ করতে হবে। সকলের দাবিই মানতে হবে। রায়দুর্লভ ক্ষুদ্র শক্তিধর। তার সাহায্যেই আমরা জিতব এমন কথা নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব আছে বৈ কি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : জানানা সওয়ারি।

(সবাই একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। মিরজাফর হঠাৎ পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বের করে তাতে মন দিলেন। মিরন লজ্জিত। হঠাৎ আত্মসংবরণ করে ধমকে উঠল)

মিরন : ভাগো হিঁয়াসে, কমবখৎ।

(পরিচারিকার দ্রুত প্রস্থান)

রাজবল্লভ : (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) চট করে দেখে এস। আত্মীয়রাই কেউ হবে হয়ত।

(সুযোগটুকু পেয়ে মিরন তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। অভাবিত পরিবেশ এড়াবার জন্যে জগৎশেঠ নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন)

জগৎশেঠ : আজকের আলোচনায় উমিচাঁদ অনুপস্থিত। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে তো আর কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব নয়।

মিরজাফর : (হঠাৎ যেন পরিবেশের খেই ধরতে পেরেছেন) আরে বাপরে একেবারে কালকেউটে। তার দাবিই তো সকলের আগে। তা না হলে দণ্ড না পেরোতেই সমস্ত খবর পৌঁছে যাবে নবাবের দরবারে। মনে হয় কলকাতায় বসেই সে চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে।

(দুজন মহিলাসহ উল্লসিত মিরন কামরায় ঢুকলো)

মিরন : এঁরাই জানানা সওয়ারি।

(রমণীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন ওয়াটস এবং ক্লাইভ। মিরন বেরিয়ে গেল)

ওয়াটস : সরি টু ডিজাপয়েন্ট ইউ জেন্টেলমেন। আর ইউ সারপ্রাইজড? ইনি রবার্ট ক্লাইভ।

মিরজাফর : (সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে) কর্নেল ক্লাইভ?

ক্লাইভ : আর ইউ সারপ্রাইজড? অবাক হলেন?

মিরজাফর : অবাক হবারই কথা। এ সময়ে এভাবে এখানে আসা খুবই বিপজ্জনক।

ক্লাইভ : বিপদ? কার বিপদ জাফর আলি খান? আপনার না আমার?

মিরজাফর : দুজনেরই। তবে আপনার কিছুটা বেশি।

ক্লাইভ : আমার কোনো বিপদ নেই। তা ছাড়া বিপদ ঘটাবে কে?

জগৎশেঠ : নবাবের গুপ্তচরের হাতে তো পড়নি?

ক্লাইভ : নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

রাজবল্লভ : কেন পারবে না? গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললেই সব হয়ে গেল নাকি! তুমি এখানে একা এসেছ। তোমাকে ধরে বস্তাবন্দি হুলো-বেড়ালের মতো পানাপুকুরে দুচারটে চুবুনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?

ক্লাইভ : আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর হুলো বিজনেজ, বাট আই অ্যাম সিউর নবাব ক্যান কজ নো হার্ম টু আস।

জগৎশেঠ : ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েছো এখনো তার ব্যথা ভোলার কথা নয় এরি ভেতরে—

ক্লাইভ : দেখো শেঠজি, এক আধবার অমন হয়েই থাকে। তা ছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে এখনো যুদ্ধ হয়নি। যখন হবে তখন তোমরাই তার ফল দেখবে।

রাজবল্লভ : সেটা দেখবার আগেই গলাবাজি করছ কেন?

ক্লাইভ : এই জন্যে যে নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই। যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারেন।

রাজবল্লভ : আমরা?

ক্লাইভ : হোয়াই নট? আপনারা সব পারেন। আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়? আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু–

মিরজাফর : এইসব কথার জন্যেই আমরা এখানে হাজির হয়েছি নাকি?

ক্লাইভ : সরি, মিস্টার জাফর আলি খান। হ্যাঁ একটা জরুরি কথা আগেই সেরে নেওয়া যাক। উমিচাঁদ এ-যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক। আমাদের প্লানের কথা সে নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে! কলকাতা অ্যাটাক-এর সময়ে তার যা ক্ষতি হয়েছিল নবাব তা কমপেনসেট করতে চেয়েছেন। স্কাউন্ড্রেলটা আবার এক নতুন অফার নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।

মিরজাফর : আমি শুনেছি সে আরও ত্রিশ লক্ষ টাকা চায়।

ক্লাইভ : এবং তাকে অত টাকা দেবার মতো পজিশন আমাদের নয়। থাকলেও আমরা তা দেবো না। কেন দেবো? হোয়াই? থার্টি লাকস অফ রুপিস ইজ নো জোক।

রাজবল্লভ : কিন্তু উমিচাঁদ যে রকম ধড়িবাজ তাতে সে হয়ত অন্যরকম কিছু ষড়যন্ত্র করতে পারে। আমাদের যাবতীয় গুপ্ত খবর তার জানা।

ক্লাইভ : ডোনট ওরি, রাজা! উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধি রাখে। বাট ক্লাইভ ইজ নো লেস। আমি উমিচাঁদকে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছি।

মিরজাফর : কী রকম?

ক্লাইভ : দুটো দলিল হবে। আসল দলিলে উমিচাঁদের কোনো রেফারেন্স থাকবে না। নকল দলিলে লেখা থাকবে যে নবাব হেরে গেলে কোম্পানি উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।

রাজবল্লভ : কিন্তু সে যদি কোনো রকমে এ কথা জানতে পারে?

ক্লাইভ : আপনারা না জানালে জানবে না। আর জানলে কারও বুঝতে বাকি থাকবে না যে, আপনারাই তা জানিয়েছেন।

জগৎশেঠ : আমাদের সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

মিরজাফর : দলিল সই করবে কে?

ক্লাইভ : কমিটির সকলেই করেছেন। এখানে আপনি সই করবেন এবং রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ থাকবেন উইটনেস। নকল দলিলটায় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজি হননি।

মিরজাফর : উমিচাঁদ মানবে কেন তাহলে?

ক্লাইভ : সে ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।

জগৎশেঠ : তাহলে আর দেরি কেন? আমাদের আবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।

ক্লাইভ : অফকোরস। দলিল দুটোই তৈরি আছে। শুধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায়।

(দলিলের কপি মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিল)

মিরজাফর : একটু পড়ে দেখব না?

ক্লাইভ : ড্রাফট তো আগেই পড়েছেন।

রাজবল্লভ	:	তাহলেও একবার পড়ে দেখা দরকার।
ক্লাইভ	:	ইফ ইউ ওয়ান্ট গো অ্যাহেড। পড়ে দেখুন উমিচাঁদের মতো আপনাদেরও ঠকানো হয়েছে কি–না। (দলিলটা রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন রাজা আপনিই পড়ুন।
রাজবল্লভ	:	(পড়তে পড়তে) যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা, অ্যাডমিরাল ওয়াটসন পাবেন–
মিরজাফর	:	এগুলো দেখে আর লাভ কি?
রাজবল্লভ	:	এখন আর কিছু লাভ নেই, কিন্তু ভাবছি নবাবের তহবিল দুবার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা।
মিরজাফর	:	বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসুন দস্তখত দিয়ে কাজ শেষ করে ফেলি।
রাজবল্লভ	:	এই দলিল অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন কিন্তু রাজ্য চালাবেন কোম্পানি।
ক্লাইভ	:	(বিরক্ত) ইউ আর থিংকিং লাইক এ ফুল। আমরা কেন রাজ্য চালাব। আমরা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করবার প্রিভিলেজটুকু সিকিউরড করে নিচ্ছি। তা আমাদের করতেই হবে।
জগৎশেঠ	:	আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করুন। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায়, আপনারা হাত দেবেন এ তো ভালো কথা নয়।
ক্লাইভ	:	(রীতিমতো ক্রুদ্ধ) দেন হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ডু অ্যাবাউট ইট? দলিল দুটো তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আপনাদের শর্তাদি জানিয়ে দেবেন। সেইভাবে আবার একটা খসড়া তৈরি করা যাবে।
মিরজাফর	:	না না, সেকি কথা? এমনিতেই বাজারে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কোনদিন সিরাজউদ্দৌলা সবাইকে গারদে পুরে দেবে তার ঠিক নেই। দিন, আমি দলিল সই করে দিই। শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(রাজবল্লভের হাত থেকে দলিল নিয়ে সই করতে বসল। কিন্তু একটু ইতস্তত করে–)

মিরজাফর	:	বুকের ভেতর হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। বাইরে কোথাও মরাকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজি? আমি যেন শুনলাম।
ক্লাইভ	:	(উচ্চহাসি) বিদ্রোহী সেনাপতি, অথচ সো কাউয়ার্ড।
রাজবল্লভ	:	নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ও কিছু নয়।
মিরজাফর	:	তাই হয়ত।

(কলম নিয়ে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে আবার ইতস্তত করল)

মিরজাফর	:	কিন্তু রাজবল্লভ যেমন বললেন, সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?
ক্লাইভ	:	ওহ্ হোয়াট ননসেন্স! আমি জানতাম কাউয়ার্ডদের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না। তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করাতে নিজেই এসেছি। একা ওয়াটসকে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারিনি। এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। (মিরজাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কী করব? আমরা চাই টাকা। আপনাদের কোনো ভয় নেই। ইউ আর স্যাক্রিফাইসিং দ্যা নবাব অ্যান্ড নট দ্যা কান্ট্রি, দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।

মিরজাফর : আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা নবাবকে সরিয়ে দিচ্ছি। সে আমাদের সম্মান দেয় না।

(দলিলে সই করল। নেপথ্যে করুণ সংগীত চলতে থাকবে। জগৎশেঠ এবং রাজবল্লভও সই করল।)

ক্লাইভ : দ্যাটস অল রাইট। (দলিল ভাঁজ করতে করতে) আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে। ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট থিং– এ গ্রেড থিং। (ক্লাইভ এবং ওয়াটস আবার নারীর ছদ্মবেশ নিল, তারপর সবাই বেরিয়ে গেল। অন্যদিক দিয়ে মিরনের প্রবেশ।)

মিরন : হা হা হা। আর দেরি নেই।

(হাততালি দিতেই পরিচারিকার প্রবেশ) আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কী হবে? আগামী পরশু আমি শাহজাদা মিরন। শাহজাদা হা হা হা। তারপর একদিন বাংলার নবাব। (দ্রুত জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী : হুজুর, সেনাপতি মোহনলাল।

মিরন : (আতঙ্কিত) মোহনলাল।

মোহনলাল : শুনলাম আজ এখানে ভারী জলসা হচ্ছে। বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছেন। তাই খোঁজ নিতে এলাম।

মিরন : সেনাপতি মোহনলাল, আপনার দুঃসাহসের সীমা নেই। আমার প্রাসাদে কার অনুমতিতে আপনি প্রবেশ করেছেন?

মোহনলাল : প্রয়োজন মতো যে কোনো জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে। সত্য বলুন এখানে গুপ্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছিল কি না?

মিরন : মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি। জানেন এর ফল কী ভয়ানক হতে পারে? নবাবের সঙ্গে আব্বার সমস্ত গোলমাল সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়ে গেল? নবাব তাঁকে বিশ্বাস করে সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়েছেন। আর আপনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপবাদ নিয়ে। আমি এখুনি আব্বাকে নিয়ে নবাবের প্রাসাদে যাব। (উঠে দাঁড়াল) এই অপমানের বিচার হওয়া দরকার।

মোহনলাল : প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। (তরবারি কোষমুক্ত করল) আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না। সত্য বলুন, কী হচ্ছিল এখানে? কে কে ছিল মন্ত্রণাসভায়?

মিরন : মন্ত্রণাসভা হচ্ছিল কিনা, এবং হলে কোথায় হচ্ছিল আমি তার কিছুই জানিনে। ওসব বাজে জিনিসে সময় কাটানো আমার স্বভাব নয়। (পরিচারিকাকে ডেকে মিরন কিছু ইঙ্গিত করল) যখন না-ছোড় হয়েছেন তখন বেআদবি না করে আর উপায় কি?

(নর্তকীর প্রবেশ)

এখানে কী হচ্ছিল আশা করি সেনাপতি বুঝতে পেরেছেন?

(একটি মালা নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে নর্তকী মোহনলালের দিকে এগিয়ে গেল। মোহনলাল তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে শূন্যেই তা দ্বিখণ্ডিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল)

মিরন : মূর্তিমান বেরসিক হা হা হা ...

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১০ই জুন থেকে ২১এ জুনের মধ্যে যেকোনো একদিন। স্থান : লুৎফুন্নিসার কক্ষ।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-ঘসেটি, লুৎফা, আমিনা, সিরাজ, পরিচারিকা]

(নবাব-জননী আমিনা বেগম ও লুৎফুন্নিসা উপবিষ্টা। ঘসেটি বেগমের প্রবেশ)

ঘসেটি : বড় সুখে আছ রাজমাতা আমিনা বেগম।

লুৎফা : আসুন খালাআম্মা।

(সালাম করল)

ঘসেটি : বেঁচে থাক। সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে দোয়া করতে পারলুম না।

আমিনা : ছিঃ বড় আপা। এস, কাছে এসে বস।

ঘসেটি : বসতে আসিনি। দেখতে এলাম কত সুখে আছ তুমি। পুত্র নবাব, পুত্রবধূ নবাব বেগম, পৌত্রী শাহজাদি–

আমিনা : সিরাজ তোমারও তো পুত্র। তুমিও তো কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছ।

ঘসেটি : অদৃষ্টের পরিহাস–তাই ভুল করেছিলাম। যদি জানতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে, যদি জানতাম অহরহ সে আমার দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি সে গ্রাস করবে রাহুর মতো, তাহলে দুধের শিশু সিরাজকে প্রাসাদ-চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতাম না।

লুৎফা : আপনাকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি। মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করি।

ঘসেটি : থাক! যে সত্যিকার মা তার মহলেই তো চাঁদের হাট বসিয়েছ। আমাকে আবার পরিহাস করা কেন? দরিদ্র নারী আমি। নিজের সামান্য বিত্তের অধিকারিণী হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী নবাব সে অধিকারটুকুও আমাকে দিলেন না।

আমিনা : কী হয়েছে তোমার? পুত্রবধূর সামনে এরকম রূঢ় ব্যবহার করছ কেন?

ঘসেটি : কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব–আমি তার প্রজা। ক্ষমতার অহংকারে উন্মত্ত না হলে আমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে সে সাহস করত না। মতিঝিল থেকে আমাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারত না।

লুৎফা : শুনেছি আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা তিনি ধার নিয়েছেন। কলকাতা অভিযানের সময়ে টাকার প্রয়োজন হয়েছিল তাই। কিন্তু গোলমাল মিটে গেলে সে টাকা তো আবার আপনি ফেরত পাবেন।

ঘসেটি : নবাব টাকা ফেরত দেবেন!

লুৎফা : কেন দেবেন না? তা ছাড়া সে টাকা তো তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেননি। দেশের জন্যে–

ঘসেটি : থাম। লম্বা লম্বা বক্তৃতা কোরো না। সিরাজের বক্তৃতা তবু সহ্য হয়। তাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়।

আমিনা : সিরাজ তোমার কোনো ক্ষতি করেনি বড় আপা।

ঘসেটি : তার নবাব হওয়াটাই তো আমার মস্ত ক্ষতি।

আমিনা : নবাবি সে কারো কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি। ভূতপূর্ব নবাবই তাকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন।

ঘসেটি : বৃদ্ধ নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে তোমরা সিংহাসন দখল করেছ।

আমিনা : আমরা।

ঘসেটি : ভাবছো যে বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করব–কেমন? তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিনী নও।

আমিনা : তুমি অনর্থক বিষ উদ্গার করছ বড় আপা। তোমার এই ব্যবহারের অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।

ঘসেটি : বুঝবে। সে দিন আসছে। আর বেশিদিন এমন সুখে তোমার ছেলেকে নবাবি করতে হবে না।

(সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ : সিরাজউদ্দৌলা একটি দিনের জন্যেও সুখে নবাবি করেনি খালাআম্মা।

ঘসেটি : এসেছ শয়তান। ধাওয়া করেছ আমার পিছু?

সিরাজ : আপনার সঙ্গে প্রয়োজন আছে।

ঘসেটি : কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

সিরাজ : আমার প্রয়োজন আপনার সম্মতির অপেক্ষা রাখছে না খালাআম্মা।

ঘসেটি : তাই বুঝি সেনাপতি পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছ যে, তোমার আরও কিছু টাকার দরকার।

সিরাজ : খবর আপনার অজানা থাকার কথা নয়।

ঘসেটি : অর্থাৎ?

সিরাজ : অর্থাৎ আমি জানি যে, বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন। আরও স্পষ্ট করে শুনতে চান? আমি জানি যে, সিরাজের বিরুদ্ধে আপনার আক্রোশের কারণ আপনার সম্পত্তিতে সে হস্তক্ষেপ করেছে বলে নয়, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের আশায় আপনি উন্মাদ। আমি অনুরোধ করছি আপনার সঙ্গে আমাকে যেন কোনো প্রকারের দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করা না হয়।

ঘসেটি : তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

সিরাজ : আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

ঘসেটি : তোমার এই চোখ রাঙাবার স্পর্ধা বেশিদিন থাকবে না নবাব। আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

সিরাজ : আপনার ভবিষ্যৎ ভেবে আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না খালাআম্মা। আপনার নিজের সম্বন্ধেই আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। নবাবের মাতৃস্থানীয়া হয়ে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্তত আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।

ঘসেটি : তোমার মতলব বুঝতে পারছি না।

সিরাজ : রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাষী, স্বার্থপরায়ণ নারীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। আমি তাই আপনার গতিবিধির ওপরে লক্ষ রাখবার ব্যবস্থা করেছি। আমার প্রাসাদে আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না। তবে লক্ষ রাখা হবে যাতে দেশের বর্তমান অশান্তি দূর হবার আগে বাইরের কারো সঙ্গে আপনি কোনো যোগাযোগ রাখতে না পারেন।

ঘসেটি : (ক্ষিপ্ত) ওর অর্থ আমি বুঝি মহামান্য নবাব। (দ্রুত আমিনার দিকে এগিয়ে এসে) শুনলে তো রাজমাতা, আমাকে বন্দিনী করে রাখা হলো। এইবার বল তো আমি তার মা, সে আমার পুত্র–তাই না? হা হা হা।

(অসহায় ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন)

আমিনা : এসব লক্ষণ ভালো নয়। (উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে) বড় আপা শুনে যাও, বড় আপা–

(বেরিয়ে গেলেন)

লুৎফা : খালাআম্মা বড় বেশি অপমান বোধ করেছেন। ওঁর সঙ্গে অমন ব্যবহার করাটা হয়ত উচিত হয়নি।

সিরাজ : আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছেন লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার।

লুৎফা : ও কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা।

সিরাজ : তুমিও অন্ধ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাব বল তো লুৎফা। দেখতে পাচ্ছ না, শুধু অপমান নয় আমাকে ধ্বংস করবার আয়োজনে সবাই কী রকম মেতে উঠেছে।

লুৎফা : কিন্তু খালাআম্মা–

সিরাজ : আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে খালাআম্মা খুশি হবেন সবচেয়ে বেশি।

লুৎফা : অতটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ওঁর মন আপনার ওপরে যথেষ্ট বিষিয়ে উঠেছে তা ঠিক। কিন্তু–

সিরাজ : থামলে কেন? বল।

লুৎফা : বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

সিরাজ : বল।

লুৎফা : বিধবা মেয়েমানুষ, ওঁর সম্পত্তিতে বারবার এমন হস্তক্ষেপ করতে থাকলে ভরসা নষ্ট হবারই কথা।

সিরাজ : লুৎফা, তুমিও আমার বিচার করতে বসলে। কর, আমি আপত্তি করব না। দাদু মরবার পর থেকে এই ক-মাসের ভেতরে আমি এত বদলে গেছি যে আমার নিকটতম তুমিও তা বুঝতে পারবে না।

লুৎফা : জাঁহাপনা।

সিরাজ : মনে পড়ে লুৎফা, দাদুর মৃত্যুশয্যায় আমি কসম খেয়েছিলাম শরাব স্পর্শ করব না। আমি তা করিনি। তুমিও জান লুৎফা আমি তা করিনি।

লুৎফা : আমি ও-সব কোনো কথাই তুলছিনে জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি জানি। সেই জন্যেই বলছি সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার কর।

লুৎফা : আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্যে কোনো কথা বলিনি, জাঁহাপনা। খালাআম্মা রাগে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন তাই–

সিরাজ : তাই তোমার মনে হলো ওঁর টাকা-পয়সায় হাত দিয়েছি বলেই উনি আমার ওপর অতখানি বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু তুমি জান না, কতখানি, উৎসাহ নিয়ে উনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন শওকতজঙ্গের কামিয়াবির জন্যে। শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ওঁর দান কম নয়।

লুৎফা : আমি মাপ চাইছি জাঁহাপনা, আমার অন্যায় হয়েছে।

সিরাজ : লুৎফা, এত দেয়াল কেন বল তো?

লুৎফা : দেয়াল? কোথায় দেয়াল জাঁহাপনা?

সিরাজ : আমার চারপাশে লুৎফা। আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়। উজির, অমাত্য, সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, খালাআম্মা আর আমার মাঝখানে, আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে, আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে, আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল।

লুৎফা : জাঁহাপনা!

সিরাজ : আমি এর কোনোটি ডিঙিয়ে যাচ্ছি, কোনোটি ভেঙে ফেলছি, কিন্তু তবু তো দেয়ালের শেষ হচ্ছে না, লুৎফা।

লুৎফা : আপনি ক্লান্ত হয়েছেন জাঁহাপনা।

সিরাজ : মসনদে বসবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত যেন দুপায়ের দশ আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ক্লান্তি আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। সমস্ত প্রাণশক্তি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে লুৎফা।

লুৎফা : সমস্ত দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কাছে দুইএকদিন বিশ্রাম করুন।

সিরাজ : কবে যে দুদণ্ড বিশ্রাম পাব তার ঠিক নেই। আবার তো যুদ্ধে যেতে হচ্ছে।

লুৎফা : সে কি!

সিরাজ : আমার বিরুদ্ধে কোম্পানির ইংরেজদের আয়োজন সম্পূর্ণ। আমি এগিয়ে গিয়ে বাধা না দিলে তারা সরাসরি রাজধানী আক্রমণ করবে।

লুৎফা : ইংরেজদের সঙ্গে তো আপনার মিটমাট হয়ে গেল।

সিরাজ : হ্যাঁ, আলিনগরের সন্ধি। কিন্তু সে সন্ধির মর্যাদা একমাস না যেতেই তারা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

লুৎফা : কজন বিদেশি বেনিয়ার এত স্পর্ধা কী করে সম্ভব?

সিরাজ : ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব, লুৎফা। শুধু একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারিনি, ধর্মের নামে ওয়াদা করে মানুষ তা খেলাপ করে কী করে? নিজের স্বার্থ কি এতই বড়?

লুৎফা : কোনো প্রতিকার করতে পারেননি জাঁহাপনা?

সিরাজ : পারিনি। চেয়েছি, চেষ্টাও করেছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা পাইনি। রাজবল্লভ, জগৎশেঠকে কয়েদ করলে, মিরজাফরকে ফাঁসি দিলে হয়ত প্রতিকার হতো, কিন্তু সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করত কিনা কে জানে?

লুৎফা : থাক ওসব কথা। আজ আপনি বিশ্রাম করুন।

সিরাজ : আর কাল সকালেই দেশের পথে-ঘাটে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের কয়েকশ বেগমের সঙ্গে নবাবের উদ্দাম রাসলীলার কাহিনি।

লুৎফা : মহলে বেগমের তো সত্যিই কোনো অভাব নেই।

সিরাজ : ঠাট্টা করছ লুৎফা? তুমি তো জানোই, মরহুম শওকতজঙ্গের বিশাল হারেম বাধ্য হয়েই আমাকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে।

লুৎফা : সে যাক। আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দুজন।

সিরাজ : অনেক সময়ে সত্যিই তা ভেবেছি, লুৎফা। তোমার খুব কাছাকাছি বহুদিন আসতে পারিনি। আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত। নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থের ছোট্ট সাজানো সংসার আমরা পেতাম।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : বেগম সাহেবা।

লুৎফা : (তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে) জাঁহাপনা এখন বিশ্রাম করছেন। যাও।

পরিচারিকা : সেনাপতি মোহনলালের কাছ থেকে খবর এসেছে। (পেছোতে লাগল)

লুৎফা : না।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

সিরাজ : (এগিয়ে আসতে আসতে) মোহনলালের জরুরি খবরটা শুনতেই দাও, লুৎফা।

(লুৎফা সিরাজের গতিরোধ করল)

লুৎফা : (আবেগজড়িত কণ্ঠে) না।

(সিরাজ থামল ক্ষণকালের জন্যে। লুৎফার দিকে মেলে রাখা নীরব দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই লুৎফার প্রসারিত বাহু ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। লুৎফা চেয়ে রইল সিরাজের চলে যাওয়া পথের দিকে–দুইফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর দুইগাল বেয়ে)

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২২এ জুন। স্থান : পলাশিতে সিরাজের শিবির

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে–সিরাজ, মোহনলাল, মিরমর্দান, প্রহরী, বন্দি কমর]

(গভীর রাত্রি। শিবিরের ভেতরে নবাব চিন্তাগ্রস্তভাবে পায়চারি করছেন।
দূর থেকে শৃগালের প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে আসবে।)

সিরাজ : দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলো। শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজউদ্দৌলার চোখে। (আবার নীরব পায়চারি) ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই–

(মোহনলালের প্রবেশ। কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই)

সিরাজ : সত্যি অবাক হয়ে যাই মোহনলাল, ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি। তারা শৃঙ্খলা জানে, শাসন মেনে চলে। কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে সে তো স্পষ্ট রাজদ্রোহ। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরছে। আশ্চর্য!

মোহনলাল : জাঁহাপনা!

সিরাজ : হ্যাঁ, বলো মোহনলাল, কী খবর।

মোহনলাল : ইংরেজের পক্ষে মোট সৈন্য তিন হাজারের বেশি হবে না। অবশ্য তারা অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত। নবাবের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি। ছোট বড় মিলিয়ে ওদের কামান হবে গোটা দশেক। আমাদের কামান পঞ্চাশটার বেশি।

সিরাজ : এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কি না।

মোহনলাল : জাঁহাপনা!

সিরাজ : এমন আশঙ্কা কেন করছি তাই জানতে চাইছ তো? মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে।

মোহনলাল : সিপাহসালারের আরও একখানা গোপন চিঠি ধরা পড়েছে।

(নবাবের হাতে পত্র দান। নবাব সেটা পড়ে হাতের মুঠোয় মুচড়ে ফেললেন)

সিরাজ : বেইমান।

মোহনলাল : ক্লাইভের আরও তিনখানা চিঠি ধরা পড়েছে। সে সিপাহসালারের জবাবের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মনে হয়।

সিরাজ : সাংঘাতিক লোক এই ক্লাইভ। মতলব হাসিল করার জন্যে যে কোনো অবস্থার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর কাছে সব কিছুই যেন বড় রকমের জুয়ো খেলা।

(মিরমর্দানের প্রবেশ। যথারীতি কুর্নিশ করে একদিকে দাঁড়াল)

সিরাজ : বল মিরমর্দান।

মিরমর্দান : ইংরেজ সৈন্য লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গাতীরের ছোট বাড়িটায়। এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে।

সিরাজ : তোমাদের ফৌজ সাজাবার আয়োজন শেষ হয়েছে তো?

মিরমর্দান : (একটা প্রকাণ্ড নকশা নবাবের সামনে মেলে ধরে) আমরা সব গুছিয়ে ফেলেছি। (নকশা দেখাতে দেখাতে) আপনার ছাউনির সামনে গড়বন্দি হয়েছে। ছাউনির সামনে মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমি। আরও ডানদিকে গঙ্গার ধারে এই ঢিপিটার উপরে একদল পদাতিক আমার জামাই বদ্রিআলি খাঁর অধীনে যুদ্ধ করবে। তাদের ডান পাশের গঙ্গার দিকে একটু এগিয়ে নৌবে সিং হাজারির বাহিনী। বাঁ দিক দিয়ে লক্ষবাগ পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন সিপাহসালার, রায়দুর্লভরাম আর ইয়ার লুৎফ খাঁ।

সিরাজ : (নকশার কাছ থেকে সরে এসে একটু পায়চারি করলেন) কত বড় শক্তি, তবু কত তুচ্ছ মিরমর্দান।

মিরমর্দান : জাঁহাপনা!

সিরাজ : আমি কী দেখছি জান? কেমন যেন অঙ্কের হিসেবে ওদের সুবিধের পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে।

মিরমর্দান : ইংরেজদের ঘায়েল করতে সেনাপতি মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমার বাহিনীই যথেষ্ট।

সিরাজ : ঠিক তা নয়, মিরমর্দান। আমি জানি তোমাদের বাহিনীতে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার আর আট হাজার পদাতিক সেনা রয়েছে। তারা জান দিয়ে লড়বে। কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে, এস তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করি।

মোহনলাল : জাঁহাপনা!

সিরাজ : মিরজাফরের বাহিনী সাজিয়েছে দূরে লক্ষবাগের অর্ধেকটা ঘিরে। যুদ্ধে তোমরা হারতে থাকলে ওরা দুকদম এগিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায়। যেন নিশ্চিন্তে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে।

মিরমর্দান : কিন্তু আমরা হারব কেন?

সিরাজ : না হারলে ওরা যে তোমাদের ওপরেই গুলি চালাবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাক, শিবিরের কাছে ওদের ফৌজ রাখবার কথা আমরাও ভাবি না। কারণ, সামনে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকলে, ওরা পেছনে নবাবের শিবির দখল করতে এক মুহূর্ত দেরি করবে না।

মোহনলাল : ওদের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না আনলেই বোধ হয়—

সিরাজ : এনেছি চোখে চোখে রাখার জন্যে। পেছনে রেখে এলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দখল করত।

মিরমর্দান : এত চিন্তিত হবার কারণ নেই, জাঁহাপনা। আমাদের প্রাণ থাকতে নবাবের কোনো ক্ষতি হবে না।

সিরাজ : আমি জানি, তাই আরও বেশি ভরসা হারিয়ে ফেলছি। তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশি করে পীড়া দিচ্ছে।

মোহনলাল : আমরা জয়ী হব, জাঁহাপনা!

সিরাজ : পরাজিত হবে, আমিই কি তা ভাবছি। আমি শুধু অশুভ সম্ভাবনাগুলো শেষবারের মতো খুঁটিয়ে বিচার করে দেখছি। আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেবে মিরজাফর। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্যে যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব সিপাহসালারকে দিতেই হবে। ফল কি হবে কে জানে। আমি কর্তব্য স্থির করতে পারছিনে, কিন্তু কেন যে পারছিনে আশা করি তোমরা বুঝছ।

মিরমর্দান : জাঁহাপনা!

সিরাজ : আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয়, মোহনলাল। আমার একমাত্র ভরসা আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু।

(কিছুটা কোলাহল শোনা গেল বাইরে। দুজন প্রহরী এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাজির হলো)

প্রহরী : হুজুর, একই লোকটা নবাবের ছাউনির দিকে এগোবার চেষ্টা করছিল।

(সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল বন্দির কাছে এগিয়ে এসে নবাবকে একটু যেন আড়াল করে দাঁড়াল। নবাব দুপা এগিয়ে এলেন। অপর দিক দিয়ে মিরমর্দান বন্দির আর এক পাশে দাঁড়াল)

বন্দি : (সকাতর ক্রন্দনে) আমি পলাশি গ্রামের লোক, হুজুর। রৌশনি দেখতে এখানে এসেছি।

মোহনলাল : (প্রহরীকে) তল্লাশি কর।

(প্রহরী তল্লাশি করে কিছুই পেল না)

কিন্তু একে সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না, জাঁহাপনা।

মিরমর্দান : (প্রহরীকে) বাইরে নিয়ে যাও। কথা আদায় কর। (হঠাৎ) দেখি দেখি। এ তো কমর বেগ জমাদার। মিরজাফরের গুপ্তচর উমর বেগের ভাই। এও গুপ্তচর।

কমর : (সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে) জাঁহাপনার কাছে বিচারের জন্যে এসেছি। আমাকে আসতে দেয় না, তাই চুরি করে হুজুরের কদম মোবারকে ফরিয়াদ জানাতে আসছিলাম।

সিরাজ : (কাছে এগিয়ে এসে) কি হয়েছে তোমার?

কমর : আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হুকুমে খুন করা হয়েছে, হুজুর।

সিরাজ : মোহনলাল!

মোহনলাল : গুপ্তচর উমর বেগ জমাদার হাতেনাতে ধরা পড়েছিল জাঁহাপনা। ক্লাইভের চিঠি ছিল তার কাছে। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়বার পর সে পালাবার চেষ্টা করে। ফলে প্রহরীদের তলোয়ারের ঘায়ে সে মারা পড়েছে।

(সিরাজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মোহনলালের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন)

মোহনলাল : (যেন দোষ ঢাকবার চেষ্টায়) সে চিঠি জাঁহাপনার কাছে আগেই দাখিল করা হয়েছে।

সিরাজ : (মোহনলালের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু পায়চারি করে চিন্তিত ভাবে) কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কি না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই, মোহনলাল।

কমর : জাঁহাপনা মেহেরবান।

সিরাজ : (প্রহরীদের) একে নিয়ে যাও। কাল যুদ্ধ শেষ হবার পর একে মুক্তি দেবে।

কমর : (রুদ্ধস্বরে) এই কি জাঁহাপনার বিচার?

সিরাজ : আমি জানি, এখানে এ অবস্থায় শুধু ফরিয়াদ জানাতেই আসবে এতটা নির্বোধ তুমি নও। (কঠোর স্বরে প্রহরীদের) নিয়ে যাও।

(বন্দিকে নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান। শৃগালের প্রহর ঘোষণা)

সিরাজ : তোমরাও এখন যেতে পার। আজ রাতে তোমাদের কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল।

(মোহনলাল ও মিরমর্দান বেরিয়ে গেল। সিরাজ পায়চারি করতে লাগলেন। সোরাহি থেকে পানি ঢেলে খেলেন। কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। সিরাজ উৎকর্ণ হয়ে তা শুনলেন। কি যেন ভেবে রেহেলে রাখা কোরান শরিফের কাছে গিয়ে জায়নামাজে বসলেন। কোরান শরিফ তুলে ওষ্ঠে ঠেকিয়ে রেহেলের ওপর রেখে পড়তে লাগলেন। দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এল। সিরাজ কোরান শরিফ মুড়ে রাখলেন। 'আসসালাতু খায়রুম মিনান্ নাওম'—এর পর মোনাজাত করলেন। আস্তে আস্তে পাখির ডাক জেগে উঠতে লাগল। হঠাৎ সুতীব্র তূর্যনাদ স্তব্ধতা ভেঙে খান খান করে দিল।)

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৩এ জুন। স্থান : পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে– সিরাজ, প্রহরী, সৈনিক, দ্বিতীয় সৈনিক, তৃতীয় সৈনিক, সাঁফ্রে, মোহনলাল, রাইসুল জুহালা, ক্লাইভ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ইংরেজ সৈনিকগণ]

(গোলাগুলির শব্দ, যুদ্ধ, কোলাহল। সিরাজ নিজের তাঁবুতে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। সৈনিকের প্রবেশ)

সিরাজ : (উৎকণ্ঠিত) কী খবর সৈনিক?

সৈনিক : যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে গিয়ে লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। সিপাহসালার, সেনাপতি রায়দুর্লভ এবং ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়নি।

সিরাজ : মিরমর্দান, মোহনলাল?

সৈনিক : ওরা শত্রুদের পিছু হটিয়ে লক্ষবাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সিরাজ : আচ্ছা, যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান। কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল। দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ।)

দ্বিতীয় সৈনিক : দুঃসংবাদ, জাঁহাপনা। সেনাপতি নৌবে সিং হাজারি ঘায়েল হয়েছেন।

সিরাজ : (কঠোর স্বরে) যাও।

(প্রস্থান। একটু পরে তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ।)

তৃতীয় সৈনিক : কিছুক্ষণ আগে যে বৃষ্টি হলো তাতে ভিজে আমাদের বারুদ অকেজো হয়েছে, জাঁহাপনা।

সিরাজ : (ভীত স্বরে) বারুদ ভিজে গেছে?

তৃতীয় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দান তাই কামানের অপেক্ষা না করে হাতাহাতি লড়বার জন্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

সিরাজ : আর কোম্পানির ফৌজ যখন কামান ছুঁড়বে?

তৃতীয় সৈনিক : শত্রুদের সময় দিতে চান না বলেই সেনাপতি মিরমর্দান শুধু তলোয়ার নিয়েই সামনে এগোচ্ছেন।

(দ্রুত প্রথম সৈনিকের প্রবেশ)

প্রথম সৈনিক : সেনাপতি বদ্রিআলি খাঁ নিহত, জাঁহাপনা। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ।

সিরাজ : না। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয় না বদ্রিআলি ঘায়েল হলে। মিরমর্দান, মোহনলাল আছে। কোনো ভয় নেই, যাও।

(প্রথম ও তৃতীয় সৈনিকের প্রস্থান। হঠাৎ যুদ্ধ কোলাহল কেমন যেন আর্ত চিৎকারে পরিণত হলো)

সিরাজ : কি হলো? (টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখবার চেষ্টা।)

(ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রের প্রবেশ)

সিরাজ : (দ্রুত এগিয়ে এসো) কি খবর সাঁফ্রে? আমাদের পরাজয় হয়েছে?

সাঁফ্রে : (কুর্নিশ করে) এখনো হয়নি, ইওর একসেলেন্সি। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে।

সিরাজ : শক্তিমান বীর সেনাপতি, তোমরা থাকতে যুদ্ধে হার হবে কেন? যাও, যুদ্ধে যাও, সাঁফ্রে। জয়লাভ কর।

সাঁফ্রে : আমি তো ফ্রান্সের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ছি জাঁহাপনা। দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি প্রাণ দেব। কিন্তু আপনার বিরাট সেনাবাহিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান্ডিং লাইক পিলার্স।

সিরাজ : মিরজাফর, রায়দুর্লভকে বাদ দিয়েও তোমরা লড়াইয়ে জিতবে। আমি জানি তোমরা জিতবেই।

সাঁফ্রে : আমাদের গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে লক্ষবাগে আশ্রয় নিচ্ছিল। এমন সময়ে এল বৃষ্টি। হঠাৎ জাফর আলি খান আদেশ দিলেন এখন যুদ্ধ হবে না। মোহনলাল যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেন না। কিন্তু সিপাহসালারের আদেশ পেয়ে টায়ার্ড সোলজারস যুদ্ধ বন্ধ করে শিবিরে ফিরতে লাগল। সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিলপ্যাট্রিক আমাদের আক্রমণ করছে। মিরমর্দান তাদের বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে বারুদ অকেজো হয়ে গেছে। তাঁকে এগোতে হচ্ছে কামান ছাড়া। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডেনজারস।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ। কিছু না বলে চুপ করে)

সিরাজ : কী সংবাদ?

(কিছু বলবার চেষ্টা করেও পারল না)

সিরাজ : (অধৈর্য হয়ে কাছে এসে প্রহরীকে ঝাঁকুনি দিয়ে) কী খবর, বল কী খবর?

দ্বিতীয় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দানের পতন হয়েছে, জাঁহাপনা।

সাঁফ্রে : হোয়াট? মিরমর্দান কিলড?

সিরাজ : (যেন আচ্ছন্ন) মিরমর্দান শহিদ হয়েছেন?

সাঁফ্রে : দি ব্রেভেস্ট সোলজার ইজ ডেড।
আমি যাই, ইওর একসেলেন্সি। আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ফরাসিরা প্রাণপণে লড়বে।

(প্রস্থান)

সিরাজ : ঠিক বলেছ সাঁফ্রে, শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। এখন তাহলে কি করতে হবে? সাঁফ্রে, মোহনলাল–

দ্বিতীয় সৈনিক : সেনাপতি মোহনলালকে খবর দিতে হবে, জাঁহাপনা?

সিরাজ : মোহনলাল? না। নৌবে সিং, বদ্রিআলি, মিরমর্দান সবাই নিহত। এখন কী করতে হবে। (পায়চারি করতে করতে হঠাৎ) হ্যাঁ, আলিবর্দির সঙ্গে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধে আমিই তো ঘুরেছি। বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত নেই বলেই পরাজয় গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। (সৈনিককে উদ্দেশ করে) আমার হাতিয়ার নিয়ে এস। আমি যুদ্ধে যাব। আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।

(মোহনলালের প্রবেশ)

মোহনলাল : না, জাঁহাপনা।

(সৈনিক বেরিয়ে গেল)

সিরাজ : মোহনলাল!

মোহনলাল : পলাশিতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, জাঁহাপনা। এখন আর আত্মাভিমানের সময় নেই। আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে।

সিরাজ : মিরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ত চাইব না?

মোহনলাল : মিরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিল বলে। আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না জাঁহাপনা। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আপনাকে নতুন করে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।

সিরাজ : আমি একাই ফিরে যাব?

মোহনলাল : আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই। আমি যাই, জাঁহাপনা। সাঁফ্রে আর আমার যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।

(নতজানু হয়ে নবাবের পদস্পর্শ করল। তারপর দ্বিতীয় কথা না বলে বেরিয়ে গেল)

সিরাজ : (আত্মগতভাবে) যাও, মোহনলাল। আর দেখা হবে না। আর কেউ রইল না। শুধু আমি রইলাম–নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে, মোহনলাল বলে গেল।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক : দেহরক্ষী অশ্বারোহীরা প্রস্তুত, জাঁহাপনা। আপনার হাতিও তৈরি।

সিরাজ : চল।

(যেতে যেতে কী যেন মনে করে দাঁড়ালেন)

সিরাজ : সেনাপতি মোহনলালকে খবর পাঠাও। কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের হেফাজতে মিরমর্দানের লাশ যেন এক্ষুণি মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। উপযুক্ত মর্যাদায় মিরমর্দানের লাশ দাফন করতে হবে।

(বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী নবাব শিবিরের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। রাইসুল জুহালার প্রবেশ)

রাইস : জাঁহাপনা তাহলে চলে গেছেন? রক্ষা।

প্রহরী : আমরা সবাই চলে যাচ্ছি।

রাইস : মিরজাফর-ক্লাইভের দলবল এসে পড়ল বলে।

প্রহরী : তা হলে আর দেরি নয়, চল সরে পড়া যাক।

(বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই সশস্ত্র সৈন্যদের হাতে তারা বন্দি হলো। সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে এল ক্লাইভ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ।)

ক্লাইভ : হি হ্যাজ ফ্লেড অ্যাওয়ে, আগেই পালিয়েছে। (বন্দিদের কাছে এসে) কোথায় গেছে নবাব?

(বন্দিরা নিরুত্তর)

ক্লাইভ : (রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারল) কোথায় গেছে নবাব? সে কুইকলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লাইভ। বাঁচতে হলে জলদি করে বল।

রাইস : (হেসে উঠে মিরজাফরকে দেখিয়ে) ইনি বুঝি বাংলার সিপাহসালার? যুদ্ধে বাংলাদেশের জয় হয়েছে তো হুজুর?

রাজবল্লভ : যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে?

ক্লাইভ : নো টাইম ফর ফান, কাম অন সে, হোয়ার ইজ সিরাজ?

(আবার লাথি মারল)

রাইস : নবাব সিরাজউদ্দৌলা এখনো জীবিত। এর বেশি আর কিছু জানিনে।

রাজবল্লভ : চিনেছি, এ তো সেই রাইসুল জুহালা।

ক্লাইভ : হি মাস্ট বি এ স্পাই।

(টান মেরে পরচুলা খুলে ফেলল)

মিরজাফর : নারান সিং। সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর।

ক্লাইভ : গুলি কর ওকে–হেয়ার অ্যান্ড নাও।

(দুজন গোরা সৈন্য নবাবের পরিত্যক্ত আসনের সঙ্গে পিঠমোড়া করে নারান সিংকে বাঁধতে লাগল।)

ক্লাইভ : (মিরজাফরকে) এখনই মুর্শিদাবাদের দিকে মার্চ করুন। বিশ্রাম করা চলবে না। সিরাজউদ্দৌলা যেন শক্তি সঞ্চয়ের সময় না পায়।

(ক্লাইভ কথা বলছে, পিছনে গোরা সৈন্য দুজন নারান সিংকে গুলি করল। মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, নিদারুণ শঙ্কিত। ক্লাইভ অবিচল। গুলিবিদ্ধ নারান সিংয়ের দিকে তাকিয়ে সহজ কণ্ঠে বললো)

ক্লাইভ : গুপ্তচরকে এইভাবেই সাজা দিতে হয়।

নারান : (মৃত্যুস্তিমিত কণ্ঠে) এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি। গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে। সে কি বেইমানির চেয়ে খারাপ? মোনাফেকির চেয়ে খারাপ? ঝিমিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ একটু সতেজ হয়ে) তবু ভয় নেই; সিরাজউদ্দৌলা বেঁচে আছে।

ক্লাইভ : (গোরা সৈন্য দুটিকে) হাউ ডু ইউ কিল? ইডিয়টস। যখন মারবে শুট স্ট্রেইট ইনটু হার্ট, এমন করে মারবে যেন সঙ্গে সঙ্গে মরে।

(পিস্তল বার করল)

নারান : ভগবান সিরাজউদ্দৌলাকে রক্ষা–

(ক্লাইভ নিজে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারান সিংয়ের মৃত্যু হলো।)

[দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৫এ জুন। স্থান : মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে– সিরাজ, জনৈক ব্যক্তি, সৈনিক, অপর সৈনিক, বার্তাবাহক, দ্বিতীয় বার্তা বাহক, জনতা ও লুৎফা।]

(দরবারে গণ্যমান্য লোকের সংখ্যা কম। বিভিন্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি। স্তিমিত আলোয় সিরাজ বক্তৃতা করছেন। ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হবে।)

সিরাজ : পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, সে-কথা গোপন করে এখন আর কোনো লাভ নেই। কিন্তু–

ব্যক্তি : প্রাণের ভয়ে কে না পালায় হুজুর?

সিরাজ : আপনাদের কি তাই বিশ্বাস যে প্রাণের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি? (জনতা নীরব)

সিরাজ : না, প্রাণের ভয়ে আমি পালাইনি। সেনাপতিদের পরামর্শে যুদ্ধের বিধি অনুসারেই আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বিজয়ী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। ফিরে এসেছি রাজধানীতে স্বাধীনতা বজায় রাখবার শেষ চেষ্টা করব বলে।

ব্যক্তি : কিন্তু রাজধানী খালি করে তো সবাই পালাচ্ছে জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি অনুরোধ করছি, কেউ যেন তা না করেন। এখনো আশা আছে। এখনো আমরা একত্রে রুখে দাঁড়াতে পারলে শত্রু মুর্শিদাবাদে ঢুকতে পারবে না।

ব্যক্তি : তা কী করে হবে হুজুর? অত বড় সেনাবাহিনী যখন ছারখার হয়ে গেল।

সিরাজ : তারা যুদ্ধ করেনি। তারা দেশবাসীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কিন্তু যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করে দেখতে শিখেছিল, মুষ্টিমেয় সেই কজনই শুধু যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে। এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেব না।

ব্যক্তি : পরাজয়ের খবর বাতাসের বেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, জাঁহাপনা। ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচার এবং লুটতরাজের ভয়ে নগরের অধিকাংশ লোকজন তাদের দামি জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যে কোনো দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজ : আপনারা ওদের বাধা দিন। ওদের অভয় দিন। শত্রুসৈন্যদের হাতে পড়বার আগেই সাধারণ চোর-ডাকাত ওদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে।

ব্যক্তি : কেউ শোনে না, হুজুর। সবাই প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে।

সিরাজ : কোথায় পালাবে? পেছন থেকে আক্রমণ করবার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না। আপনারা কেউ অধৈর্য হবেন না। সবাইকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলুন। এই আমাদের শেষ সুযোগ, এ কথা বারবার করে বলছি। ক্লাইভের হাতে রাজধানীর পতন হলে এ দেশের স্বাধীনতা চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে।

ব্যক্তি : জাঁহাপনা, কোথায় বা পাওয়া যাবে তত বেশি সৈন্য আর কোথায় বা তার ব্যয়-ব্যবস্থা।

সিরাজ : দু-এক দিনের ভেতরেই বিভিন্ন জমিদারের কাছ থেকে যথেষ্ট সৈন্য সাহায্য আসবে। অর্থের অভাব নেই। সেনাবাহিনীর খরচের জন্যে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা বলুন কার কী প্রয়োজন।

সৈনিক : ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্যদলে রোজ বেতনে আমি জমাদারের কাজ করি জাঁহাপনা। আমার অধীনে ২০০ সিপাই। আমরা হুজুরের জন্যে প্রাণপণে লড়তে প্রস্তুত।

সিরাজ : বেশ, খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান। আপনার সিপাইদের তৈরি হতে আদেশ দিন। মুর্শিদাবাদে এই মুহূর্তে অন্তত দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হবে। জমিদারের কাছ থেকে সাহায্য আসবার আগে এই বাহিনী নিয়েই আমরা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারব।

অপর সৈনিক : আমি রাজা রাজবল্লভের অশ্বারোহী বাহিনীতে ঠিকা হারে কাজ করি। আমার মতো এমন আরও শতাধিক লোক রাজবল্লভের বাহিনীতে কাজ করে। জাঁহাপনার হুকুম হলে আমরা একটা ফৌজ অল্প সময়ের ভেতরেই খাড়া করতে পারি।

সিরাজ : এখুনি চলে যান। খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিন যত দরকার।

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)

বার্তাবাহক : শহরে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, জাঁহাপনা। মুহম্মদ ইরিচ খাঁ সাহেব এই মাত্র সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

সিরাজ : (বিস্ময়ের বিমূঢ়) ইরিচ খাঁ পালিয়ে গেলেন! সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর ইরিচ খাঁ?

বার্তাবাহক : জাঁহাপনা!

সিরাজ : আশ্চর্য! এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্যে।

ব্যক্তি : তাহলে আর আশা কোথায়?

সিরাজ : তাহলেও আশা আছে।

(দ্বিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ)

দ্বিতীয় বার্তা : জাঁহাপনার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্যে যারা টাকা নিয়েছে তাদের অনেকেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজ : তাহলেও আশা! ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ন হয় না। এমনি করে পালাতে পারতেন মিরমর্দান, মোহনলাল, বদ্রিআলি, নৌবে সিং। তার বদলে তাঁরা পেতেন শত্রুর অনুগ্রহ, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশবাসীর মর্যাদার জন্যে, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি। এই আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয়। দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে।

(জনতা নীরব। সিরাজের অস্থির পদচারণা)

সিরাজ : সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আপনারা ভেবে দেখুন, কে বেশি শক্তিমান? একদিকে দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী। তাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আছে ছলনা এবং শাঠ্য। অস্ত্র আমাদেরও আছে, কিন্তু তার চেয়ে যা বড়, সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প। এই অস্ত্র নিয়ে আমরা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের অবশ্যই দমন করতে পারব।

ব্যক্তি : সাধারণ মানুষ তো যুদ্ধ কৌশল জানে না, হুজুর।

সিরাজ : তবু তাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। হাজার হাজার মানুষ একযোগে রুখে দাঁড়াতে পারলে কৌশলের প্রয়োজন হবে না। বিক্রম দিয়েই আমরা শত্রুকে হতবল করতে পারব। তা না হলে, ভবিষ্যতে বছরের পর বছর, দেশের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশি দস্যুর হাতে যে ভাবে উৎপীড়িত হবে তা অনুমান করাও কষ্টকর। আপনারা ভেবে দেখুন, কেন এই যুদ্ধ? মুসলমান মিরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ, কায়স্থ রায়দুর্লভ, জৈন মহাতাব চাঁদ শেঠ, শিখ উমিচাঁদ, ফিরিঙ্গি খ্রিষ্টান ওয়াটস ক্লাইভ আজ একজোট হয়েছে কিসের জন্যে? সিরাজউদ্দৌলাকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন তাদের কেন এত বেশি? তারা চায় মসনদের অধিকার। কারণ, তা না হলে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা হয় না। দেশের উপরে অবাধ লুঠতরাজের একচেটিয়া অধিকার তারা পেতে পারে না সিরাজউদ্দৌলা বর্তমান থাকতে। একবার সে সুযোগ পেলে তাদের আসল চেহারা আপনারা দেখতে পাবেন। বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকারের বন্যা বইয়ে দেবে মিরজাফর-ক্লাইভের লুণ্ঠন অত্যাচার। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই সময় থাকতে একযোগে মাথা তুলে দাঁড়ান। আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন।

ব্যক্তি : কিন্তু জাঁহাপনা, সৈন্য পরিচালনার যোগ্য সেনাপতিও তো আমাদের নেই।

সিরাজ : আছে। সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হননি। তিনি অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তাছাড়া আমি আছি। মরহুম আলিবর্দির আমল থেকে এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে আমি শরিক হইনি? পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। আবার যুদ্ধ হবে, আর সৈন্য পরিচালনা করব আমি নিজে। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়ে ল।

(বার্তবাহকের প্রবেশ)

বার্তা : সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হয়েছেন, জাঁহাপনা।

সিরাজ : (কিছুটা হতাশ) মোহনলাল বন্দি হয়েছে?

জনতা : তাহলে আর কোনো আশা নেই। কোনো আশা নেই।

(জনতা দরবার কক্ষ ত্যাগ করতে লাগল)

সিরাজ : মোহনলাল বন্দি? (কতকটা যেন আত্ম-সংবরণ করে) তাহলেও কোনো ভয় নেই। আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না।

(সিরাজ হাত তুলে পলায়নপর জনতাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। জনতা তাতে কান না দিয়ে পালাতেই লাগল।)

সিরাজ : আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আমরা শত্রুকে অবশ্যই রুখব।

(সবাই বেরিয়ে গেল। অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়লেন। দুইহাতে মুখ ঢাকলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল। লুৎফার প্রবেশ। মাথায় হাত রেখে ডাকলেন)

লুৎফা : নবাব।

সিরাজ : (চমকে উঠে) লুৎফা! তুমি এই প্রকাশ্য দরবারে কেন, লুৎফা?

লুৎফা : অন্ধকারের ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।

সিরাজ : (রুদ্ধ কণ্ঠে)। কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না, লুৎফা। দরবার ফাঁকা হয়ে গেল।

লুৎফা : (কাঁধে হাত রেখে) তবু ভেঙে পড়া চলবে না, জাঁহাপনা। এখান থেকে যখন হলো না তখন যেখানে আপনার বন্ধুরা আছেন, সেখান থেকেই বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে।

সিরাজ : যেখানে আমার বন্ধুরা আছেন? হ্যাঁ আপাতত পাটনায় যেতে পারলে একটা কিছু করা যাবে।

লুৎফা : তাহলে আর বিলম্ব নয়, জাঁহাপনা। এখুনি প্রাসাদ ত্যাগ করা দরকার।

সিরাজ : হ্যাঁ, তাই যাই।

লুৎফা : আমি তার আয়োজন করে ফেলেছি।

সিরাজ : কী আর আয়োজন লুৎফা। দু তিন জন বিশ্বাসী খাদেম সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। তোমরা প্রাসাদেই থাক। আবার যদি ফিরি, দেখা হবে।

লুৎফা : না, আমি যাব আপনার সঙ্গে।

সিরাজ : মানুষের দৃষ্টি থেকে চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে আমাকে পথ চলতে হবে। সে-কষ্ট তুমি সইতে পারবে না লুৎফা।

লুৎফা : পারব। আমাকে পারতেই হবে। বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহংকার? মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মতো তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট? আমি যাব আমি সঙ্গে যাব।

(কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সিরাজ তাঁকে দুহাতে গ্রহণ করলেন।)

[দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৯এ জুন। স্থান : মিরজাফরের দরবার।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, নকিব, মিরজাফর, ক্লাইভ, ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিক, উমিচাঁদ, প্রহরী, মিরন, মোহাম্মদি বেগ।]

(রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভসহ অন্যান্য আমির ওমরাহরা দরবারে আসীন। দরবার কক্ষ এমন আনন্দ-কোলাহলে মুখর যে সেটাকে রাজদরবারের পরিবর্তে নাচ-গানের মজলিস বলেও ভেবে নেওয়া যেতে পারে।)

রাজবল্লভ : কই আসর জুড়িয়ে গেল যে। নতুন নবাব সাহেবের দরবারে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

জগৎশেঠ : ঢাল-তলোয়ার ছেড়ে নবাবি লেবাস নিচ্ছেন খাঁ সাহেব, একটু দেরি তো হবেই। তাছাড়া চুলের নতুন খেজাব, চোখে সুর্মা, দাড়িতে আতর এ সব তাড়াহুড়ার কাজ নয়।

রাজবল্লভ : দর্জি নতুন পোশাকটা নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছেছে কি না কে জানে।

জগৎশেঠ : না না, সে ভাবনা নেই। নবাব আলিবর্দী ইন্তেকাল করার আগের দিন থেকেই পোশাকটি তৈরি। আমি ভাবছি সিংহাসনে বসবার আগেই খাঁ সাহেব সিরাজউদ্দৌলার হারেমে ঢুকে পড়লেন কি না।

রাজবল্লভ : তবেই হয়েছে। বে-শুমার হুর-গেলমানদের বিচিত্র ওড়নার গোলকধাঁধা এড়িয়ে বার হয়ে আসতে খাঁ সাহেবের বাকি জীবনটাই না খতম হয়ে যায়।

(নকিবের ঘোষণা)

নকীব : সুবে বাংলার নবাব, দেশবাসীর ধন-দৌলত, জান-সালামতের জিম্মাদার মির মুহম্মদ জাফর আলি খান দরবারে তসরিফ আনছেন। হুঁশিয়ার... (মিরজাফরের প্রবেশ, সঙ্গে মিরন। সবাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। মিরজাফর ধীরে ধীরে সিংহাসনের কাছে গেলেন। একবার আড়াআড়িভাবে সিংহাসনটা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর একপাশে গিয়ে একটা হাতল ধরে দাঁড়ালেন। দরবারের সবাই কিছুটা বিস্মিত।)

রাজবল্লভ : (সিংহাসনের দিকে ইঙ্গিত করে) আসন গ্রহণ করুন সুবে বাংলার নবাব। দরবার আপনাকে কুর্নিশ করবার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে।

মিরজাফর : (চারিদিক তাকিয়ে) কর্নেল সাহেব এসে পড়লেন বলে।

জগৎশেঠ : কর্নেল সাহেব এসে কোম্পানির পক্ষ থেকে নজরানা দেবেন সে তো দরবারের নিয়ম।

মিরজাফর : হ্যাঁ, উনি এখুনি আসবেন।

রাজবল্লভ : (ঈষৎ অসহিষ্ণু) কর্নেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?

(নকিবের ঘোষণা)

নকীব : মহামান্য কোম্পানির প্রতিনিধি কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বাহাদুর, দরবার হুশিয়ার ...

(ক্লাইভের প্রবেশ। সঙ্গে ওয়াট্স কিলপ্যাট্রিক। গোটা দরবার সন্ত্রস্ত। মিরজাফরের মুখ আনন্দে ভরে উঠল।)

ক্লাইভ : লং লিভ জাফর আলি খান। বাট হোয়াট ইজ দিস? নবাব মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি কি নবাব না ফকির?

মিরজাফর : (বিনয়ের সঙ্গে) কর্নেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে আমি মসনদে বসবো না।

ক্লাইভ : (প্রচণ্ড বিস্ময়ে) হোয়াট? দিস ইজ ফ্যান্টাসটিক আই মাস্ট সে। আপনি নবাব, এ মসনদ আপনার। আমি তো আপনার রাইয়াৎ–আপনাকে নজরানা দেব।

মিরজাফর : মিরজাফর বেইমান নয়, কর্নেল ক্লাইভ। বাংলার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসব, তা না হলে নয়।

ক্লাইভ : (ওয়াটসকে নিচু স্বরে) নো ক্লাউন উইল এভার বিট হিম। (দরবারের উদ্দেশে) আমাকে লজ্জায় ফেলেছেন নবাব জাফর আলি খান। আই এম কমপ্লিটলি ওভারহোয়েলমড। বুঝতে পারছিনে কী করা দরকার। (এগিয়ে গিয়ে মিরজাফরের হাত ধরল। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে দিতে) জেন্টেলমেন, আই প্রেজেন্ট ইউ দ্যা নিউ নবাব, হিজ একসেলেন্সি জাফর আলি খান। আপনাদের নতুন নবাব জাফর আলি খানকে আমি মসনদে বসিয়ে দিলাম। মে গড হেল্প হিম অ্যান্ড হেল্প ইউ অ্যাজ ওয়েল।

ওয়াটস ও
কিলপ্যাট্রিক : হিপ হিপ হুররে।

(মিরজাফর মসনদে বসলেন। দরবারের সবাই কুর্নিশ করল।)

ক্লাইভ : আপনাদের দেশে আবার শান্তি আসল।

(কিলপ্যাট্রিকের কাছ থেকে একটি সুদৃশ্য তোড়া নিয়ে নবাবের পায়ের কাছে রাখল)

ক্লাইভ : কোম্পানির তরফ থেকে আমি নবাবের নজরানা দিলাম।

ওয়াট্স ও
কিলপ্যাট্রিক : লং লিভ জাফর আলি খান।

(একে একে অন্যেরা নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করতে লাগল। হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে উমিচাঁদের প্রবেশ। দৌড়ে ক্লাইভের কাছে গিয়ে)

উমিচাঁদ : আমাকে খুন করে ফেলো– আমাকে খুন করে ফেলো। (ক্লাইভের তলোয়ারের খাপ টেনে নিয়ে নিজের বুকে ঠুকতে ঠুকতে) খুন কর, আমাকে খুন কর।

মিরজাফর : কী হয়েছে? ব্যাপার কী?

উমিচাঁদ : ওহ সব বেইমান-বেইমান! না, আমি আত্মহত্যা করব। (নিজের গলা সবলে চেপে ধরল। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুতে লাগল। ক্লাইভ সবলে তার হাত ছাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে)

ক্লাইভ : হাউ ইউ গন ম্যাড?

উমিচাঁদ : ম্যাড বানিয়েছ। এখন খুন করে ফেলো। দয়া করে খুন করো কর্নেল সাহেব।

ক্লাইভ : ডোন্ট বি সিলি। কী হয়েছে তা তো বলবে?

উমিচাঁদ : আমার টাকা কোথায়?

ক্লাইভ : কিসের টাকা?

উমিচাঁদ : দলিলে সই করে দিয়েছিলে, সিরাজউদ্দৌলা হেরে গেলে আমাকে বিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

ক্লাইভ : কোথায় সে দলিল?

উমিচাঁদ : তোমরা জাল করেছ। (দৌড়ে সিংহাসনের কাছে গিয়ে) আপনি বিচার করুন। আপনি নবাব, সুবিচার করুন।

ক্লাইভ : আমি এর কিছুই জানিনে।

উমিচাঁদ : তা জানবে কেন সাহেব। নবাবের রাজকোষ বাঁটোয়ারা করে তোমার ভাগে পড়েছে একুশ লাখ টাকা। সকলের ভাগেই অংশ মতো কিছু না কিছু পড়েছে। শুধু আমার বেলাতে ...

(ক্রন্দন)

ক্লাইভ : (সবলে উমিচাঁদের বাহু আকর্ষণ করে) ইউ আর ড্রিমিং ওমিচান্দ, তুমি খোয়াব দেখছ।

উমিচাঁদ : খোয়াব দেখছি? দলিলে পরিষ্কার লেখা বিশ লক্ষা টাকা পাব। তুমি নিজে সই করেছ।

ক্লাইভ : আমি সই করলে আমার মনে থাকত। তোমার বয়স হয়েছে-মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ কর – ঈশ্বরকে ডাক। মন ভালো হবে। (উমিচাঁদকে কিলপ্যাট্রিকের হাতে দিয়ে দিল। সে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেল। উমিচাঁদ চিৎকার করতে লাগল: আমার টাকা, আমার টাকা।)

ক্লাইভ : উমিচাঁদের মাথা খারাপ হয়েছে। ইওর এক্সিলেন্সি, মে ফরগিভ আস।

জগৎশেঠ : এমন শুভ দিনটা থমথমে করে দিয়ে গেল।

ক্লাইভ : ভুলে যান। ও কিছু নয়। (নবাবের দিকে ফিরে) আমার মনে হয় আজ প্রথম দরবারে নবাবের কিছু বলা উচিত।

রাজবল্লভ : নিশ্চয়ই। প্রজাসাধারণ আশ্বাসে আবার নতুন করে বুক বাঁধবে। রাজকার্য পরিচালনায় কাকে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে তা-ও মোটামুটি তাদেরকে জানানো দরকার।

মিরজাফর : (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে–পাগড়ি ঠিক করে) আজকের এই দরবারে আমরা সরকারি কাজ আরম্ভ করার আগে কর্নেল ক্লাইভকে শুকরিয়া জানাচ্ছি তাঁর আন্তরিক সহায়তার জন্যে। বিনিময়ে আমি তাকে ইনাম দিচ্ছি বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি চব্বিশ পরগণার স্থায়ী মালিকানা।

(ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক এক সঙ্গে : হুররে। ক্লাইভ হাসিমুখে মাথা নোয়ালো।)

মিরজাফর : দেশবাসীকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাঁদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে। সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারের হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এখন থেকে কারও শান্তিতে আর কোনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী : সেনাপতি মিরকাশেমের দূত।

মিরজাফর : হাজির কর।

(বসলেন। দূতের প্রবেশ। মিরন দ্রুত তার কাছে এগিয়ে এল। মিরনের হাতে পত্র প্রদান। মিরন পত্র খুলেই উল্লসিত হয়ে উঠল।)

মিরন : পলাতক সিরাজউদ্দৌলা মিরকাশেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দি হয়েছে। তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছে।

(মিরজাফরের হাতে পত্র প্রদান)

ক্লাইভ : ভালো খবর। ইউ ক্যান ফিল রিয়েলি সেফ নাও।

মিরজাফর : কিন্তু তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবার কী দরকার? বাইরে যে কোনো জায়গায় আটকে রাখলেই তো চলত।

ক্লাইভ : (রুখে উঠল) নো, ইওর অনার। এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। শাসন চালাতে হলে মনে দুর্বলতা রাখলে চলবে না। আপনি যে শাসন করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, দেশের লোকের মনে সে কথা জাগিয়ে রাখতে হবে এভরি মোমেন্ট। কাজেই সিরাজউদ্দৌলা শিকল-বাঁধা অবস্থায় পায়ে হেঁটে সবার চোখের সামনে দিয়ে আসবে জাফরগঞ্জের কয়েদখানায়। কোনো লোক তার জন্যে এতটুকু দয়া দেখালে তার গর্দান যাবে। এখন মসনদের মালিক নবাব জাফর আলি খান। সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে সিমপ্যাথি দেখাবে সে ট্রেটার। আর আইনে ট্রেটারের শাস্তি মৃত্যু। অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ ইউ মাস্ট রুল।

মিরজাফর : আপনারা সবাই শুনেছেন আশা করি। সিরাজকে বন্দি করা হয়েছে। যথাসময়ে তার বিচার হবে। আমি আশা করি কেউ তার জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।

ক্লাইভ : ইয়েস। তাছাড়া মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে যখন তাকে সোলজাররা টানতে টানতে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দুধার থেকে অর্ডিনারি পাবলিক তার মুখে থুথু দেবে – দে মাস্ট স্পিট অন হিজ ফেস।

মিরজাফর : অতটা কেন?

ক্লাইভ : আমি জানি হি ইজ এ ডেড্ হর্স। কিন্তু এটা না করলে লোকে আপনার ক্ষমতা দেখে ভয় পাবে কেন? পাবলিকের মনে টেরর জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার গ্রানাইট ফাউন্ডেশন।

(মিরজাফর মসনদ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দরবারে কাজ শেষ হলো। নবাব দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অমাত্যরা এবং তার পেছনে অন্য সকলে। মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গেল; কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। ধীরে ধীরে মঞ্চে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। কথা বলতে বলতে ক্লাইভ এবং মিরনের প্রবেশ।)

ক্লাইভ : আজ রাত্রেই কাজ সারতে হবে। এসব ব্যাপারে চান্স নেওয়া চলে না।

মিরন : কিন্তু হুকুম দেবে কে? আব্বা রাজি হলেন না।

ক্লাইভ : রাজবল্লভকে বল।

মিরন : তিনি নাকি অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাই করা গেল না।

ক্লাইভ : দেন?

মিরন : রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ-ওরাও রাজি হলেন না।

ক্লাইভ : তাহলে তোমাকে সেটা করতে হবে।

মিরন : প্রহরীরা আমার হুকুম শুনবে কেন?

ক্লাইভ : তোমার নিজের হাতেই সিরাজউদ্দৌলাকে মারতে হবে ইন ইওর ওন ইনটারেস্ট। সে বেঁচে থাকতে তোমার কোনো আশা নেই। নবাবি মসনদ তো পরের কথা, আপাতত হোয়াট অ্যাবাউট দ্যা লাভলি প্রিন্সেস? লুৎফুন্নিসা তোমার কাছে ধরা দেবে কেন সিরাজউদ্দৌলা জীবিত থাকতে?

মিরন : আমি একজন লোকের ব্যবস্থা করেছি। সে কাজ করবে, কিন্তু তোমার হুকুম চাই।

ক্লাইভ : হোয়াট এ পিটি, হায়ার্ড কিলাররা পর্যন্ত তোমার কথায় বিশ্বাস করে না। এনি ওয়ে, ডাক তাকে।

(মিরন বেরিয়ে গেল এবং মোহাম্মদি বেগকে নিয়ে ফিরে এল।)

মিরন : মোহাম্মদি বেগ।

ক্লাইভ : তুমি রাজি আছ?

মোহাম্মদি বেগ : দশ হাজার টাকা দিতে হবে। পাঁচ হাজার অগ্রিম।

ক্লাইভ : এগ্রিড (মিরনকে) ওকে টাকাটা এখুনি দিয়ে দাও।

(মিরন এবং মোহাম্মদি বেগ বেরুবার উপক্রম করল)

ক্লাইভ : দেয়ার মে বি ট্রাবল, অবস্থা বুঝে কাজ কর, বি কেয়ারফুল। কাজ ফতে হলেই আমাকে খবর দেবে, যাও।

(ওরা বেরিয়ে গেল। ক্লাইভের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করে বললো)

ইট ইজ এ মাস্ট।

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : দোসরা জুলাই। স্থান : জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে–কারা-প্রহরী, সিরাজ, মিরন, মোহাম্মদি বেগ]

(প্রায়-অন্ধকার কারাকক্ষে সিরাজউদ্দৌলা। এক কোণে একটি নিরাবরণ দড়ির খাটিয়া, অন্য প্রান্তে একটি সোরাহি এবং পাত্র। সিরাজ অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন আর বসছেন। কারাকক্ষের বাইরে প্রহরারত শান্ত্রী। মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগের প্রবেশ। তার দুহাত বুকে বাঁধা। ডান হাতে নাতিদীর্ঘ মোটা লাঠি। প্রহরী দরজা খুলতেই কামরায় একটুখানি আলো প্রতিফলিত হলো।)

সিরাজ : (খাটিয়ায় উপবিষ্ট–আলো দেখে চমকে উঠে) কোথা থেকে আলো আসছে। বুঝি প্রভাত হয়ে এল।

(খাটিয়া থেকে উঠে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এল। মঞ্চের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগ।)

সিরাজ : (মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত তুলে) এ প্রভাত শুভ হোক তোমার জন্যে, লুৎফা। শুভ হোক আমার বাংলার জন্যে। নিশ্চিত হোক বাংলার প্রত্যেকটি নরনারী। আলহামদুলিল্লাহ।

মিরন : আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান।

সিরাজ : (চমকে উঠে) মিরন! তুমি এ সময়ে এখানে? আমাকে অনুগ্রহ দেখাতে এসেছ, না পীড়ন করতে?

মিরন : তোমার অপরাধের জন্য নবাবের দণ্ডাজ্ঞা শোনাতে এসেছি।

সিরাজ : নবাবের দণ্ডাজ্ঞা?

মিরন : বাংলার প্রজাসাধারণকে পীড়নের জন্যে, দরবারের পদস্থ আমির ওমরাহদের মর্যাদাহানির জন্যে, বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আইনসঙ্গত বাণিজ্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করবার জন্যে, অশান্তি এবং বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে তুমি অপরাধী। নবাব জাফর আলি খান এই অপরাধের জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

সিরাজ : মৃত্যুদণ্ড? জাফর আলি খান স্বাক্ষর করেছেন? কই দেখি।

মিরন : আসামির সে অধিকার থাকে নাকি? (পেছনে ফিরে) মোহাম্মদি বেগ।

মোহাম্মদি বেগ : জনাব।

মিরন : নবাবের হুকুম তামিল কর।

(সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মোহাম্মদি বেগ লাঠিটা মুঠো করে ধরে সিরাজের দিকে এগোতে লাগল)

সিরাজ : প্রথমে মিরন, তারপর মোহাম্মদি বেগ। মিরন তবু মিরজাফরের পুত্র, কিন্তু তুমি মোহাম্মদি বেগ, তুমি আসছ আমাকে খুন করতে?

(মোহাম্মদি বেগ তেমনি এগোতে লাগল। সিরাজ হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে।)

সিরাজ : আমি মৃত্যুর জন্যে তৈরি। কিন্তু তুমি এ কাজ কোরো না মোহাম্মদি বেগ।

(মোহাম্মদি বেগ তবু এগোচ্ছে। সিরাজ আরও ভীত)

সিরাজ : তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদি বেগ। অতীতের দিকে চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো। আমার আব্বা-আম্মা পুত্রস্নেহে তোমাকে পালন করেছেন। তাঁদেরই সন্তানের রক্তে সে-স্নেহের ঋণ-আঃ ...

(লাঠি দিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। সিরাজ লুটিয়ে পড়ল। মোহাম্মদি বেগ স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগল মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। ডান হাতের কনুই এবং বাঁ হাতের তালুতে ভর দিয়ে সিরাজ কিছুটা মাথা তুললেন।)

সিরাজ : (স্খলিত কণ্ঠে) লুৎফা, খোদার কাছে শুকরিয়া, এ পীড়ন তুমি দেখলে না।

(মোহাম্মদি বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের লুণ্ঠিত দেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার পিঠে পর পর কয়েকবার ছোরার আঘাত করল। সিরাজের দেহে মৃত্যুর আকুঞ্চন। মোহাম্মদি বেগ উঠে দাঁড়াল)

সিরাজ : (ঈষৎ মাথা নাড়বার চেষ্টা করতে করতে মৃত্যু-নিস্তেজ কণ্ঠে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ...

(মোহাম্মদি বেগ লাথি মারল। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের জীবন শেষ হলো। শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল।)

মোহাম্মদি বেগ : (উল্লাসের সঙ্গে) হা হা হা ...

টীকা ও চরিত্র-পরিচিতি

আলিবর্দি (মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ) : (১৬৭৬–১০.০৪.১৭৫৬ খ্রি.)। প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলি। তিনি ১৭৪০ সাল থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। আলিবর্দি খাঁর বাবা ছিলেন আরব দেশীয় এবং মা তুর্কি। ইরানের (পারস্য) এই সামান্য সৈনিক ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। চাকরির উদ্দেশে দিল্লিতে এসে সুবিধা করতে না পেরে তিনি বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনের দরবারের পারিষদ ও পরে একটি জেলার ফৌজদার নিযুক্ত হন। ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁর অগ্রজ হাজি আহ্‌মদের বুদ্ধিতে সুজাউদ্দিন বাংলার মসনদে বসেন। খুশি হয়ে সুজাউদ্দিন তাঁকে 'আলিবর্দি' উপাধি দিয়ে রাজ্যের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বিহার বাংলার সঙ্গে যুক্ত হলে তিনি বিহারের নায়েব সুবা পদে অভিষিক্ত হন। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর নবাব হন তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ। কিন্তু বিহারের সুবেদার আলিবর্দি খাঁ তখন অপরিসীম শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী। অমাত্যবর্গও তাঁর অনুগত। অবশেষে ১৭৪০ সালের ৯ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদের কাছে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত করে আলিবর্দি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত হন।

আলিবর্দি খাঁ ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ শাসক। তিনি শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠত করেন। বর্গিদের অত্যাচারে দেশের মানুষ যখন অতিষ্ট তখন তিনি কঠিন হাতে তাদের দমন করেন। বর্গি প্রধান ভাস্কর পণ্ডিতসহ তেইশজন নেতাকে তিনি কৌশলে হত্যা করেন এবং বর্গিদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। একইভাবে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বিবেচনায় রেখে ইউরোপীয় বণিকদের উচ্ছেদ না করে কৌশলে তাদের দমিয়ে রাখেন। এভাবে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

আলিবর্দি খাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তিন কন্যা ঘসেটি বেগম (মেহেরুন্নেসা), শাহ বেগম ও আমিনা বেগমকে তিনি তাঁর ভাই হাজি মুহম্মদের তিন পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। আশি বছর বয়সে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি ১০ই এপ্রিল ১৭৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত হন। সিরাজ ছিলেন আলিবর্দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। আলিবর্দির ইচ্ছা অনুযায়ী সিরাজ নবাব হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

মিরজাফর : মিরজাফর আলি খাঁন পারস্য (ইরান) থেকে নিঃস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষে আসেন। উচ্চ বংশীয় যুবক হওয়ায় নবাব আলিবর্দি খাঁন তাকে স্নেহ করতেন এবং বৈমাত্রেয় ভগ্নী শাহ খানমের সঙ্গে মিরজাফরের বিয়ে দেন। আলিবর্দি তাকে সরকারের উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি কূটকৌশল ও চাতুর্যের মাধ্যমে নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন এবং সেনাপতি ও বকশির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার মেধা, বুদ্ধি ও কৌশলের মূলে ছিল ক্ষমতালিপ্সা। ফলে আলিবর্দিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে দুর্নীতির অভিযোগে তাকে একাধিক বার ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন নবাব। আবার বার বার ক্ষমা পাওয়া সত্ত্বেও তার চরিত্রের বিশ্বাসঘাতকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর যুবক সিরাজউদ্দৌলা নবাব হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করলে চারদিকে ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইংরেজদের সীমাহীন লোভ ও স্বার্থপরতার ষড়যন্ত্রে অনেক রাজ অমাত্যের সঙ্গে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মিরজাফর। ইংরেজদের প্রলোভনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি তখন নীতি-নৈতিকতাহীন এক উন্মাদে পরিণত হন। তাই পলাশির যুদ্ধে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়েও এবং পবিত্র কোরান ছুঁয়ে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করলেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতার পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। বরং পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজের পতনকে ত্বরান্বিত করার জন্য দেশপ্রেমিক সৈনিকদের যুদ্ধ করার সুযোগ দেননি। পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজের পতনের পর ক্লাইভের গাধা বলে পরিচিত মিরজাফর ১৭৫৭ সালের ২৯এ জুন ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে আরোহণ করেণ। কিন্তু ইংরেজদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনায় তাকে গদিচ্যুত করে তার জামাতা মিরকাসিমকে বাংলার মসনদে বসান। ১৭৬৪ সালে পুনরায় তাকে সিংহাসনে বসানো হয়। ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া এই বিশ্বাসঘাতক মানুষটি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ সালে মারা যান। বাংলার ইতিহাসে মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক, নিকৃষ্ট মানুষের প্রতীক। ফলে মিরজাফর ও বিশ্বাসঘাতক সমার্থক হয়ে উঠল।

ক্লাইভ : পিতা-মাতার অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল সন্তান ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। তার দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে বাবা-মা তাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। তখন তার বয়স মাত্র সতেরো বছর। কোম্পানির ব্যবসার মাল ওজন আর কাপড় বাছাই করতে করতে বিরক্ত হয়ে ক্লাইভ দুইবার পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু গুলি চলেনি বলে বেঁচে যান ভাগ্যবান ক্লাইভ।

ফরাসিরা এদেশে বাণিজ্য বিস্তার ও রাজ্যজয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বাজার দখল ও রাজ্য জয়কে কেন্দ্র করে তখন ফরাসিদের বিরুদ্ধে চলছিল ইংরেজ বণিকদের যুদ্ধ। সেইসব ছোটখাটো যুদ্ধে সৈনিক ক্লাইভ একটার পর একটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বোম্বাই এর মারাঠা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে কর্নেল পদবি লাভ করেন এবং মাদ্রাজের ডেপুটি গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন।

সে সময় সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করে নেন। ইংরেজ পক্ষের গভর্নর ড্রেক পালিয়ে যান। কিন্তু কর্নেল ক্লাইভ অধিক সংখ্যক সৈন্যসামন্ত নিয়ে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে দুর্গ দখল করে নেন।

তারপর চলল মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে দরকষাকষি। ক্লাইভ ছিলেন যেমন ধূর্ত তেমনি সাহসী; আবার যেমন মিথ্যাবাদী তেমনি কৌশলী। চারদিক থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে তিনি তরুণ নবাবকে বিভ্রান্ত ও বিব্রত করার জন্য চেষ্টা করেন। নবাবের অধিকাংশ লোভী, স্বার্থপর, শঠ ও বিশ্বাসঘাতক অমাত্য ও সেনাপতিদের উৎকোচ ও প্রলোভন দিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন। অবশেষে তার নেতৃত্বে চন্দননগরে ফরাসি কুঠি আক্রমণ করা হয়। ফরাসিরা পালিয়ে যান। এবার ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩এ জুন পলাশি প্রান্তরে ক্লাইভের নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ শঠতার ও বিশ্বাসঘাতকতার। সিরাজউদ্দৌলার অধিকাংশ সেনাপতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে খুব সহজেই ক্লাইভের সৈন্য জয়লাভ করে।

ক্লাইভ বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসান। কিন্তু প্রকৃত শাসনকর্তা হন তিনি নিজেই। মিরজাফর তার অনুগ্রহে নামেমাত্র রাজ্য পরিচালনা করতেন। ১৭৬০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে মহাবিত্তশালী, বিজয়ী ক্লাইভ দেশে ফিরে যান। এ সময় তার বার্ষিক আয় ৪ লক্ষ টাকা।

১৭৬৪ সালের জুন মাসে ক্লাইভ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অসীম ক্ষমতা নিয়ে আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ১৭৬৭ সালের জুলাই মাসে যখন তিনি চির দিনের জন্য লন্ডনে ফিরে যান তখন তিনি হতোদ্যম, অপমানিত ও লজ্জিত। ভারত লুণ্ঠনের বিপুল অর্থ ব্রিটিশ কোষাগারে না-রেখে আত্মসাৎ করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানো হয়। তিনি লজ্জায় ও অপমানে বিষণ্ণতা রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৭৭৪ সালে ২২এ নভেম্বর আত্মহত্যা করেন।

উমিচাঁদ : উমিচাঁদ লাহোরের অধিবাসী শিখ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি গোমস্তার কাজ করতেন। পরে ইংরেজদের ব্যবসার দালালি করতে শুরু করেন। মাল কেনা-বেচার জন্য দালালদের তখন বেশ প্রয়োজন ছিল। দালালি ব্যবসা করে উমিচাঁদ কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন। কখনো কখনো নবাবের প্রয়োজনে উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়ে নবাবের দরবারে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। প্রচুর টাকার অধিকারী হয়ে উমিচাঁদ দেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ শুরু করেন। উমিচাঁদ বড় ধুরন্ধর ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজদের কথা নবাবের কাছে এবং নবাবের কথা ইংরেজদের কাছে বলে দু পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন। গভর্নর রোজার ড্রেক তাকে একবার বন্দি করে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে রেখেছিলেন। উমিচাঁদ মিরজাফর প্রমুখদের নবাব বিরোধী চক্রান্ত ও শলাপরামর্শের সহযোগী ছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে অন্যদের যে ১৫ দফা গোপন চুক্তি হয় তাতে উমিচাঁদ গো ধরে লিখিয়ে নিয়েছিলেন, ইংরেজরা জয়ী হলে তাকে কুড়ি লক্ষ টাকা দেবে। কিন্তু ক্লাইভ ছিলেন বিস্ময়কর কূটকৌশলী মানুষ। তিনি সাদা ও লাল দুইরকম দলিল করে জাল দলিলটা উমিচাঁদকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সাদা দলিলটা ছিল ক্লাইভের কাছে এবং তাতে উমিচাঁদের দাবির কথা উল্লেখ ছিল না।

যুদ্ধ জয়ের পরে উমিচাঁদ ক্লাইভের এই ভাঁওতা বুঝতে পেরে টাকার শোকে পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরেছেন এবং অকালে মারা গেছেন। এদেশে ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পেছনে উমিচাঁদের ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতা অনেকাংশে দায়ী।

ওয়াটস : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিম বাজার কুঠির পরিচালক ছিলেন উইলিয়াম ওয়াটস। ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে নবাবের দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি হিসেবে প্রবেশাধিকার ছিল তার। নাদুসনুদুস মোটাসোটা এবং দেখতে

সহজ-সরল এই লোকটি ছিলেন আদর্শ ও নীতিনৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ। সর্বপ্রকার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে তার জুড়ি ছিল না। মিরজাফরসহ অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে তিনি সর্বদা যোগাযোগ রাখতেন এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান সহায়ক ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। নারীর ছদ্মবেশে ষড়যন্ত্রের সভায় উপস্থিত হয়ে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ প্রমুখদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। নবাব একবার তাকে বন্দি করেছিলেন আর একাধিকবার তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রাজবল্লভদের পরামর্শে নবাব তাকে ক্ষমা করেন। হতোদ্যম ওয়াটস দেশে ফিরে যান এবং অকালে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু ওয়াটসের স্ত্রী এদেশের অন্য একজন ইংরেজ যুবককে বিয়ে করে থেকে যান।

ওয়াটসন (অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন) : ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। ওয়াটসন ছিলেন ব্রিটিশ রাজের কমিশন পাওয়া অ্যাডমিরাল। ১৭৫৬ সালের অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখে মাদ্রাজ থেকে সৈন্যসামন্তসহ পাঁচখানি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে তিনি কলকাতার দিকে রওনা হন। কলকাতা তখন ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার দখলে। আর ইংরেজরা ফলতা অঞ্চলে পালিয়ে যান। ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য ক্লাইভের সঙ্গে যুক্ত হন ওয়াটসন। ১৫ই ডিসেম্বর ক্লাইভ ও ওয়াটসনের সেনাবাহিনী কলকাতায় পৌঁছায়। নবাবের ফৌজদার মানিকচাঁদকে তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজরা কলকাতা দখল করেন। ওয়াটসন হলেন কোম্পানির সিলেক্ট কমিটির মেম্বার। ওয়াটসন মনে মনে ক্লাইভের ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। উমিচাঁদকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য যে জাল দলিলে ক্লাইভ ও মিরজাফর প্রমুখেরা সই করেছিলেন তাতে ওয়াটসন সই দেননি। তার সই নকল করা হয়েছিল। অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নৌবাহিনীর নেতৃত্বের জন্য ইংরেজরা অতি সহজে চন্দননগরের ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন পলাশির যুদ্ধের দুমাস পরেই অসুস্থ হয়ে কলকাতায় মারা যান। সেন্ট জোন্স গোরস্থানে তাঁর কবর আছে।

হলওয়েল : লন্ডনের গাইস হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি পাস করে হলওয়েল কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। পাটনা ও ঢাকার অফিসে কিছুকাল চাকরি করে ১৭৩২ সালে তিনি সার্জন হয়ে কলকাতায় আসেন। তখন তার মাইনে ছিল পঞ্চাশ টাকা মাত্র। সুতরাং অবৈধভাবে বিপুল অর্থ-ঐশ্বর্য লাভের আশায় তিনি সিভিল সার্ভিসে চাকরি নেন। ১৭৫২ সালে তিনি চব্বিশ পরগনার জমিদারের দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধের সময় তিনি ফোর্টের অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হন।

সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলে কোম্পানির গভর্নর ড্রেক, সৈন্যাধ্যক্ষ মিনসিনসহ সবাই নৌকায় চড়ে পালিয়ে যান। তখন ডা. হলওয়েল কলকাতার সৈন্যাধ্যক্ষ ও গভর্নর হন। কিন্তু সিরাজের আক্রমণের কাছে টিকতে পারননি। সিরাজের বাহিনী হলওয়েলকে বন্দি করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন।

মিথ্যা বলে অতিরঞ্জিত করে অসত্য ও অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে এবং তাঁর শাসনামলকে কলঙ্কিত করা ছিল হলওয়েলের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশেই তিনি অন্ধকূপ হত্যা কাহিনি (Black Hole Tragedy) বানিয়েছিলেন। তার বানানো গল্পটি হলো : নবাব দুর্গ জয় করে ১৮ ফুট লম্বা এবং ১৫ ফুট চওড়া একটি ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখেন–যে ঘরের চারদিক ছিল বন্ধ। সকালে দেখা গেল ১২৩ জন ইংরেজ মারা গেছেন। অথচ দুর্গে তখন ১৪৬ জন ইংরেজ ছিলেনই না। আর এমন ছোট একটি ঘরে ১৪৬ জন মানুষ কিছুতেই সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। অথচ তার হিসাব-নিকাশ বোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছিল। আর এই মিথ্যাকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তিনি কলকাতায় ব্লাক হোল মনুমেন্ট নির্মাণ করেছিলেন। পরে গর্ভনর ওয়ারেন হেস্টিংস এই মনুমেন্ট সরিয়ে দেন।

ঘসেটি বেগম : নবাব আলিবর্দি খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম তথা মেহেরুন্নেসা। আলিবর্দি খানের বড় ভাই হাজি আহমদের বড় ছেলে নওয়াজিস মোহাম্মদ শাহমৎ জঙ্গের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাদের কোনো সন্তান ছিল না। তাই তিনি ছোট বোন আমিনা বেগমের ছেলে অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলার ভাই একরামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রত্যাশা ছিল যে, একরামউদ্দৌলা নবাব হলে নবাব মাতা হিসেবে রাজকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু একরামউদ্দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করলে ঘসেটি বেগম নৈরাশ্যে আক্রান্ত হন।

ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজিস মোহম্মদ ছিলেন ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী ব্যক্তি। তিনি নিজে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তার সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁ। এই হোসেন কুলি খাঁয়ের

সঙ্গে ঘসেটি বেগমের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল বলে অনুমান করা হয়। ফলে আলিবর্দি খানের নির্দেশে সিরাজউদ্দৌলা হোসেন কুলী খাঁকে হত্যা করেন। ঘসেটি বেগম এই হত্যাকাণ্ডকে কখনই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি সিরাজউদ্দৌলার প্রতি সর্বদাই ছিলেন প্রতিশোধ-পরায়ণ।

বিক্রমপুরের অধিবাসী রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় নওয়াজেস মোহাম্মদের দেওয়ান ছিলেন। ঘসেটি বেগম রাজবল্লভের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা যথাসময়ে এই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে যান এবং ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। খালা ঘসেটি বেগমকে তিনি মুর্শিদাবাদের সুরম্য মতিঝিল প্রাসাদ থেকে সরিয়ে দিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রায় বন্দি অবস্থায় রাখেন এবং তার সমস্ত টাকাকড়ি, গয়নাগাটি ও সোনাদানা বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। তিনি নানা কৌশলে নবাব সিরাজের বিশ্বাসঘাতক আমাত্য ও ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ঘসেটি বেগম ও তার দলবলের বিজয় হলেও আর দশজন বিশ্বাসঘাতকের মতো তার পরিণতিও ছিল বেদনাবহ। প্রথমে তাকে ঢাকায় অন্তরীণ করা হয়। পরে মিরনের চক্রান্তে বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষার সন্ধিস্থলে ফেলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

ড্রেক : রোজার ড্রেক ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার গভর্নর। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করেন। নবাবের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে প্রাণ ভয়ে সঙ্গী-সাথিদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে ফেলে তিনি নৌকায় চড়ে কলকাতা ছেড়ে ফলতায় পালিয়ে যান।

পুনরায় ক্লাইভ কলকাতা অধিকার করলে ড্রেক গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর কোম্পানি ড্রেকের পরিবর্তে রবার্ট ক্লাইভকে কলকাতার গভর্নর নিযুক্ত করে। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পরে গভর্নর ড্রেককে মিরজাফর তার রাজকোষ থেকে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

মানিকচাঁদ : রাজা মানিকচাঁদ ছিলেন নবাবের অন্যতম সেনাপতি। তিনি বাঙালি কায়স্থ, ঘোষ বংশে তার জন্ম। নবাবের গোমস্তা হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। পরে আলিবর্দির সুনজরে পড়ে মুর্শিদাবাদে সেরেস্তাদারি পেয়েছিলেন। ১৭৫৬ সালে জুন মাসে কলকাতা দখল করে নবাব কলকাতা শহরের আলি নগর নামকরণ করেন। আর মাণিকচাঁদকে করেন কলকাতার গভর্নর।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মানিকচাঁদ ইংরেজদের সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে কলকাতা পৌঁছে মানিকচাঁদকে পত্র লিখে তার সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেন। এক সময় নবাব সিরাজ মানিকচাঁদকে কলকাতার সোনাদানা লুঠ করে কুক্ষিগত করার অপরাধে বন্দি করেন। অবশেষে রায়দুর্লভদের পরামর্শে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে মানিকচাঁদ মুক্তি পেয়েছিলেন। মানিকচাঁদ ক্লাইভের সঙ্গে যুদ্ধ না-করে কলকাতা ছেড়ে হুগলি পলায়ন করেছিলেন এবং পলাশির যুদ্ধের পূর্বে ক্লাইভকে বিনা বাধায় মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিলেন।

জগৎশেঠ : জগৎশেঠ জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর পেশা ছিল ব্যবসায়। বহুকাল ধরে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে এই সমাজেরই অংশ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তার প্রকৃত নাম ফতেহ চাঁদ। জগৎশেঠ তার উপাধি। এর অর্থ হলো জগতের টাকা আমদানিকারী বা বিপুল অর্থের অধিকারী কিংবা অর্থ লগ্নির ব্যবসায়ী। নবাব সরফরাজ খাঁকে হটিয়ে আলিবর্দিকে সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল। সুতরাং তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে করেছিলেন যে, নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাদের বশীভূত থাকবেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দিবেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা সততা ও নিষ্ঠায় ভিন্ন প্রকৃতির এক যুবক। তিনি কিছুতেই এদের অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। বরং জগৎশেঠকে তার ষড়যন্ত্রের জন্য বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত করেছেন। জগৎশেঠও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার পতনে নিষ্ঠুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আমিনা বেগম : নবাব আলিবর্দির কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগম। আলিবর্দির বড় ভাই হাজি আহমদের পুত্র জয়েন উদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর তিন সন্তান। এরা হলেন মির্জা মুহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা, একরামউদ্দৌলা ও মির্জা হামদি। স্বামী জয়েননউদ্দিন ও পুত্র সিরাজউদৌলার জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর জীবনও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিল। স্বামী জয়েনউদ্দিন প্রথমে উড়িষ্যার ও পরে বিহারের সুবেদার ছিলেন। ১৭৪৮ সালে আফগান অধিপতি আহমদ শাহ দুররানি পাঞ্জাব আক্রমণ

করলে নবাব আলিবর্দির আফগান সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং পাটনা অধিকার করেন। বিদ্রোহীরা নবাবের বড় ভাই হাজি আহম্মদ ও জামাতা জয়েনউদ্দিনকে হত্যা করেন।

অতি অল্প বয়সে বিধবা আমিনা বেগম পুত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার মাতা হিসেবেও শান্তি লাভ করতে পারেননি। দেশি-বিদেশি বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে নবাব পরাজিত ও নিহত হলে এবং একটি হাতির পৃষ্ঠে তাঁর মরদেহ নিয়ে এলে মা আমিনা বেগম দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আর্তনাদ করতে করতে ছেলেকে শেষবারের মতো দেখতে ছুটে আসেন। এ সময় মিরজাফরের রক্ষীরা তাঁর উপর চড়াও হয় এবং তাঁকে নির্যাতন করে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দেয়। আমিনার এক পুত্র একরামউদ্দৌলা পূর্বেই বসন্ত রোগে মারা যান। পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা মিরজাফর ও অন্যান্য অমাত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত ও নিহত হন। কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা হামদিকেও মিরনের আদেশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আর আমিনা বেগমকে হাত-পা বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়ে নিমর্মভাবে হত্যা করা হয়।

মিরন : বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের তিন পুত্র। তারা হলেন : জ্যেষ্ঠ মিরন, মেজো নাজমুদ্দৌলা এবং কনিষ্ঠ সাইফুদ্দৌলা। মিরন পিতার মতই দুশ্চরিত্র, ব্যাভিচারী, নিষ্ঠুর এবং ষড়যন্ত্রকারী। মিরজাফরের সঙ্গে অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক রাজ-অমাত্যদের যোগাযোগের কাজ করতেন মিরন। তারই ষড়যন্ত্রে এবং ব্যবস্থায় মোহাম্মদি বেগ হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। মিরন সিরাজউদ্দৌলার মধ্যম ভ্রাতা মৃত একরামউদ্দৌলার পুত্র মুরাদউদ্দৌলাকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। তিনি সিরাজের প্রিয়তমা স্ত্রীকে বিবাহ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লুৎফুন্নেসার তীব্র বিরোধিতার জন্য তার এই অভিলাষ পূর্ণ হয়নি। মিরনের অপরাধ ও পাপের সীমা নাই। বজ্রাঘাতে অকালে মারা যান এই কুৎসিত স্বভাবের মানুষটি।

মিরমর্দান : মিরমর্দান নবাব সিরাজউদ্দৌলার অত্যন্ত বিশ্বাসী সেনাপতি ছিলেন। পলাশির যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই অকুতোভয় বীর যোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে ইংরেজ শিবিরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার উরুতে গোলার আঘাত লাগে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করেছেন, অথচ অধিকাংশ সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছেন।

মোহনলাল : মোহনলাল কাশ্মিরি সিরাজউদ্দৌলার অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। একসময় তিনি নবাবের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। পলাশির যুদ্ধে মিরমর্দান গোলার আঘাতে মৃত্যুবরণ করলে মোহনলাল ফরাসি যোদ্ধা সাঁফ্রেকে সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু মিরজাফর ও রায়দুর্লভের পরামর্শে সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। মোহনলাল পুত্রসহ ইংরেজদের হাতে বন্দি হন এবং ক্লাইভের নির্দেশে গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়। অথচ ক্লাইভকে এক চিঠিতে ওয়াটসন জানিয়েছেন যে, নবাবের শত্রুরা মোহনলালকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল যাতে নবাবকে বস্তুনিষ্ঠ পরামর্শ দেওয়ার কোনো লোক না থাকে।

মোহাম্মদি বেগ : মোহাম্মদি বেগ একজন নীচাশয় ও কৃতঘ্ন ব্যক্তি ও খুনি। পলাশির যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর স্ত্রী- কন্যাসহ পাটনার উদ্দেশে সিরাজ যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মিরজাফরের ভাই মিরদাউদ সপরিবারে নবাবকে বন্দি করে রাজধানীতে নিয়ে আসে। গণবিক্ষোভের আশঙ্কায় ক্লাইভ দ্রুত সিরাজকে হত্যা করতে চান। তখন মিরনের আহ্বানে মোহাম্মদি বেগ সিরাজকে হত্যা করতে রাজি হয়। অথচ সিরাজের পিতা মির্জা জয়নুদ্দিন অনাথ বালক মোহাম্মদি বেগকে আদর-যত্নে মানুষ করেছিলেন। অথচ সেই মোহাম্মদি বেগ অর্থের লোভে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে। ২রা জুলাই, ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা শহিদ হন।

রাজবল্লভ : রাজা রাজবল্লভ বিক্রমপুরের বাঙালি বৈদ্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের তিনি একজন। রাজবল্লভ ঢাকায় নৌবাহিনীর কেরানির কাজ করতেন। পরে ঢাকার গভর্নর ঘসেটি বেগমের স্বামী নোয়াজিশ খাঁর পেশকারের দায়িত্ব পালন করেন। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘসেটি বেগমের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে এবং তিনি নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি রাজা উপাধি লাভ করেন। হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পর রাজবল্লভ ঢাকার দেওয়ান নিযুক্ত হন। এ সময় গর্ভনর নোয়াজিশ খাঁর শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে রাজবল্লভ বিপুল অর্থবিত্তের অধিকারী হন। এই সংবাদ জেনে সিরাজ মুর্শিদাবাদ থেকে রাজবল্লভকে বন্দি করেন। কিন্তু আলিবর্দি খাঁর নির্দেশে রাজবল্লভ মুক্তি পান। রাজবল্লভের অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য সিরাজ ঢাকায় লোক পাঠান। কিন্তু অতি ধুরন্ধর রাজবল্লভ পুত্র কৃষ্ণদাসের মাধ্যমে নৌকাভর্তি টাকাকড়ি ও স্বর্ণালংকার কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। কৃষ্ণদাস তীর্থ যাত্রার নাম করে পুরি যাওয়ার পরিবর্তে কলকাতায় রোজার ড্রেকের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেন। নবাব ড্রেককে চিঠি দিয়ে

কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণের জন্য বলেন। কিন্তু অর্থলিপ্সু ড্রেক তাকে পাঠাননি। রাজবল্লভ ইংরেজদের শক্তি সংহত করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করার জন্য শেষ পর্যন্ত নানাভাবে ষড়যন্ত্র করে গিয়েছেন।

লুৎফুন্নেসা : নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেসা। তিনি মির্জা ইরিচ খাঁনের কন্যা। ১৭৪৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে মহাধুমধামে লুৎফুন্নেসার বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তার জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। প্রাসাদ রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না-থাকলেও তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছে সব কিছু। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ে তিনি স্বামীর হাত ধরে অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে শত্রুর হাতে ধরা পড়েন তারা। সিরাজ বন্দি হয়ে চলে যান মুর্শিদাবাদে আর লুৎফুন্নেসাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকায়। সুতরাং স্বামীকে হত্যার দৃশ্য তিনি দেখেননি। মৃতদেহের সৎকারেও তিনি ছিলেন না। পরে যখন তাঁকে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনা হয় তখন তিনি নিঃস্ব, আপন বলে পৃথিবীতে তাঁর কেউ নেই। খোশবাগের গোরস্থানে স্বামীর সমাধিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে তার নিঃসঙ্গ জীবন কাটে। মিরন তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু লুৎফুন্নেসা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখান করেন। ১৭৭০ সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

রায়দুর্লভ : নবাব আলিবর্দির বিশ্বস্ত অমাত্য রাজা জানকীরামের ছেলে রায়দুর্লভ। রায়দুর্লভ ছিলেন উড়িষ্যার পেশকার ও পরে দেওয়ানি লাভ করেন। রাঘুজি ভোঁসলা উড়িষ্যা আক্রমণ করে রায়দুর্লভকে বন্দি করেন। ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদ চলে আসেন এবং রাজা রামনারায়ণের মুৎসুদ্দি পদে নিয়োজিত হন। তিনি নবাব আলিবর্দির আনুকূল্য লাভ করেন এবং নবাবের সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত হন। কিন্তু নবাব সিরাজের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল না। তাই নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাকে পদোন্নতি প্রদান করেননি। ফলে নবাবের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্রে তিনি অংশগ্রহণ করেন। পলাশির যুদ্ধে মিরজাফর ও রায়দুর্লভ অন্যায়ভাবে নবাব সিরাজকে যুদ্ধ বন্ধ করার পরামর্শ দেন। তাদের কুপরামর্শে সিরাজ যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। ফলে ক্লাইভের সৈন্যরা প্রায় বিনাযুদ্ধে জয় লাভ করে। পলাশির যুদ্ধের পর এই বিশ্বাসঘাতক সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। বরং মিরন তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং তার মৃত্যুদণ্ড হয়। ইংরেজরা তাকে রক্ষা করেন এবং তিনি কলকাতা থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তত দিনে রায়দুর্লভ সর্বস্বান্ত ও নিঃস্ব।

ডাচ : হল্যান্ডের অধিবাসীগণ ওলন্দাজ বা ডাচ নামে পরিচিত। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আওতায় ডাচগণ ভারতবর্ষে ব্যবসা করার জন্য আসে ষোড়শ শতকে। ২০এ মার্চ ১৬০২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে এশিয়ায় ২১ বছর ব্যবসা ও উপনিবেশ স্থাপনের অনুমতি দেয় সে দেশের সরকার। ভারতবর্ষে এরা বহু দিন ব্যবসা করেছে, কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। তাদের আর উপনিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৬০২ সাল থেকে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত এই কোম্পানি প্রায় দশ লক্ষ লোক ও ৪৭৮৫টি জাহাজ ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিল।

ফরাসি : ফ্রান্সের অধিবাসীগণ ফরাসি নামে পরিচিত। ফ্রান্স ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬৪ সালে। মোগল শাসনামলে ফরাসি সরকারের নীতি অনুযায়ী এই কোম্পানি ব্যবসা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। ফরাসিদের স্বার্থ রক্ষাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। পণ্ডিচেরি ও চন্দননগরে ফরাসিদের একচেটিয়া প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এই দুটি স্থানে তারা বসতি ও ব্যবসা চালিয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়াম : কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-কুঠি। ১৭০৬ সালে এই কুঠি নির্মিত হয়। পরে এই কুঠি দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ামের সম্মানে এই কুঠির নামকরণ করা হয়।

আলিনগরের সন্ধি : ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং ভারতের ব্রিটিশ প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তখন কলকাতা নগরী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা সেখানে দুর্গ স্থাপন এবং টাকশাল প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোহাম্মদি বেগ কত টাকার বিনিময়ে সিরাজকে হত্যা করতে রাজি হয়েছিল?

ক. দশ হাজার
খ. আট হাজার
গ. ছয় হাজার
ঘ. পাঁচ হাজার

২. 'স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. সাহসিকতা
খ. পলায়নপরতা
গ. ভীরুতা
ঘ. নির্দয়তা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডির বাসায় জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিহত হলেন। যেসব বিপথগামী সেনাসদস্য এ কাজে নিয়োজিত ছিল তারা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ মানুষকে মেরে ফেলল। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতে পারেননি যে তাঁকে কেউ মারতে পারে।

৩. উদ্দীপকের বিপথগামী সেনা সদস্যদের সঙ্গে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়?

ক. বদ্রিআলি
খ. মোহাম্মদি বেগ
গ. সাঁফ্রে
ঘ. নারান

৪. উক্ত চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে–

i. নিষ্ঠুরতা
ii. কৃতঘ্নতা
iii. বিশ্বাসঘাতকতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

ক. কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার কে?

খ. 'ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেমমূলক কীর্তি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মূলভাবকে কীভাবে ধারণ করেছে তা বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৮-২০১৯

শিক্ষাবর্ষ

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম

সহপাঠ

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়